জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

আয়না - ঘর

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৬২	শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম **২য় খন্ড (ঢাকা সিটি)**	৭-৯
৬৩	শহীদ মো: রুমান	১০-১২
৬৪	শহীদ রমিজ উদ্দীন আহমেদ	১৩-১৬
৬৫	শহীদ মো: ইউসুফ মিয়া	১৭-২০
৬৬	শহীদ মো: আব্দুল মোতালেব	২১-২৩
৬৭	শহীদ মো: সাব্বির হোসেন	২৪-২৬
৬৮	শহীদ জোবাইদ হোসেন ইমন	২৭-৩০
৬৯	শহীদ হান্নান	৩১-৩৩
৭০	শহীদ শফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ	৩৪-৩৭
৭১	শহীদ মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ	৩৮-৪১
৭২	শহীদ মো: রমজান আলী	৪২-৪৪
৭৩	শহীদ মো: মনির হোসাইন	৪৫-৪৭
৭৪	শহীদ মো: ইসহাক জমদ্দার	৪৮-৫০
৭৫	শহীদ মো: শাহাবুদ্দিন	৫১-৫৩
৭৬	শহীদ মো: রাকিব হোসাইন	৫৪-৫৬
৭৭	শহীদ ইয়াসির সরকার	৫৭-৬১
৭৮	শহীদ মো: জাহাঙ্গীর মৃধা	৬২-৬৫
৭৯	শহীদ মো: হাবিব	৬৬-৭০
৮০	শহীদ আবু ইসহাক	৭১-৭৪
৮১	শহীদ মো: রিয়াজ	৭৫-৭৭
৮২	শহীদ জাহিদুজ্জামান তানভীন	৭৮-৮২
৮৩	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৮৩-৮৬
৮৪	শহীদ মো: সাকিল	৮৭-৮৯
৮৫	শহীদ শাহরিয়ার হাসান রোকন	৯০-৯৩
৮৬	শহীদ মো: সুজন	৯৪-৯৬
৮৭	শহীদ মো: হোসেন	৯৭-৯৯
৮৮	শহীদ মো: সবুজ	১০০-১০৩
৮৯	শহীদ মো: আক্তার হোসেন	১০৪-১০৫
৯০	শহীদ মোহাম্মদ সাজিদুর রহমান ওমর	১০৬-১০৯
৯১	শহীদ মো: জাহিদ হোসেন	১১০-১১৩
৯২	শহীদ জাকির হোসেন	১১৪-১১৬
৯৩	শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ	১১৭-১২৩
৯৪	শহীদ নাসিব হাসান রিয়ান	১২৪-১২৭
৯৫	শহীদ মারুফ হোসেন	১২৮-১৩০
৯৬	শহীদ সুমন সিকদার	১৩১-১৩৩
৯৭	শহীদ মো: রবিউল ইসলাম	১৩৪-১৩৬

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৯৮	শহীদ মো: রিয়াজ	১৩৭-১৪০
৯৯	শহীদ মমিন ইসলাম	১৪১-১৪৩
১০০	শহীদ মো: সোহেল রানা	১৪৪-১৪৭
১০১	শহীদ হাসনাইন আহমেদ	১৪৮-১৫০
১০২	শহীদ মো: সোহাগ	১৫১-১৫৪
১০৩	শহীদ মো: আলাউদ্দিন	১৫৫-১৫৭
১০৪	শহীদ সাব্বির হোসেন রনি	১৫৮-১৬১
১০৫	শহীদ মো: হাসিব আহসান	১৬২-১৬৪
১০৬	শহীদ জোবায়ের ওমর খান	১৬৫-১৬৭
	(সিলেট বিভাগ)	
১০৭	শহীদ মো: আকিনুর রহমান	১৬৮-১৭১
১০৮	শহীদ মো: সাদিকুর রহমান	১৭২-১৭৪
১০৯	শহীদ শেখ নয়ন হোসেন	১৭৫-১৭৮
১১০	শহীদ মো: আনাছ মিয়া	১৭৯-১৮১
১১১	শহীদ মো: মোজাক্কির মিয়া	১৮২-১৮৫
১১২	শহীদ মো: তোফাজ্জল হোসেন	১৮৬-১৮৯
১১৩	শহীদ মো: আশরাফুল আলম	১৯০-১৯২
১১৪	শহীদ মো: হাসাইন মিয়া	১৯৩-২০০
১১৫	শহীদ আজমত আলী	২০১-২০৩
১১৬	শহীদ মামুন আহমেদ রাফসান	২০৪-২০৬
১১৭	শহীদ মো: নাহিদুল ইসলাম	২০৭-২১০
১১৮	শহীদ মোনায়েল আহমেদ আষাঢ়	২১১-২১৪
১১৯	শহীদ রিপন চন্দ্র শীল	২১৫-২১৯
১২০	শহীদ তাজউদ্দিন	২২০-২২২
১২১	শহীদ মিনহাজ আহমদ	২২৩-২২৫
১২২	শহীদ মো: নাজমুল ইসলাম	২২৬-২২৯
১২৩	শহীদ কামরুল ইসলাম পাবেল	২৩০-২৩২
১২৪	শহীদ জয় আহমেদ হাসান	২৩৩-২৩৫
১২৫	শহীদ সানি আহমদ	২৩৬-২৩৮
১২৬	শহীদ গৌছ উদ্দিন	২৩৯-২৪১
১২৭	শহীদ ময়নুল ইসলাম	২৪২-২৪৪
১২৮	শহীদ মো: রায়হান উদ্দিন	২৪৫-২৪৮

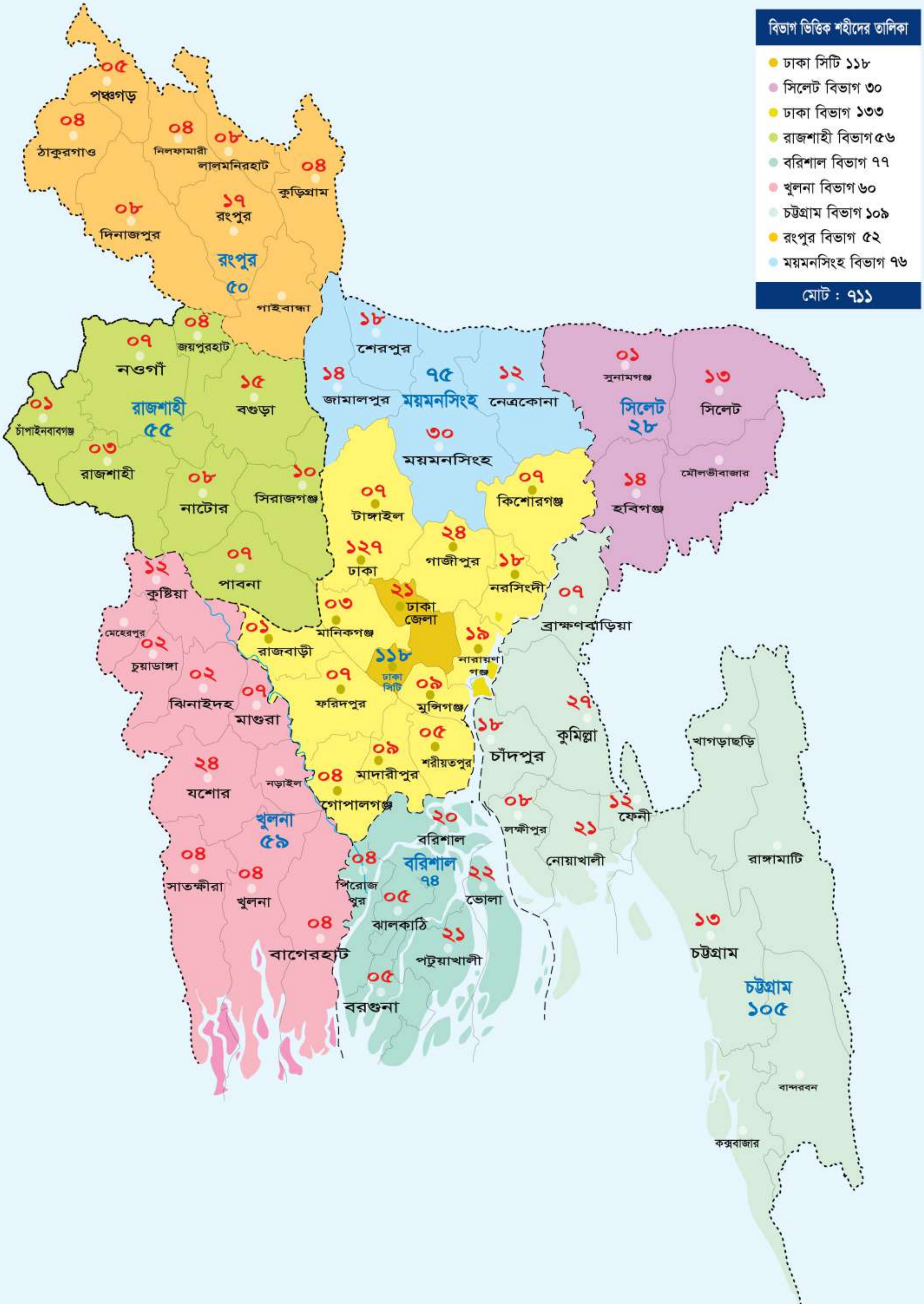

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫
পঞ্চগড়
০৪
ঠাকুরগাও
০৪
নিলফামারী
০৮
লালমনিরহাট
০৪
কুড়িগ্রাম
১৭
রংপুর
০৮
দিনাজপুর
রংপুর
৫০
গাইবান্ধা
০৪
জয়পুরহাট
০৭
নওগাঁ
১৫
বগুড়া
০১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী
৫৫
০৩
রাজশাহী
০৮
নাটোর
১০
সিরাজগঞ্জ
০৭
পাবনা
১৮
শেরপুর
১৪
জামালপুর
৭৫
ময়মনসিংহ
১২
নেত্রকোনা
৩০
ময়মনসিংহ
০১
সুনামগঞ্জ
১৩
সিলেট
সিলেট
২৮
১৪
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
০৭
টাঙ্গাইল
০৭
কিশোরগঞ্জ
২৪
গাজীপুর
১২৭
ঢাকা
১৮
নরসিংদী
২১
ঢাকা
জেলা
০৩
মানিকগঞ্জ
০১
রাজবাড়ী
১১৮
ঢাকা
সিটি
১৯
নারায়ণ
গঞ্জ
০৭
ফরিদপুর
০৯
মুন্সিগঞ্জ
০৫
শরীয়তপুর
০৯
মাদারীপুর
০৪
গোপালগঞ্জ
১২
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২
চুয়াডাঙ্গা
০২
ঝিনাইদহ
০৭
মাগুরা
২৪
যশোর
নড়াইল
খুলনা
৫৯
০৪
সাতক্ষীরা
০৪
খুলনা
০৪
বাগেরহাট
০৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৭
কুমিল্লা
১৮
চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
০৮
লক্ষীপুর
১২
ফেনী
২১
নোয়াখালী
রাঙ্গামাটি
১৩
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম
১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার
২০
বরিশাল
০৪
পিরোজপুর
বরিশাল
৭৪
২২
ভোলা
০৫
ঝালকাঠি
২১
পটুয়াখালী
০৫
বরগুনা

"চার সন্তানকে ইয়াতিম করে বিদায় নিলেন জনক"

শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম

ক্রমিক : ০৬২

আইডি: ঢাকা সিটি ০৬২

প্রারম্ভিক কথা

চার পুত্র সন্তানের জনক শহীদ সাইফুল ইসলাম। তিনি বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা মরহুম কুদ্দুস সিকদার ও মাতা আমেনা খাতুন। পরবর্তিতে পেশাগত কাজে রাজধানীতে পাড়ি জমান। সেখানেই হাজারীবাগে স্ত্রী আমেনা বেগম ও চার ছেলেকে নিয়ে একটি ভাড়া ঘরে বসবাস করতেন। তিনি ড্রাইভিং করে উপার্জন করতেন। তিনিই ছিলেন পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার বড় ছেলে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে। জীবন যুদ্ধের বাস্তবতায় তাকে এখনই ধরতে হয়েছে বিশাল পরিবারের হাল। ছেলেটা কাজ শুরু করেছে শ্রমিক হিসেবে। শহীদ সাইফুলের মেজ ছেলে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে এবং ছোট দুই ছেলের এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি। শহীদ সাইফুল খুবই অমায়িক ব্যাক্তি ছিলেন। মানুষকে খুব আপন করে নিতে পারতেন সহজেই। দায়িত্বপালনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান। ধর্ম পালনেও ছিলেন বেশ আন্তরিক। কখনো অন্যায় ও মিথ্যাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না।

শহীদ সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

৫ আগষ্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এর **"মার্চ টু ঢাকা"** কর্মসূচির দিন শেখ হাসিনার পতন ঘটে। ফ্যাসিস্ট হাসিনার বরাবরই নিদের্শনা ছিল যাতে যেকোনো মূল্যে আন্দোলনকারীদের দমন করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শেখ হাসিনা নিজেই বিপ্লবী জনতার ভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার পরও তার অনুগত পুলিশ বাহিনী অনেক জায়গায় ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষন অব্যাহত রাখে।

৫ তারিখ দুপুর ১২ টার ঘটনা। শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম বাসা থেকে তার বড় ছেলেকে নিয়ে রাজপথে বের হন। সন্ধ্যা ৭টায় তাঁর ছেলে বাসায় ফিরলেও তিনি সে রাতে বাসায় ফিরেননি। বাবার কাছে কোনো ফোন না থাকায় ছেলে বা অন্য কেউ তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। পরের দিন ধানমণ্ডি ৩২ এ রাস্তার পাশেই তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়।

স্ত্রী ও চার ছেলের দায়িত্ব পালন করবে কে

শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম প্রাইভেট কার ড্রাইভার ছিলেন। তার স্বল্প আয় দিয়েই কোনো রকমে তাদের সংসার চলত। তিনি ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় এক রুমের ভাড়া বাসায় পরিবারসহ থাকতেন। বর্তমানে তার ৪ সন্তান নিয়ে স্ত্রী আমেনা খাতুন খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। ছোট জমজ দুই সন্তান ফায়জান ইসলাম ও ফায়াজ ইসলামের বয়স মাত্র দুই বছর।

কোন উপার্জন না থাকায় সন্তানদের মুখে তিনবেলা খাবার যোগান দিতে পারে না আমেনা খাতুন। প্রথম সন্তান তানভীর আলম (১৮) রায়হান স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাধ্য হয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছে। শহীদ মো: সাইফুল ইসলামের স্ত্রী ৪ সন্তান নিয়ে ১ রুমের যে ভাড়া বাসায় থাকেন সেখানে বসবাস করা তাদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য। পাশাপাশি, বর্তমানে কোনো উপার্জন না থাকায় বাসা ভাড়ার ব্যয় বহন করাও তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম খুব অমায়িক মানুষ ছিলেন। খুব সহজেই অপরিচিত মানুষকে আপন করে নিতেন। সবসময় ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ছিলেন যত্নশীল। প্রতবেশীরা তাকে খুব পছন্দ করত। ইসলামের বিধান পালনের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন আন্তরিক। **-মো: হানিফ (বাড়িওয়ালা)**

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের নাম	: মোঃ সাইফুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ৭ মে, ১৯৮২
জন্মস্থান	: বরিশাল
পেশা	: কার ড্রাইভার
মাসিক আয়	: আনুমানিক ২৫০০০/-
ঠিকানা	: বাসাঃ ৭০/০১, এলাকাঃ জিগাতলা, থানাঃ হাজারীবাগ, জেলাঃ ঢাকা
স্ত্রীর বয়স, পেশা ও বয়স	: তানিয়া, গৃহিণী, ৩১
পিতার নাম	: মরহুম কুদ্দুস সিকদার
মায়ের নাম	: আমেনা খাতুন, গৃহিণী, ৬৫
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
শহীদ পরিবারের বিবরণ	: শহীদ সাইফুল ৪ পুত্র সন্তানের জনক ১. তানভীর আলম, বয়সঃ ১৮, পেশাঃ ছাত্র, শ্রেণিঃ একাদশ ২. তামিম ইসলাম, বয়সঃ ১৩, পেশাঃ ছাত্র, শ্রেণিঃ ৪র্থ ৩. ফায়জান ইসলাম, বয়সঃ ২ বছর ৪. ফায়াজ ইসলাম, বয়সঃ ২ বছর
ঘটনার স্থান	: ধানমন্ডি ৩২
আঘাতকারী	: পুলিশ
আক্রমণের সময়	: আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ টা
মৃত্যুর সময়	: আনুমানিক রাত ১০ টা
লাশ পাওয়া যায়	: ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায়
কবরস্থান	: আজিমপুর কবরস্থান

"অফিস থেকে আর বাড়ি ফেরা হল না শহীদ মো: রুমানের"

শহীদ মো: রুমান

ক্রমিক : ০৬৩
আইডি: ঢাকা সিটি ০৬৩

প্রারম্ভিক কথা

শহীদ মো: রুমান ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় ১৯৯৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর পিতা মো: স্বপন ব্যাপারী একজন চা দোকানদার ছিলেন। রুমানের বয়স যখন এক বছর তখন তার পিতা মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে তাঁর জীবনের মর্মান্তিক অধ্যায় শুরু হয়। বাবা স্বপন বেপারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শহীদ রুমানের মা ও তার ভাইবোনদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এরপর শহীদ রুমান ও তার ভাইবোনদের দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব তার মায়ের উপর এসে বর্তায়। কিছুদিন পর তার মা মোসা: লুচি বেগমও অন্য একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার বড় বোন রুমিয়া আক্তার (৩১), ছোট দুই ভাই যথাক্রমে রাজু (২৪) ও সাজু (২২) ল্যাবএইড হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন কর্মী। শহীদ রুমানও উক্ত হাসপাতালে ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাবা-মায়ের পারিবারিক টানাপোড়েন ও দারিদ্রতার কারনে শহীদ রুমান ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অভাবের কারনে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শহীদ মো: রুমান ছিলেন নির্লোভ, কষ্ট সহিষ্ণু, কর্মচঞ্চল ও ত্যাগী যুবক। তার আচরণে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীরা খুবই সন্তুষ্ট ছিল। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ভাই-বোনদের পড়াশোনার খরচ বহন করা সম্ভব হয়নি বিধায় তাদেরকেও পেশাজগতে ঢুকে যেতে হয়। জীবিকার তাগিদে তাকে সবসময় কষ্ট করতে হয়েছিল। সারা দেশে যখন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলছিল তখনো তাকে নিয়মিত অফিসে যেতে হয়েছে। ১৯ জুলাই ২০২৪ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি পুলিশের গুলিতে মারাত্মক আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ২৯ বছর।

শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা

১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার। চলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচী। অপরদিকে অবৈধ স্বৈরাচারী সরকার কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। সারা দেশে ছাত্র-জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা দেশে ছাত্র-জনতার সাথে সরকারের পোষা গুণ্ডাদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। জুম'আর নামাজের পর শহীদ মো: রুমানও অন্যদের সাথে আন্দোলনে অংশ নিতে অফিস থেকে বের হয়ে আসেন।

অফিস থেকে বের হয়ে তিনি ধানমণ্ডির ০৫ নং রোডে এসে আন্দোলনকারীদের সাথে যুক্ত হন। মিছিল ব্যাপক আকার ধারণ করলে চতুর্দিক থেকে ঘাতক আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও পুলিশ সদস্যরা জনতাকে লক্ষ্য করে লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, ছররা গুলি, রাবার বুলেট, গ্রেনেড বোমা নিক্ষেপ করে এবং সাজোয়া যান, হেলিকপ্টার ও উচু ভবন থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে গুলিবর্ষণ শুরু করে। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ছাত্ররা টিয়ারশেলের ধোয়া থেকে বাঁচতে কাগজ, পত্রিকা, টায়ার প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে নিজেদের চোখ রক্ষা করার চেষ্টা করে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সাহসী রুমান আহত ছাত্রদের ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করেন। শহীদ রুমান বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। ঘাতকেরা রুমানকে টার্গেট করে। আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটের সময় একটি বুলেট তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ রুমান। মাথা থেকে রীতিমতো তার মগজ বেরিয়ে এসেছিল। এভাবেই শাহাদাতের খাতায় নাম লেখান শহীদ মো: রুমান।

স্থানীয় লোকজন তার গলায় আইডি কার্ড দেখে শনাক্ত করেন তিনি ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালের কর্মচারী। তাৎক্ষণিক তাকে হাসপাতালে পৌছিয়ে দেওয়া হয়। তার হৃদয় বিদারক মৃত্যু দেখে স্থানীয় লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

প্রতিবেশী মোসা: খাদিজা বেগমের ভাষ্যমতে, শহীদ মোঃ রুমান একজন নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও পরোপকারী মানুষ। নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। কখনো কারও সাথে খারাপ আচরণ করতেন না।

পরিবার সংক্রান্ত তথ্য

শহীদ মো: রুমান ছোট থেকেই তার পরিবারে এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আসছিলেন। শৈশবেই তার বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাবা অন্যত্র বিয়ে করার পর শহীদ রুমানের ভাইবোন ও তার মায়ের সাথে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করে দেন।

কিছুদিন পর শহীদ রুমানের মা দুই সন্তান সহ অন্যত্র বিয়ে করেন। তার সৎ বাবা একজন রিক্সাচালক। শহীদ রুমানের দুই ভাই ও এক বোন আছে। বাবা-মা দুজনেই বেঁচে আছেন। তাদের পরিবারের কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নেই। ঢাকার হাজারীবাগে একটি টিন শেড বাড়িতে ভাড়া থাকেন।

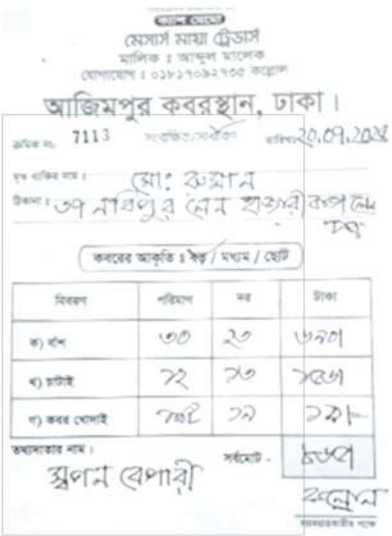

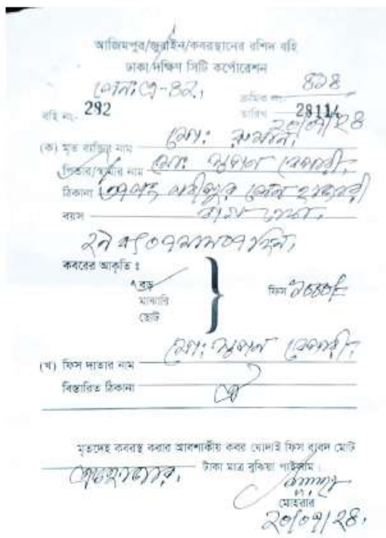

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: রুমান
পেশা	: হাউজ কিপিং, ল্যাবএইড হাসপাতাল, ধানমন্ডি
জন্ম	: ১৩/১২/১৯৯৪, ২৯ বছর
জন্ম স্থান	: হাজারীবাগ ঢাকা
পিতা	: জনাব মো: স্বপন ব্যাপারী, চায়ের দোকানদার
মাতা	: মোসা: লুচি বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
শাহাদাৎ বরণের তারিখ ও সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪ দুপুর ২:৩০ আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান
ঘটনার স্থান	: ধানমন্ডি ০৫ নাম্বার রোড
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ ও পুলিশ
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: হাজারীবাগ, ঢাকা

“ও শুধু বন্ধু না, ভাইও ভাইকে বাঁচাতে পারলাম না”

শহীদ রমিজ উদ্দিন আহমেদ

ক্রমিক : ০৬৪
আইডি : ঢাকা সিটি ০৬৪

প্রারম্ভিক কথা

রমিজ উদ্দিন আহমেদ ২৪ মে ২০০৩ সালে ঢাকাস্থ লালবাগ থানার বারইখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র ছিলেন। তার পিতা এ কে এম রকিবুল আহমেদ কাতার চ্যারিটি সংস্থায় একটি প্রজেক্টে চাকরি করতেন। ২০২৪ সালের মে মাস থেকে তার প্রজেক্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে তিনি বেকার অবস্থায় আছেন। তার মা রাবেয়া সুলতানা একজন গৃহিণী। তাদের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই। ঢাকার লালবাগে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার একমাত্র বড় ভাই রেদোয়ান আহমেদ মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। মাঝে মধ্যে তার বাবা বাসা বাড়ি ও অফিসের টেকনিক্যাল কাজ করে সংসার চালান। শহীদ রমিজ উদ্দিন খুবই বিনয়ী ছিলেন এবং তিনি তার বড় ভাইয়ের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন।

যেভাবে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে

চাকুরীতে কোটা পদ্ধতি বহাল থাকার রায়কে কেন্দ্র করে জুলাই মাস থেকে শুরু হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। শিক্ষার্থীরা উক্ত কর্মসূচীতে প্রথম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে সরকার ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য তার স্বৈরাচারী পুলিশবাহিনী, আওয়ামী লীগ এবং তার দোসরদের লেলিয়ে দেয়। ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে যোগদান করে।

শহীদ রমিজ উদ্দিন রাজধানীর হাজারীবাগ এর বরইখালীর বাসা থেকে ৪ আগস্ট দুপুর ১১ টার দিকে বন্ধু শফিকুল ইসলাম প্রান্তকে নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে বের হয়ে যান। যাওয়ার সময় মা রাবেয়া সুলতানা কে বলেছিলেন- 'আম্মু, আমরা আন্দোলনে যাচ্ছি'। ছেলেকে বাধা না দিলেও অজানা এক আশংকায় কাঁপছিলো মায়ের বুক।

শহীদ রমিজ উদ্দিন ও তার বন্ধু প্রান্ত ছোটবেলা থেকেই একসাথে বেড়ে উঠেছে। রমিজ উদ্দিন শুধু একা আন্দোলনে যোগদান করেনি বরং আগের দিন ফেসবুক গ্রুপে তার অন্যান্য বন্ধুদেরকেও আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সারাদেশে কারফিউ চলমান থাকায় রাস্তায় একসাথে বের হওয়ার মত কোন পরিস্থিতি ছিল না। রমিজ তার বন্ধু প্রান্ত, মহিন ও আকাশের অদম্য ইচ্ছা ছিল শাহবাগে গিয়ে আন্দোলনে যোগদান করা। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের বাঁধা অতিক্রম করে তারা শহরের অলিগলি দিয়ে পায়ে হেঁটে শাহবাগে পৌঁছে যান। দুপুরে শাহবাগ থেকে শিক্ষার্থীদের একটা বড় মিছিল বাংলামটর হয়ে ফার্মগেট এর দিকে যাচ্ছিল।

রমিজসহ তার চার বন্ধু মিছিলের প্রথম দিকেই ছিলেন। সময় যতই গড়াতে থাকে আন্দোলন ততই জোরদার হয়ে ওঠে। বিকেল চারটার দিকে ফার্মগেট এসে স্বৈরাচারীর পুলিশ বাহিনী ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। চতুর্দিক থেকে উপর্যুপরি টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা গুলি, গ্রেনেড এমনকি হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোরা হয় আন্দোলনকারীদের উপর। এমনকি উচু ভবন থেকেও নেতৃত্বদানকারী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে গুলি ছোড়া হয়েছিল। আন্দোলনকারী ছাত্র জনতা দিক বেদিক হয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াতে থাকে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলতে থাকে এবং অনেকেই আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। রমিজ এবং তার বন্ধুরা কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে অবস্থান নেন। সেখানেও থেমে থেমে সংঘর্ষ হচ্ছিলো সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে।

এদিকে তার মা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষের ঘটনা শুনে তার ছেলেকে বারবার ফোন করেছিলেন। ভয়ানক সেই পরিস্থিতির মধ্যে মায়ের ফোন ধরে শহীদ রমিজ বলেছিলেন, "গন্ডগোল চলছে, পরে কথা বলবো"। কিন্তু হায়! কে জানতো এটাই হবে মায়ের সঙ্গে তার শেষ কথা! বিকেল পাঁচটা বিশ মিনিটের দিকে মেট্রো রেল স্টেশনের নিচে ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হয় রমিজ। বিপর্যয়কর এমন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে সাথে সাথেই পার্শ্ববর্তী পদ্মা ক্লিনিকে নেয়া হয়। আঘাত মারাত্মক হওয়ায় সেখানে কর্মরত চিকিৎসকেরা তাকে ফিরিয়ে দেন। তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা ৬ টা ২০ মিনিটের দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শহীদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ

শহীদ রমিজ উদ্দিন ও তার বন্ধু প্রান্ত ছোটবেলা থেকেই একসাথে বেড়ে ওঠে। ছোট থেকে আন্দোলন পর্যন্ত তারা একসাথেই ছিলেন। তার বন্ধু প্রান্ত জানান 'তারই হাতের ওপর মৃত্যু হয়েছে রমিজের। বন্ধুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রান্ত অঝোরে কান্না করে ফেলেন। তিনি বলেন "রমিজ শুধু আমার বন্ধু না, ভাইও। ভাইকে বাঁচাতে পারলাম না। ওর স্মৃতি ভুলতে পারছি না আর কখনো ভুলতেও পারবো না"।

নিহত ছেলের হাত ধরে মা বলছেন, 'রূপ বেঁচে আছে!'

একটু পরপর মৃত ছেলের বুকে মাথা রেখে গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানের গন্ধ নিচ্ছেন মা। আর নিথর নাতির চুলগুলো টেনে টেনে দাদি বলছেন, 'রূপ, কথা বল। ও কথা বলবে।'

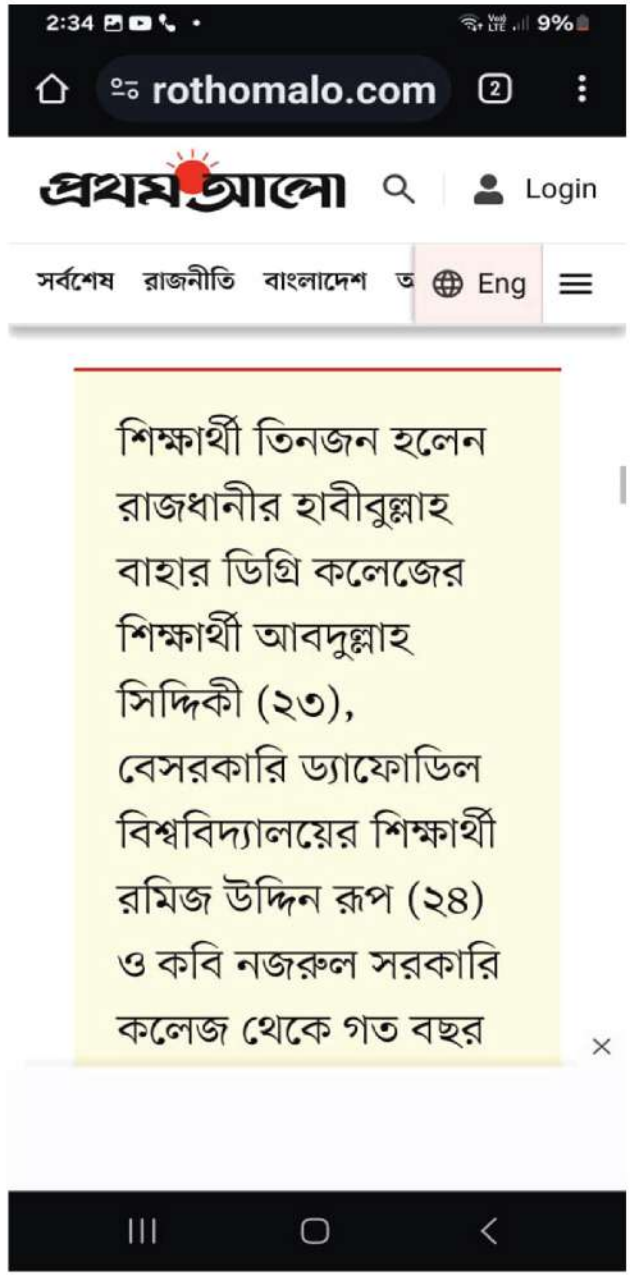

ছেলের হেলমেট ছবি পোশাক নিয়ে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ভাইয়ের মধ্যে খুব মিল ছিল। তিনি বাসায় না থাকলে রমিজ বড় ভাইয়ের গোসল-খাওয়ানো থেকে শুরু করে সব কাজ করত। মোটরসাইকেল রমিজের খুব পছন্দ ছিল। আগামী মাসেই নতুন একটি বাইক কেনার কথা ছিল ওর। বাইক স্টান্ট শেখারও শখ ছিল রমিজের। পূর্বাচলে একটি প্রতিষ্ঠানে বাইক স্টান্ট প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা হচ্ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি তাঁর।

প্রান্ত জানান, তাঁর হাতের ওপরই মৃত্যু হয়েছে রমিজের। ঘটনার দিন একটি ফেসবুক গ্রুপে রমিজ অন্য বন্ধুদের আহ্বান জানিয়েছিল শাহবাগে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য। তবে গ্রুপের অন্যরা জানান, রাস্তার পরিস্থিতি ভালো না। একসঙ্গে লালবাগ থেকে গেলে রাস্তায় পুলিশ আটকাতে পারে। বরং যে যার মতো শাহবাগে যেতে হবে। এর পরই রমিজ, প্রান্ত, মাহিন ও আকাশ হেঁটে শাহবাগে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। দুপুরে শাহবাগ থেকে শিক্ষার্থীদের একটি বড় মিছিল বাংলামটর হয়ে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছিল। রমিজসহ তারা চার বন্ধু মিছিলের প্রথম দিকেই ছিলেন। বিকেল ৪টার দিকে ফার্মগেটে পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষার্থীদের মিছিলে হামলা চালায়। গুলি ছোড়া হয় আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে। পরে শিক্ষার্থীরা পিছু হটে কারওয়ান বাজার কদম ফোয়ারা মোড়ে অবস্থান নেন। সোয়া ৫টার দিকে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের লোকজন ফার্মগেটের দিক থেকে আবার হামলা চালাতে ছুটে আসে। কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে লাঠি হাতে রমিজ ও আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের লোকজন গুলি করলে হঠাৎ দেখি রমিজ রাস্তায় পড়ে যায়। গুলি লেগে ওর ডান চোখের মনি বের হয়ে গিয়েছিল। ওকে ধরাধরি করে নিয়ে যাই কাঁঠালবাগানের পথ্য হাসপাতালে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের লোকজন হাসপাতালের সামনে অবস্থান নেয়। কিন্তু হাসপাতালের স্টাফরা আমাদের তিন তলার একটি কক্ষে লুকিয়ে থাকতে বলেন। প্রায় ১০ মিনিট ঘরে আটকা ছিলাম। পরে রমিজের লাশ নিয়ে যাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

বন্ধুর স্মৃতিচারণ করতে করতে প্রান্তও কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, 'রমিজ আমার শুধু বন্ধু না, ভাই। ভাইকে বাঁচাতে পারলাম না। ওর স্মৃতি ভুলতে পারছি না। ময়নাতদন্ত ছাড়া ৪ আগস্ট রাতেই আজিমপুর কবরস্থানে রমিজের লাশ দাফন করা হয়।

রমিজের ফেসবুক আইডি ঘেঁটে দেখা যায়, ৩ আগস্ট তিনি প্রোফাইল পরিবর্তন করে মুখে লাল কাপড় বাঁধা ছবি দেন। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকেই মন্তব্য করেছেন সে ছবিতে। শেখ সিয়াম নামে একজন লিখেছেন, 'খুব মিস করব তোমারে। আল্লাহ যেন জান্নাতবাসী করুক।' ফাহাদ হোসেন নামে আরেকজন লেখেন, 'বন্ধু মিস ইউ।'

এদিকে পান্থপথে ড্যাফোডিল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিটি রমিজের নামে নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ভাইস প্রিন্সিপাল মোয়াজ্জেম হোসেন রুবেল সমকালকে জানান, লাইব্রেরি নাম রাখা হয়েছে 'শহীদ রমিজ উদ্দিন লাইব্রেরি'।

পট পরিবর্তনে পাল্টেছে দখলদার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধে সড়কের পাশেই অবৈধভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল ছাত্রলীগের একটি কার্যালয়। সেখানে বসেই আশপাশের ফুটপাতের দোকান ও অটোরিকশার চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ৫ আগস্টের পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মী পালিয়ে গেলে সেই অফিসের দখল নেয় বিএনপি নেতাকর্মী। এখন সেখানে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদপুরে শিয়া মসজিদ মোড়ে ছিল আদাবর থানা ছাত্রলীগের কার্যালয়। গত ৩ আগস্ট সংঘর্ষের

তেজগাঁওয়ের নাবিস্কো এলাকায় ফুটপাতের ওপর দীর্ঘদিন ধরে রিকশার গ্যারেজ চালান সবুজ আলী। আগে প্রতিটি রিকশার জন্য প্রতিদিন ৩০ টাকা চাঁদা দিতে হতো আওয়ামী লীগ নেতাদের। এখন তারা না থাকলেও চাঁদাবাজির হাত থেকে বাঁচতে পারছেন না তিনি। সবুজ আলী বলেন, 'যাগো কোনো সময় এলাকায় দেখি নাই, তারাই এখন বিএনপির বড় নেতা হয়া গেছে। আইয়া কইতাছে, এখন নাকি তাদের চাঁদা দিতে হইব, না হইলে গ্যারেজ উঠায়া দিব। এখন বিএনপির এত নেতা বের হইতেছে, এতদিন তারা কই আছিল?'

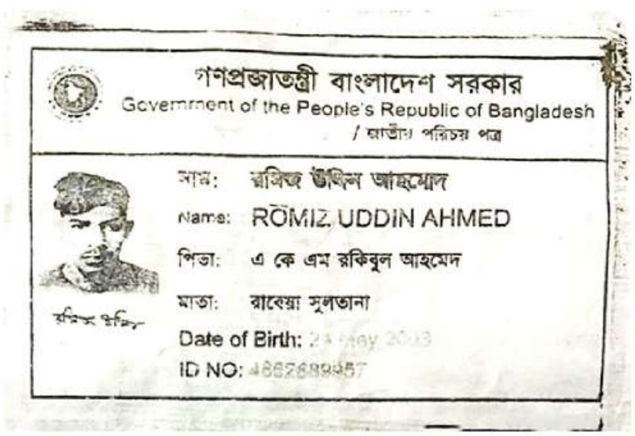

একনজরে শহীদ রমিজ উদ্দিন আহমেদ

নাম	: শহীদ রমিজ উদ্দিন আহমেদ, পেশা: ছাত্র, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
পিতা	: এ কে এম রাকিবুল আহমেদ
মাতা	: রাবেয়া সুলতানা, পেশা: গৃহিণী
ভাই	: রেদওয়ান আহমেদ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, কাওরান বাজার মেট্রোরেল স্টেশন
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, বিকাল: ৬:২০ মিনিট, পদ্মা ক্লিনিক
স্থায়ী ঠিকানা	: বরাই খালী, রোড নং ১৩, ইউনিয়ন: শিবপুর, থানা: লালবাগ, ঢাকা

“রাজপথে পড়েছিল শহীদের লাশ”

শহীদ মো: ইউসুফ মিয়া

ক্রমিক : ০৬৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০৬৫

প্রারম্ভিক কথা

হাসিনা পালিয়ে গিয়েছে। দেশ এখন ফ্যাসিবাদ মুক্ত। সারাদেশে বিজয়ের আনন্দ। সবাই ফিরেছে ঘরে। ফেরেনি মো: ইউসুফ মিয়া। আর কোনদিনই তিনি ফিরবেন না। তিনি শহীদ হয়েছেন স্বৈরাচারী হাসিনার পুলিশের বুলেটে।

মো: ইউসুফ মিয়া পেশায় ছিলেন পুরাতন মোবাইল ক্রেতা বিক্রেতা। তার একমাত্র বোন ইকরা ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। তিনি পারিবারিকভাবে অসচ্ছল। তার বাবা দিনমজুর। রিক্সা চালিয়ে দিনাতিপাত করেন।

ঘটনার বিবরণ

৫ আগস্ট আরেক মুগ্ধের মতো করে ইতিহাস রচনা করেছিলেন শহীদ ইউসুফ। মুগ্ধরা যুদ্ধের মাঠে নেমেছিলেন খালি হাতে। অস্ত্র নেই তবু রণাঙ্গনের যোদ্ধা তারা। সহযোদ্ধাদের সেবক। মো ইউসুফ তেমনই এক যোদ্ধা।

মাকে বলেন যুদ্ধে যাবেন। দেশ মুক্তির যুদ্ধে। রাজপথে তখন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার বিক্ষুব্ধ আন্দোলন। ৫ আগস্ট বাসা থেকে বের হন ইউসুফ। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিজেকে শামিল করতে তিনি বেরিয়ে আসেন রাজপথে। মাকে বলেন আন্দোলনে ছাত্রদের তিনি পানি পান করাবেন। মা ও স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে আসেন। প্রিয়তমা স্ত্রীকেও যেন দেখে আসেন শেষবার।

ঘাতক পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। বুলেটের বিষক্রিয়ায় তার আঘাতের স্থানটি পুড়ে যায়। সন্ধ্যায় স্বজনরা খুঁজতে বের হন ইউসুফকে। অবশেষে বেওয়ারিশ হিসেবে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। কাছে গিয়ে দেখেন এ যে তার নিজেরই সন্তান।

নিজের পবিত্র রক্ত দিয়ে দেশকে মুক্ত করেছেন। জাতি পেয়েছেন গণতন্ত্র, বিদায় হয়েছে স্বৈরাচারের। পরিবারের লোকেরা ইউসুফের লাশ নিয়ে বাড়িতে ফেরেন। পরদিন ৬ আগস্ট জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয় আজিমপুর কবরস্থানে।

সেদিন দুপুরে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে বিজয়োল্লাসে নেমে পড়ে জনতা। সন্ধ্যায় একে একে সবাই নিজ ঘরে ফিরছিল। তখনও ফেরেননি ইউসুফ। স্বজনেরা উৎকণ্ঠা নিয়েই খুঁজতে থাকেন। একপর্যায়ে লাশ পড়ে থাকতে দেখেন ধানমন্ডি ৩২ এর পথে। ধানমন্ডির পুলিশ, বিজিবি, আওয়ামী লাঠিয়াল বাহিনী মরিয়া। তখনও তারা গুলি ছুড়ছে আন্দোলনকারীদের দিকে। ধানমন্ডি যেন তপ্ত যুদ্ধের ময়দান। এক পক্ষ সশস্ত্র, আরেকপক্ষ নিরস্ত্র। পুলিশ গুলি করছে, বিজিবি গুলি করছে। গুলি করছে আওয়ামী গুন্ডালীগ। পুলিশের গুলিতে নিহত হয়ে রাস্তায় পড়েছিল নিরীহ ইউসুফ। কেউ তার খোঁজ নেয়নি।

প্রতিবেশীর অনুভূতি

প্রতিবেশী রফিকুল ইসলামের ভাষ্যমতে শহীদ মোঃ ইউসুফ মিয়া একজন ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন পরোপকারী ও কঠোর পরিশ্রমী। কখনো কারো সাথে খারাপ আচরণ করেননি ইউসুফ মিয়া। ইউসুফ দরিদ্র ঘরের সন্তান। কিন্তু হৃদয়ের বিশালতায় তিনি ছিলেন ধনী ও সমৃদ্ধ। দেশ প্রেম যার হৃদয় জুড়ে দারিদ্রতা তাদের কাছে তুচ্ছ। ইউসুফ যুদ্ধের মাঠের মহানায়কদের একজন। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন দেশের তরে। তার বিষয়ে অন্যান্য প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলেও জানা যায় তিনি ছিলেন মিশুক প্রকৃতির বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ।

পারিবারিক অবস্থা

ইউসুফ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ভাড়া বাসায় থাকতেন। বাবা মা স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ছিল তার সুখের সংসার।

তার বাবা একজন রিক্সা চালক। তিনি শহীদ হওয়ার পর তার স্ত্রী তার বাবা মায়ের সাথেই থাকছেন। তাদের দাম্পত্য জীবনে এক সন্তান হয়েছিল। দেড় মাস বয়সে মারা গেছে।

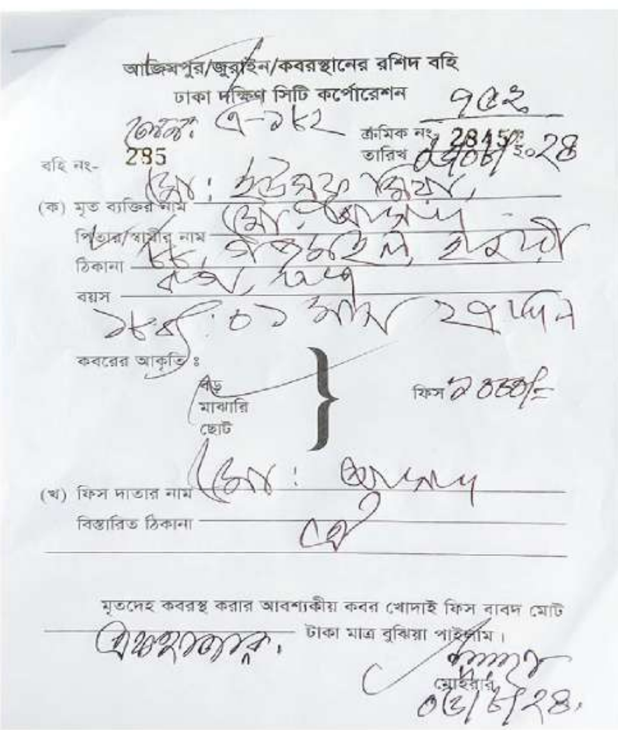

আজিমপুর/জুরাইন/কবরস্থানের রশিদ বহি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বহি নং- 285

ক্রমিক নং 2845

তারিখ

(ক) মৃত ব্যক্তির নাম

পিতার/স্বামীর নাম

ঠিকানা

বয়স

কবরের আকৃতি ঃ

বড়

মাঝারি

ছোট

ফিস 2000/-

(খ) ফিস দাতার নাম

বিস্তারিত ঠিকানা

মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট ____ টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।

মোহরার

একনজরে শহীদ মো: ইউসুফ মিয়া

নাম	: মো: ইউসুফ মিয়া
জন্ম	: ০৯-০৬-২০২৬
পিতা	: মো: আসাদ
মাতা	: মোসা: সাথী
স্থায়ী ঠিকানা	: বৌ বাজার, হাজারিবাগ, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা ৩৯/১, বৌ বাজার,হাজারিবাগ, ঢাকা
পেশা	: পুরাতন মোবাইল ক্রয় বিক্রয়
শাহাদাত চিত্র	: ধানমন্ডি ৩২ এ পুলিশের গুলিতে নিহত
তারিখ	: ৫ আগস্ট, লাশ রাস্তায় পড়েছিল
কবরস্থান	: আজিমপুর কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. তার স্ত্রীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
২. শহীদের পিতার জন্য মাসিক অনুদান
৩. ব্যবসার জন্য পুঁজি প্রদান করা
৪. বোনের লেখাপড়ার খরচ সরকার বহন করতে পারে
৫. পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান

শহীদ মোঃ আবদুল মোতালেব

ক্রমিক : ০৬৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০৬৬

শহীদ পরিচিতি

ছোটবেলা থেকেই প্রখর মেধা, বিনয়ী এবং ভদ্র স্বভাবের ছিলেন শহীদ আবদুল মোতালেব। তিনি অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র ছিলেন। ৭ ডিসেম্বর ২০১০ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার বড় নোয়াজপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মো: আবদুল মাতিন (৪৭) পেশায় ছিলেন দিনমজুর এবং তার মাতা জাহানারা বেগম (৩৭) পেশায় গৃহিণী ছিলেন। তার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আল মুনতাসীর (০৩) এবং তার একজন বিবাহিতা বড় বোন ছিলেন। জনাব আব্দুল মতিন তার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষিত করার স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে পাড়ি জমান। ঢাকায় এসে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। পেশায় দিনমজুর হওয়ার কারণে দৈনিক কাজের মাধ্যমে যে স্বল্প টাকা তিনি উপার্জন করতেন তা দিয়েই তিনি সংসার চালাতেন। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একমাত্র তিনিই হওয়ার কারণে তার আয়ের উপরেই চলতো পুরো পরিবার।

মায়ের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গনঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটে। চাকুরীক্ষেত্রে কোটা প্রথা বহাল থাকবে এমন অযৌক্তিক রায়ের বিরুদ্ধে ছাত্ররা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্ররা শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বৈরাচারী সরকার তাদের ন্যায্য দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য আওয়ামী-যুবলীগ এবং স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করেন। সতেরো জুলাইয়ের পরে ছাত্রদের উপরে আওয়ামী পুলিশ লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগ দ্বারা নিরীহ ছাত্রছাত্রীর উপর বেধড়ক মারধর শুরু হয়। ছাত্রদের উপর অমানবিক নির্যাতন এবং মানবাধিকার বিরোধী আচরণের জন্য ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে অগনিত ছাত্র-জনতা শহীদ হন। শহীদ আব্দুল মোতালেবও সেই শহীদদের একজন।

শহীদ আব্দুল মোতালেব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলেন। ৪ই আগস্ট ২০২৪ অন্যান্য দিনের মতোই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ধানমন্ডি জিগাতলায় বন্ধু ও বড় ভাইদের সাথে বিকেল পাঁচটার দিকে মিছিলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। একদিকে ছাত্র জনতার ন্যায্য আন্দোলন অন্যদিকে আওয়ামী সন্ত্রাসী এবং পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ। ছাত্র-জনতার ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার তার সন্ত্রাসী বাহিনী আওয়ামীলীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। তারা হেলমেট পড়ে দেশি-বিদেশী অস্ত্র হাতে নিয়ে পুলিশের সাথে আক্রমণে অংশ নেয়। স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ সর্বশক্তি নিয়ে তারা সামনে থেকে ছাত্র-জনতার উপর উপর্যুপরি গুলি করে। শুধু তাই নয় হেলিকপ্টার থেকেও সাউন্ড গ্রেনেড এবং রাবার বুলেট ছোড়া হয়। বিভিন্ন বাসাবাড়ির ছাদের উপর থেকে স্নাইপার দিয়ে টার্গেট করে করে ছাত্র জনতার উপরে গুলি করা হয়। ভয়াবহ এক সংঘর্ষের শিকার হন শহীদ আব্দুল মোতালেব।

আওয়ামী সন্ত্রাসী এবং পুলিশের একযোগে সাউন্ড গ্রেনেডের মুখে পড়েন শহীদ আবদুল মোতালেব। একটা গুলি এসে তার বুকে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথেই তিনি ঢলে পড়েন রাস্তায়। পুলিশের প্রচন্ড গোলাগুলির মুখে তার সহকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহীদ মোতালেবকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তাকে শিকদার মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা তার লাশ শহীদ মিনারে নিয়ে যান এবং সেখানেই তার জানাজা সম্পন্ন করেন।

শহীদ আব্দুল মোতালেবকে তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। শহীদ আব্দুল মোতালেবের বাবা মায়ের স্বপ্ন ছিল তাদের ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পরিবার এবং দেশের সেবা করবে। তার এমন আকস্মিক মৃত্যু যেন কেউই মেনে নিতে পারছিলেন না। শহীদের মৃত্যুতে তার বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীরা শোকাহত হয়ে পড়েন। শহীদের মৃত্যুতে যেন একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো। শহীদ আব্দুল মোতালেব ছিলেন সম্ভাবনাময় এক তরুণ যার প্রতিভা শুধু ফুটবলে নয় তার শিক্ষায়ও ফুটে উঠেছিল। তার মৃত্যুতে কেবল পরিবার নয় তার স্কুল, খেলার সাথীরা এবং পুরো সমাজই অপূরনীয় ক্ষতির শিকার হয়। শহীদ আব্দুল মোতালেব চিরতরে আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেও তার আদর্শ, তার বিনয়, এবং তার সংগ্রাম আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদ আব্দুল মোতালেবের প্রতিবেশী এক চাচা বলেন যে, "তিনি ছোটবেলা থেকেই প্রখর মেধাবী ছিলেন"। বড়দের সাথে দেখা হলে সালাম দিতেন এবং শ্রদ্ধা জানাতেন। তিনি অত্র আন্দোলনে সহকারীদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শহীদ আব্দুল মোতালেব নিয়মিত নামাজ পড়তেন। তাকে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে যেন দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হয় এবং তার পরিবারকে যেন আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়। (প্রতিবেশি জনাব মারুফ হোসেন মিলন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: আবদুল মতিন
Name: Abdul Motin
পিতা: বাদশা মিয়া
মাতা: হোসনেয়ারা বেগম
Date of Birth: 02 Jan 1977
ID NO: 7510710584264

এক নজরে শহীদের পরিবার

নাম	: মো: আবদুল মোতালেব, পেশা: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ৭ ডিসেম্বর ২০১০
পিতা	: মো: আবদুল মতিন, পেশা: দিনমজুর
মাতা	: জাহানারা বেগম, পেশা: গৃহিণী
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, জিগাতলা, ধানমন্ডি
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা ৬.০০টা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বড় নোয়াজপুর, ইউনিয়ন: ৫নং ওয়ার্ড, থানা: বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ৬৩/এ, থানা: হাজারীবাগ, ঢাকা

পরিবারের জন্য করনীয় প্রস্তাবনা

১: তার বাবা ট্যানারি কাজের একজন দিনমজুর। তাঁকে ট্যানারি ব্যাবসার জন্য এককালীন সহায়তা করা যেতে পারে

২: নিয়মিত মাসিক সহায়তা করা যেতে পারে

শহীদ মোঃ সাব্বির হোসেন

ক্রমিক : ০৬৭

আইডি: ঢাকা সিটি ০৬৭

পরিচিতি

স্বৈরশাসকের কোন নীতি নাই। ফ্যাসিস্টের মনে কোনো দরদ নেই। ক্ষমতার জন্য তারা নির্মম হয়, নিষ্ঠুর হয়ে যায়। পাষাণসম হৃদয় তাদের। তারা হত্যা করতে একটুকুও দ্বিধা করে না। শহীদ মোঃ সাব্বির হোসেন নিষ্পাপ একজন শিশু। বয়স ১২ বছর। ২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর তার জন্ম হয়। বাবা মোঃ নুর আলম, মা মাকসুদা বেগম।

ঘটনার বিবরণ

শহীদ মো: সাব্বির হোসেন সংগ্রামী এক শিশু। প্রতিদিনই ছিল তার জীবনযুদ্ধ। জীবনই যেন যুদ্ধের ময়দান। মাত্র বার বছর বয়সেই থেমে যায় তার জীবন। জীবন কেড়ে নেয় ধানমন্ডি থানার পুলিশ। নির্মমভাবে হত্যা করে একজন শিশুকে।

সাব্বির ও তার মায়ের খরচ তাদের পিতা বহন করেন না। কেননা, তিনি তার অন্য সংসার নিয়ে নিখোঁজ। মা ও তার আরও তিন ভাই মোট পাঁচ জনের সংসার। সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হয় দশ বছরের সাব্বির। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ারও আরও দুই বছর আগেই আয়ের পথ ধরতে হয় তাকে। প্রতিদিন আবাহনী খেলার মাঠের সামনে বেলুন বিক্রি করতেন সাব্বির। সাব্বিরের আয় দিয়েই চলতো সংসার। সংসার যুদ্ধে সাব্বির এক সংগ্রামী যোদ্ধা। সংগ্রাম করতে করতেই বেঁচে থাকা।

২০ জুলাই তার জীবনের শেষ দিন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সে বেলুন বিক্রি করছিল। তখনই খবর আসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। আবাহনীর আশপাশ আন্দোলনকারীরা মিছিলে কাঁপিয়ে তোলে। সাব্বিরের শিশু মন জেগে ওঠে। সরকারের অনিয়ম, দূর্নীতির খবর হয়তো তার মনকেও বিষিয়ে তোলে। বিদ্রোহ করা আকাঙ্খাই হয়তো তাকে নামিয়ে নেয় আন্দোলনে। যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মারমুখী হয়ে উঠে সরকারের পেটুয়া বাহিনী। তারা নির্বিচারে গুলি চালায়। সাব্বিরের হাতে তখনও বেলুনের থলেটি।

হঠাৎ একটি বুলেটে সে রক্তাক্ত হয়। তার বুক, মুখ, মাথায় আঘাত করে গুলি। মূহুর্তে লুটিয়ে পড়ে সাব্বির হোসেন। পুরো দেশ মর্মাহত হয় পুলিশের নির্মমতায়। আন্দোলনকারীরা দ্রুত তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তারদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাত ৯টায় সাব্বির শাহাদত বরণ করেন। সমাপ্তি ঘটে শিশু সাব্বিরের সংগ্রামী জীবনের। তার মৃত্যুতে দেশবাসী, আন্দোলনকারী ও সচেতন জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করে। পরদিন ২১ জুলাই জানাজা শেষে তাকে মোহাম্মদপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আত্মীয়দের অনুভূতি

ছোট্র একটি শিশু। স্কুলে যাবার বয়সে তার কাঁধে তুলে নেয় সংসারের দায়িত্ব। বয়স মাত্র বার। মা ও তিন ভাইয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার কাঁধে। বিস্ময়কর বিষয়। অন্যরাও খুব

ছোট। যথাক্রমে ১১, ৫ ও ৩ বছর বয়সী তিনটি ভাই তার। সাব্বিরের মা এবং তার প্রতিবেশীরা তার মৃত্যুতে ভীষণভাবে মর্মাহত। পরিবারটি একেবারের হতাশার সাগরে ভেসে যাওয়ার মতো অবস্থা। ছেলেটির মৃত্যুতে তার মা দু চোখে কেবলই শূন্যতা অনুভব করেন। সাব্বির ছিল বয়সের তুলনায় অধিক কর্তব্য সচেতন, দায়িত্ববান।

প্রতিবেশী আসলাম বলেন, এতোটুকু ছেলের পরিবার সচেতনতা বয়স্কদেরও বিস্মিত করে।

পরিবারের অবস্থা

পরিবারটি এখন বিপর্যস্ত। তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই ছিল সাব্বির। হতদরিদ্র একটি পরিবার আরও হতাশায় ডুবে যাচ্ছে।

শহীদ মো: সাব্বির হোসেনের প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: সাব্বির হোসেন
জন্ম	: ০১-০৯-২০১২
পিতা	: মো: নুর আলম
মাতা	: মাকসুদা বেগম
পেশা	: ধানমণ্ডি আবাহনী মাঠে হকারী করতেন
স্থায়ী ঠিকানা	: ছোট আমতলা, নাজিরপুর, পিরোজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: নুরজাহানের বাড়ী, আজিজ খান রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা
ঘটনার স্থান	: আবাহানী মাঠ ধানমণ্ডি
আক্রমণকারী	: ধানমণ্ডি থানার পুলিশ
সময়	: ২০ জুলাই রাত ৮.৩০
মৃত্যু	: ২০ জুলাই রাত ৯, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল
কবর	: মোহাম্মদপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. স্থায়ী বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা
২. তার মাকে কোন একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া
৩. এককালীন অর্থ দিয়ে সহায়তা করা
৪. মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা
৫. ছোট ভাইদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করা

শহীদ জোবাইদ হোসেন ইমন

ক্রমিক : ০৬৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০৬৮

শহীদ পরিচিতি

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে কিশোর ইমন বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রাণ। তার পুরো নাম শহীদ জোবাইদ হোসেন ইমন। শহীদ ইমন ৪র্থ শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থী। সে দারুন নাজাত ইসলামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করত। চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী হলেও সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও চতুর বালক। তার পিতা জনাব কাঞ্চন মিয়া পেশায় ভ্যান ড্রাইভার। মাতা জহুরা খাতুন একজন গৃহিনী। শহীদ ইমনের পরিবার কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন ২৫ বছর আগে। পিতার স্বপ্ন ছিল ঢাকায় গিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাবেন বা ভালো একটি কাজের ব্যবস্থা করবেন। পিতামাতার স্বপ্নের পথেই হাটছিল শহীদ ইমন। সে তার মাদরাসার সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিল অনন্য-এক বালক। অন্যদের থেকে ছিলো আলাদা। ছোটকাল থেকেই সে প্রচন্ড সাহসী ছেলে। শৈশব থেকেই ভালো-মন্দ, ন্যায় অন্যায় ইত্যাদীর প্রতি খুবই সচেতন ছিল ইমন। সে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করতো। তাকে ঘিরে পিতার যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণের সূচনা হয়েছিল মাত্র। তবে এগুতে পারলো না। পুলিশ লীগ, আওয়ামী লীগ, টোকাই লীগ, সন্ত্রাসী লীগ, যুবলীগের জঙ্গিরা সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। পরিবার এখন তার শোকে কাতর। ইমনের মতো একটি কিশোরের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সেবা থেকে বঞ্চিত হলো বাংলাদেশ।

শিশুটি দেশ রক্ষা করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে কিশোর ইমন বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রাণ। তার পুরো নাম শহীদ জোবায়ের হোসেন ইমন। শহীদ ইমন ৪র্থ শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থী। সে দারুন নাজাত ইসলামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করত। চতুর্থ শ্রেনীর শিক্ষার্থী হলেও সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও চতুর বালক। তার পিতা জনাব কাঞ্চন মিয়া পেশায় ভ্যান ড্রাইভার। মাতা জহুরা খাতুন একজন গৃহিনী। শহীদ ইমনের পরিবার কিশোরগোঞ্জ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন ২৫ বছর আগে। পিতার স্বপ্ন ছিল ঢাকায় গিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাবেন বা ভালো একটি কাজের ব্যবস্থা করবেন। পিতামাতার স্বপ্নের পথেই হাটছিল শহীদ ইমন। সে তার মাদরাসার সব ছাত্রছাত্রীদের ছিল অনন্য- এক বালক। অন্যদের থেকে ছিলে

আলাদা। ছোটকাল থেকেই সে প্রচন্ড সাহসী ছেলে। সে শৈশব থেকেই ভালো-মন্দ, ন্যায় অন্যায় ইত্যাদীর প্রতি খুবই সচেতন ছিল ইমন। সে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করতো। তাকে ঘিরে পিতার যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণের সূচনা হয়েছিল মাত্র। তবে এগুতে পারলো না। পুলিশ লীগ, আওয়ামী লীগ, টোকাই লীগ, সন্ত্রাসী লীগ, যুবলীগের জঙ্গিরা সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। পরিবার এখন তার শোকে কাতর। ইমনের মতো একটি কিশোরের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সেবা থেকে বঞ্চিত হলো বাংলাদেশ।

শহীদ সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা

শহীদ ইমন ছিলেন ১৪ বছরের শিশু বালক। বয়সের দিক থেকে শিশু হলেও তার মেধা, নীতি-নৈতিকতা, সততা ও ভালো মন্দের জ্ঞান বেশ পরিপক্ব।

খুনি হাসিনার সন্ত্রাসী বাহিনী, পুলিশ লীগ দেশব্যাপী ক্রাকডাউন পরিচালনা করছিল। রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগ। কোলের বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্কদের জীবন দিতে হয়েছে। বুলেট, টিয়ারশেল, ছররা গুলি, রাবার বুলেট কোন কিছুই তাদের বাধা হতে পারেনি। নির্বিচারে শত শত মানুষকে হত্যার মিশন নিয়ে নেমেছিল খুনি হাসিনার সন্ত্রাসী বাহিনী। তবুও এদেশের বীর সন্তানেরা কেউ পিছপা হয়নি। নিজেদের পিঠ প্রদর্শন করেনি। এরই অংশ হয়েছে শহীদ ইমন।

১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখটি ছিল শুক্রবার। জুমার আজান হলে, শহীদ ইমন গোসল করে, পাঞ্জাবি পায়জামা পরে আনন্দচিত্তে উৎফুল্ল মনে নামাজ পড়তে যান। কে জানতো যে, এই শিশুটির জন্য এটিই হবে শেষ নামাজ। সে সবার থেকে শুনে শুনে নিজেও শ্লোগান দিত 'কোটা না মেধা? মেধা মেধা।'

জুমার নামাজ শেষে মোহাম্মাদপুরস্থ রায়বাজার এলাকাসংলগ্ন কবরস্থান মসজিদের সামনে থেকেই ছাত্র জনতার প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে ছোট্ট ইমন ও তার বন্ধুরাও যুক্ত হয়। মিছিলটি আল্লাহ করিম মসজিদের সামনে গেলে শুরু হয় সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমন। তারা শুধু নিচ থেকে বুলেট, টিয়ারশেল, ছোড়া গুলি ছোড়েনি বরং রক্তপিপাসু হাসিনার লেলিয়ে দেয়া পুলিশ ও র‍্যাবের সন্ত্রাসীরা আকাশ থেকে নিক্ষেপ করে বুলেট। বৃষ্টির ন্যায় আসতে থাকে বুলেট। আন্দোলনকারীরা তখন নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য আশেপাশে আশ্রয় নিলেও কিছু আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হন। তখন সময় ছিল আনুমানিক বিকাল ৩.৩০। হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলির শিকার হন শহীদ ইমন। গুলি বাম কানের নিচ দিয়ে ঢুকে ডান চোয়ালের নিচ দিয়ে

বের হয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ বালককে উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন। দ্রুত ধানমন্ডি ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রচন্ড রক্তক্ষরণের কারণে এই নিরপরাধ-নিষ্পাপ ছেলেটি সন্ধ্যা ৭.৩০টার দিকে শাহাদাৎ বরণ করেন। তার অপরাধ সংঘটিত করার বয়সই হয়নি। এরপরও ফাসিস্ট, খুনি, মানবতাবিরোধী হাসিনার সন্ত্রাসী বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। দেশের জন্য শহীদ আবু ইমন নিজেঁকে উৎসর্গ করেছে। সে পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশের মানুষকে। তার এই আত্মত্যাগে ৫ তারিখে পতন ঘটেছে খুনি হাসিনার। শহীদ ইমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবে আজীবন।

শহীদ পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ জুবায়ের হোসেন ইমন এর বাবার কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নেই। বস্তিতেই তিনি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। তিনি পেশায় একজন ভ্যান চালক। কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে ঢাকায় আসেন। তাঁরা দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত ঢাকাতে অবস্থান করছেন। তার চার ছেলে মেয়ের মধ্যে বড় ছেলে মুহাম্মদ জিহাদ (২১)-লেগুনার হেলপার। বড় মেয়ে স্বর্ণা আক্তার কানসি (১৯) বিবাহিতা এবং ছোট মেয়ে সুবর্ণা আক্তার বর্ণা (১২) চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী। বড় ছেলে ও পিতার সামান্য আয় দিয়ে সংসার পরিচালনা খুবই কষ্টকর।

দারুন নাজাত ইসলামিয়া মাদ্রাসা
DARUN NAZAT ISLAMIA MADRASA

ভর্তি ফরম

অঙ্গিকার নামা

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদ জুবায়ের হোসেন ইমন (১৪) এর বন্ধুর ভাষ্যমতে, ছেলে হিসেবে অনেক ভালো ছিল। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় মসজিদে যেত। শুক্রবার জুমআ'র নামাজ পড়ার জন্য সবার আগে মসজিদে হাজির হয়ে যেত। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত বলে ছোট থেকেই বড়দের দেখলে সালাম দিত এবং সকলকে সম্মান করত। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় সে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। সকলের সাথে ইমন হাসিখুশি ও ভদ্র স্বভাব নিয়ে কথা বলত। (তাঁর বন্ধু-মোঃ সুজন)

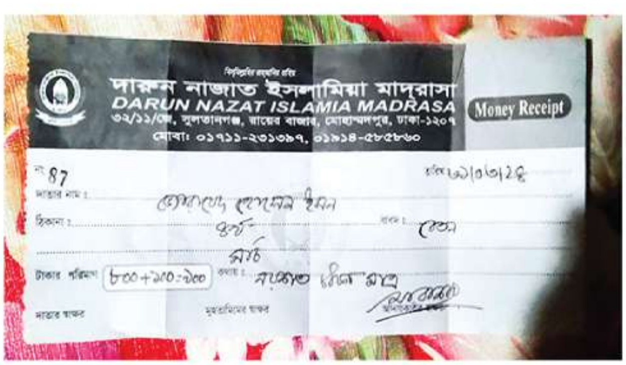

দারুন নাজাত ইসলামিয়া মাদ্রাসা
DARUN NAZAT ISLAMIA MADRASA
Money Receipt
৩২/১১/জে, সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাঃ ০১৭১১-২৩১৩৯৭, ০১৯১৪-৫৮৫৮৬০

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: জোবাইদ হোসেন ইমন
জন্মতারিখ	: ০৩-০২-২০১১
পিতার নাম, বয়স, পেশা	: মো. কাঞ্চন মিয়া, ৪০, ভ্যান চালক
মায়ের নাম, বয়স, পেশা	: জহুরা খাতুন, ৩৬, গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: পাঁচ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: দুই ভাই দুই বোন, ১. বড় ভাই: জিহাদ হোসেন, বয়স: ১১, পেশা: লেগুনা হেল্পার ২. বড় বোন: স্বর্ণা আক্তার কানশি, বয়স: ১৯, পেশা: গৃহিণী ৩. শহীদ জোবায়ের হোসেন ইমন ৪. ছোট বোন: সুবর্ণা আক্তার বর্ণা, বয়স: ১২, পেশা: ছাত্রী, শ্রেণি: ৪র্থ
পড়াশোনা	: ৪র্থ শ্রেণি
বর্তমান ঠিকানা	: ৩২/১১, আই সুলতানগঞ্জ, এলাকা: মেকআপ খান রোড, থানা: মোহাম্মদপুর, জেলা: ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: কিশোরগঞ্জ
আঘাতকারী	: হেলিকপ্টার থেকে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর ছোড়া গুলিতে
ঘটনার স্থান	: মোহাম্মদপুর আল্লাহ করিম মসজিদের সামনে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকেল ৩.৩০টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ৭টা, ইবনে সিনা হাসপাতাল, ধানমন্ডি, সংকর, ঢাকা
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: কিশোরগঞ্জ

“আমার আদরের ধন আমাকে ছেড়ে চলে গেল এখন আমি কার সাথে মনের কথা বলব।”

শহীদ হান্নান

ক্রমিক : ০৬৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০৬৯

জন্ম ও কর্ম বিবরণী

শহীদ হান্নান চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার বড়বাড়ি, মৈশামুড়া গ্রামে ১৯৯২ সালের ৩০ জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: আমিন মিয়া ও মাতার নাম রসিদা বেগম। তিনি শৈশব ও কৈশোর নিজ গ্রামে কাটিয়েছেন। পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। নিম্ন মধ্যবিত্ত হওয়ায় মাধ্যমিকে বিদ্যাপীঠ ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন শহীদ হান্নান। বিয়ের পর জীবিকার তাগিদে ঢাকায় আসেন। রাজধানীর বাড্ডা শহরে তিন বন্ধু মিলে বেকারীর ব্যাবসা শুরু করেন। যার নাম দিয়েছিলেন তিনি আপন বেকারী। ধীরে ধীরে ব্যাবসা বড় হতে থাকে। ফলে সংসারের অর্থাভাব দ্রুত দূর হয়। যে কারণে স্ত্রীর সকল সখ ও আহ্লাদ পূরণ করতে মোটেও বিলম্ব করেন না হান্নান। এভাবেই সুখের সংসারে পার হয় একের পর এক দিন। স্বামী- স্ত্রী এই সুখ ভাগাভাগি করতে অনাগত সন্তানের অপেক্ষা করেন। অতঃপর সে স্বপ্ন পূরণ হয় হান্নানের। স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসে। খুশীতে আত্মহারা হয়ে ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছে নীলমণির জন্য দোয়া কামনা করেন।

'আন্দোলন সেতো জীবনের অন্য নাম, জীবন মানেই সংগ্রাম'

সুখ ডিঙিয়ে আন্দোলন

হঠাৎ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সারাদেশে কোটার বিরুদ্ধে ছাত্রজনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু হয়। এমতাবস্থায় তৎকালীন স্বৈরাচার শাসক শেখ হাসিনা ছাত্রদেরকে ব্যঙ্গ করে রাজাকার বলে গালি দেয়। সাধারণ একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন থেকে গণহত্যা। তার ফল স্বরূপ সবার কলিজা থেকে ভয় উঠে গণআন্দোলন রূপ নেয়। গণআন্দোলন থেকে সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলাফল সরকার পরিবর্তন। তাই বলা যায় গত জুলাই-আগস্ট মাস ছিল আন্দোলনের মাস।

আন্দোলনে যোগদানের কারণ

প্রতিদিন নিজের কর্মস্থানে যাওয়ার সময় রাস্তায় ছাত্র জনতার আন্দোলন উপলব্ধি করতেন হান্নান। আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে রোজ ভাবতেন আজকেই তিনি আন্দোলনে যাবেন কিন্তু বেকারীর ব্যাবসায় সময় দিতে গিয়ে অনেক রাতে ফিরতে হতো তাঁকে। সেসব তোয়াক্কা না করে গত ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার কোনো কিছু না ভেবেই তিনি আন্দোলনে যোগ দেন। মনে মনে কল্পনা করেন পরাধীন দেশকে স্বৈরাচার শাসক শেখ হাসিনা থেকে মুক্ত করে স্ত্রী ও অনাগত সন্তানকে তার বীরত্বের গল্প শোনাবেন।

'আমার আদরের ধন আমাকে ছেড়ে চলে গেল! এখন আমি কার সাথে মনের কথা বলব'

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

সেদিন স্বৈরাচারী হাসিনার পেটুয়া বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী বাড্ডা অঞ্চল ঘেরাও করে রাখে। চারিদিকে ছাত্র জনতাকে লক্ষ্য করে অসংখ্য গুলি ছুড়তে থাকে। হঠাৎ একটা গুলি এসে হান্নানের উরুতে এসে আঘাত হানে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। অতঃপর ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে হান্নানের মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে শহীদের লাশ গ্রামে নিয়ে যায় তাঁর মামা শ্বশুর। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পরিবার। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও মায়ের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ বাবা মাতম করে বলেন- 'আমার আদরের ধন আমাকে ছেড়ে চলে গেল! এখন আমি কার সাথে মনের কথা বলব।' সন্তানদের মধ্যে সবার চেয়ে হান্নানকে বেশি পছন্দ করতেন আমিন মিয়া। যে কারণে বাকি ছেলেদের কাছে না থেকে ছোট ছেলের কাছে অবসর জীবন পার করছিলেন। অতঃপর শহীদের লাশ জানাজা পড়াতে খাটিয়াতে তোলা হয়। মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা সম্পন্ন হওয়ার পর বড়বাড়ি, মৈশামুড়া, হাজীগঞ্জ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আমার সন্তানদের নিরাপত্তা কোথায়? আমরা কি আসলেই বেঁচে আছি? নাকি জীবন্ত লাশ?

পরিবারের শহীদ পরবর্তী জীবন

শহীদ হান্নানের হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারে শোকের মাতম চলছে। মাত্র সাত মাস আগে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পৈতৃক জমি পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বন্টন হলে তিনি বারো শতক জমি লাভ করেন। তার মৃত্যুর পর চার ভাই এক হয়ে সেই জমি দখল করার চেষ্টা করছেন। শহীদের স্ত্রী বর্তমানে তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছেই আছেন। এই মুহূর্তে শহীদ পরিবারে বাড়তি কোন উপার্জন নেই। একমাত্র হান্নানই ছিল বাবা-মা, ও তাঁর স্ত্রীর সংসারের খরচ যোগান দাতা। **শহীদ পিতা বলেন-** 'আমার সন্তানদের নিরাপত্তা কোথায়? আমরা কি আসলেই বেঁচে আছি? নাকি জীবন্ত লাশ?'

'হান্নানকে যে বা যারা হত্যা করেছে আমি তাঁর ফাসি চাই'

প্রিয়জনদের অনুভূতি

শহীদের মামা শ্বশুর ফাহাদ ভুঁইয়া বলেন-'আমার জামাই অনেক ভালো মানুষ ছিল। আমার ভাগ্নিকে সব সময় খেয়াল রাখত। মাত্র সাত মাসে আমাদের পরিবারের মন জয় করেছিল হান্নান। তাকে কখনো আমি রাগতে দেখিনি। বাবা মায়ের ভীষণ দায়িত্ববান ছেলে ছিল সে। তার মৃত্যুর এই শোঁক আমাদের দুই পরিবারকে বিয়োগান্ত করে তুলেছে। ঘাতকের গুলি আমার অল্প বয়সী

ভাগ্নিকে বিধবা করেছে। হান্নানকে যে বা যারা হত্যা করেছে আমি তাঁর ফাসি চাই। তাঁর বিচার চাই। এই শোক আমাদের পক্ষে ভোলার নয়।

'জীবনের হিসাব বহু অংকের মেলা বা না মেলার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে দেখা যায় অতীতের সে হিসাব আর মেলে না। কোথাও যেন একটা গড়মিল ধরা পড়ে।

তবে হিসাব হিসেবের ছন্দেই চলুক। আর আমরা বাঁচতে শিখি জীবনের ছন্দে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নাম	: শহীদ হান্নান
পেশা	: ব্যবসায়ী, (তিন বন্ধু শেয়ারে বেকারীর ব্যাবসা করতেন)
বেকারীর নাম	: তিন আপন বেকারী (বাড্ডা)
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৩০ জানুয়ারি ১৯৯২, ৩২ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার, আনুমানিক ভোর: ০৪.৩০
শাহাদাত বরণের স্থান	: বাড্ডায় আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মৃত্যুবরণ
দাফন করা হয়	: বড়বাড়ি, মৈশামুড়া, হাজীগঞ্জ পারিবারিক কবরস্থান, চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: বড়বাড়ি, মৈশামুড়া, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
পিতা	: মো: আমিন মিয়া
মাতা	: মোছা: রশিদা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: পৈতৃক বার শতক জমি রয়েছে
স্ত্রী	: বিবি হওয়া মুক্তা, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ১৮

প্রস্তাবনা

১. শহীদের অনাগত সন্তানের জন্য সহায়তা করা যেতে পারে
২. শহীদের স্ত্রীকে মাসিক অথবা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
৩. শহীদের স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে

তথ্য সংগ্রহের তারিখ : **১৫-০৯-২০২৪**

শহীদ মো: শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ

ক্রমিক : ০৭০

আইডি: ঢাকা সিটি ০৭০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ বিএএফ শাহীন কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলো। আহনাফ ২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে। তার পৈতৃক নিবাস মানিকগঞ্জ।

জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

চার সদস্যের নিম্ন-মধ্যবিত্ত একক পরিবারের বড় ছেলে আহনাফ। পরিবার ও দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত সে। বাবা জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ একজন বিক্রয় প্রতিনিধি আর মা জনাবা পারভীন একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে কাজ করতেন। তারা থাকতো মিরপুর মধ্য পাইক পাড়ায়। মানিকগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে একটা কাঁচাঘর ছাড়া তাদের আর কোনো ভিটেমাটি নেই। আহনাফের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে একজন ব্যবসায়ী হওয়া। সে সবসময় বলত, সে চাকরি না করে নিজের কিছু করবে, যাতে পরিবার ও দেশ তাকে নিয়ে গর্বিত হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল আহনাফ। প্রথমবার টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেটে আহত হয়েও পুনরায় আন্দোলনে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল সে। মা ও খালা তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আহনাফ তাঁদের বলত, তোমাদের মতো ভীতু মা-খালাদের জন্য ছেলেমেয়েরা আন্দোলনে যেতে পারছে না। ১৯৭১ সালে যদি তোমাদের মতো মা-খালারা থাকতো, তাহলে দেশ স্বাধীন হতো না। এমন কথায় মায়ের মন কাঁদলেও ছেলের সাহসিকতায় গর্ব অনুভব করতেন। ২০২৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল আহনাফের।

শহীদ হলো যেভাবে

৪ আগস্ট ২০২৪। রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বরে বিপুল সংখ্যক ছাত্রজনতা সমবেত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন তখন স্বৈরাচার পতনের এক দফায় পরিণত হয়েছে। স্বৈরাচারী হাসিনার আদেশে পুলিশ ছাত্রদের দমন করতে ভারী অস্ত্র নিয়ে হামলে পড়ে। সাথে যোগ দেয় ছাত্রলীগ। সমবেত ছাত্রদের একজন ছিল আহনাফ। দুপুরের খাবারের পর তিনটার দিকে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আহনাফ। পৌনে পাঁচটার দিকে পরিবারের সাথে তার ফোনে কথা হয়। তখনও সুস্থ ছিল আহনাফ। সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিওতে দেখা যায় গুলিবিদ্ধ একটি দেহ মিরপুর-১০ থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই ছিল আহনাফ। পেটে গুলি লেগেছিল তার। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই শাহাদাৎ বরণ করে সে। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে বক্তব্য

আহনাফের পরিবার এই মৃত্যুর শোকে মুহ্যমান। ছোট ভাই ইফতেখার তার ভাইয়ের গিটার আর টি-শার্ট ধরে কাঁদছে। আহনাফের মা যাকে পাচ্ছে তাকেই ছেলের ব্যবহৃত জিনিসগুলো দেখিয়ে বলছে, 'ছেলেটা চলে গেছে, কিন্তু ঘরে রেখে গেছে অনেক স্মৃতি'।

আমি একমাত্র খালামনি। আহনাফের যতই প্রশংসা করি, কম হয়ে যাবে। সে যেমন ছিল দুষ্ট, তেমন মেধাবী। নাজিয়া আহমেদ (শহীদের খালা)

পারিবারিক অবস্থা

আহনাফের পরিবার একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। তার বাবা বিক্রয় প্রতিনিধি আর মা মারচেন্ডাইজার হিসেবে কাজ করে সংসার চালান। মানিকগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে একটি কাঁচাঘর ছাড়া তাদের আর কোনো ভিটেমাটি নেই।

তারা কী ফিরবে আজ সুপ্রভাতে?

সহপাঠীরা সবাই পরীক্ষা দিতে বসেছে। একটা ডেস্ক খালি। তাতে একটা ফুলের বুকেট। সাদা কাগজের কালো কালিতে লেখা-শহীদ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ! কলেজের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় সবাই উপস্থিত কিন্তু নেই আহনাফ!

কোথায় আহনাফ? যে ছিল প্রাণবন্ত, চঞ্চল আর উদ্যোমী। ঘাতক মাত্র ১৭ বছরের এমন একটি ফুটফুটে কিশোরকে কীভাবে হত্যা করতে পারে? তার পুরো নাম মো: শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ। সে ছিল স্বাধীনচেতা কিশোর। আর আট দশজনের মতো বাঁধা ধরা নিয়মে চাকরি করতে চাইত না সে। হতে চাইত উদ্যোক্তা। নিজেই কিছু একটা করে তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল খুব। কিন্তু তার সকল ইচ্ছে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় নিষ্ঠুরতম স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পেটুয়া বাহিনীর নির্মম বুলেটের কাছে। কে জানত এই ১৭ বছরের কিশোর শহীদের রক্তের বিনিময়েই বাংলাদেশ থেকে বিদায় হবে একটি মাফিয়াতন্ত্রের। এই কিশোর

শহীদ এই জাতিকে দিয়ে গেছেন মুক্তির স্বাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত কবিতা সবুজের অভিযানের চিরসবুজ শহীদ আহনাফ। কবির ভাষায়-

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,ওরে সবুজ, ওরে
অবুঝ, আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

সত্যিই এই আধমরা জাতিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আহনাফের মতোই কিশোর যোদ্ধারা।

শহীদ আহনাফ ছিল বাবা-মায়ের জ্যৈষ্ঠ পুত্র। বাবা নাসির উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন বিক্রয় প্রতিনিধি। শহীদ জননী সাফাত সিদ্দিকী পারভীন ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠানের মার্চেন্ডাইজার। পিতামাতার বড় আদরের তনয় ছিল সে। মিরপুরের মধ্য পাইকপাড়ার ঘর আলোকিত করে অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখ ২০০৭ সালে জন্ম হয় আহনাফের। প্রথম সন্তানকে হৃদয়ের সব আদর বিলিয়ে বড় করে তুলে তার পিতামাতা। এসএসসির পর রাজধানীর বিএএফ শাহীন কলেজে বাণিজ্য বিভাগে তাকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। সহপাঠীদের সাথে আহনাফের ছিল অসাধারণ সখ্য। তার অনেকগুলো গুণের মধ্যে অন্যতম একটি হলো অন্যায় প্রতিবাদ করতে পারার সাহস। দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার তার কিশোর মনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

২০২৪ সালের জুলাই মাস। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার

ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার আগ্নেয়গিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন সহিংস হয় ১৫ জুলাই থেকে।

আন্দোলনে নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের ওপর সশস্ত্র ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন জনমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়।

রাজধানী মিরপুরের ১০ নম্বর গোল চত্বর ছিল অন্যতম একটি ব্যাটেল গ্রাউন্ড। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক কুখ্যাত সন্ত্রাসী মইনুল হোসেন খান নিখিলের ইন্ধনে বার বার হামলা চালানো হয় মিরপুরে। শহীদ আহনাফ ছিল মিরপুর সংগঠিত আন্দোলনের একজন অন্যতম সৈনিক। এর আগে রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাসে আহত হয়ে বাসায় গেলে তার মা খালারা তাকে আন্দোলনে না যেতে অনুরোধ করে।

৪ আগস্ট বাংলাদেশ জুড়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসূচি চলমান। এরই মধ্যে মিরপুর গোল চত্বরে ৯ দফা দাবী আদায়, গণগ্রেফতার বন্ধ ও হত্যাকারীদের বিচারের দাবীতে ৪ ঘণ্টা অবস্থান করে আন্দোলনকারীরা। মিরপুর ৪ আগস্ট শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সবাই দেশীয় অস্ত্র, বন্দুক, শটগান নিয়ে গোলচত্বরে অবস্থান নেয়। পরবর্তীতে তুমুল প্রতিরোধে টিকতে না পেরে পিছু হটে নিখিলের নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা।

শহীদ আহনাফের মা তাকে বাসার বাইরে না যেতে বারবার তাগাদা দিচ্ছিল। চোখে চোখে রাখছিল তাকে। কিন্তু বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রেডি হয়ে দ্রুত নিচে নেমে পড়ে শহীদ আহনাফ। বিকেলে চারটায় ফোন দিয়ে মাকে জানায় সে মিরপুর ১০ নম্বরে আছে। টেনশন না করতেও আশ্বস্ত করে সে। মায়ের সাথে তার এই কথাই ছিল সর্বশেষ কথা। এরপর তার সাথে আর যোগাযোগ করা যায়নি।

সন্ধ্যা ৭:৩০ এ একটি ফেসবুক ভিডিওতে দেখা যায়- গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই শাহাদাত বরণ করেন বীর কিশোর শহীদ আহনাফ। ঘাতকের বুলেটটি লেগেছিল তার পেটে। আহনাফকে সমাহিত করা হয় মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাদির কবরের পাশে।

শহীদ আহনাফের গর্বিত মা বলেন- আমার ছেলে ছিল অসাধারণ সাহসী। তার কথাগুলো আজও আমার কানে বাজে। "তোমাদের মতো ভীতু মা খালাদের জন্য ছেলে মেয়েরা আন্দোলনে যেতে পারছে না। ১৯৭১ সালে যদি তোমাদের মতো মা-খালারা থাকতো তাহলে দেশ স্বাধীন হতো না! "

সত্যি অসীম সাহসের বাতিঘর ছিল আমাদের শহীদ আহনাফ।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণনাম	: মোঃ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ
জন্ম	: ১৩ই অক্টোবর ২০০৭, ঢাকা
শহীদের পেশা	: ছাত্র, বিএএফ শাহীন কলেজ, একাদশ শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ
পিতা	: নাসির উদ্দিন আহমেদ (৪৭), বেসরকারি চাকুরিজীবী
মাতা	: পারভীন (৩৭), বেসরকারি চাকুরিজীবী
স্থায়ী ঠিকানা	: মানিকগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: ৪৪/৫, মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর-২, ঢাকা
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	: ১ ভাই
ভাই	: ইফতেখার আহমেদ (১২), ছাত্র, ৬ষ্ঠ শ্রেণি
শাহাদাৎ	: ৪ আগস্ট বিকাল সাড়ে ৫ টায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে
দাফন	: মিরপুর-১ শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান

সহযোগিতার প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান করে দেওয়া যেতে পারে

২. শহীদের ভাইকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা যেতে পারে

'স্বাধীন দেশের মুক্তিকামী নবীন বীরকে ওরা বাঁচতে দেয়নি'

শহীদ হাফেজ মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ

ক্রমিক : ০৭১

আইডি: ঢাকা সিটি ০৭১

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

হাফেজ মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ ২০০৭ সালের ১৩ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন এবং মায়ের নাম মলিনা বেগম। তিনি নিজ গ্রামের বিদ্যাপীঠ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকার খিলগাঁও মোহাম্মাদিয়া হাফিজুল উলুম মাদরাসা থেকে পবিত্র কুরআন হেফজ সম্পন্ন করে পার্শ্ববর্তী আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম কওমি মাদরাসায় ভর্তি হন। তাঁর একটি ছোট ভাই রয়েছে। নাম জুনায়েদ আহমাদ। তিনিও পবিত্র কোরআনের হাফেজ।

শহীদ জুবায়ের আহমেদের বাবা জনাব কামাল উদ্দিন একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলায়। জনাব কামাল উদ্দিন অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তার বাবা মারা গিয়েছিল। এরপর তিনি বড় ভাইয়ের কাছেই মানুষ হয়েছেন। পরবর্তীতে তার নানী ওসিয়ত করে যায় যে-তাদের পৈতৃক যতটুকু জমি ছিল সবটাই বড় ভাইকে দিতে হবে। সে অনুযায়ী পরিবার থেকে পাওয়া সকল জমি বড় ভাইয়ের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন শহীদের বাবা কামাল উদ্দিন। বর্তমানে তাঁর কোনো প্রকার জায়গা জমি নেই। স্ব-পরিবার নিয়ে খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ গোড়ানে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করেন। সন্তানদেরকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল তার। যে কারণে দুই ছেলেকে কুরআনের হাফেজ বানিয়েছেন তিনি। শহীদের মা হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে ভুগছেন এবং আর বাবা কামাল উদ্দিনও ফুসফুসের ইনফেকশনে আক্রান্ত।

২৪ এর বিজয় উৎসব

আন্দোলনের শুরু থেকেই ঘাতক দালাল পুলিশ বাহিনী ও স্বৈরাচারী সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে আক্রমন চালাতে থাকে। ২রা জুলাই থেকে ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষনা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা। কর্মসূচী ভেস্তে দিতে টিয়ার শেল, রাবার বুলেট, ছড়রা গুলি, গুম, খুন, নির্যাতন, মামলা করে ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন চালায় ফ্যাসিস্ট হাসিনার পালিত দলীয় ক্যাডার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। দেশীয় অস্ত্র ও রাইফেল নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে আওয়ামীর দাগী সন্ত্রাসীরা।

দীর্ঘদিন আন্দোলন চলার ফলে ভীত সঞ্চারিত হয়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কারফিউ ঘোষণা করে তৎকালীন খুনি শাসক শেখ হাসিনা। সেই কারফিউ ভেঙে রাজধানীর অলিগলিতে অবস্থান নেয় আপামর ছাত্র-জনতা। এরপর বেলা দুইটায় গণমাধ্যমে খবর আসে, পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। ঢাকার রাজপথসহ সারাদেশে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা বিজয় উল্লাস করতে থাকেন।

যে মাসে জন্ম তাঁর সে মাসেই মৃত্যু! তফাৎ শুধু সনের।
সেই মাস কী তাহলে উৎসবের রইলো? না কী শোকের?

শহীদের প্রেক্ষাপট

০৫ আগস্ট ২০২৪ সারাদেশের জনগণ গনভবন ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। সাধারণ জনতা ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে শাহবাগে মিলিত হয়। পরবর্তীতে একসাথে গনভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফলে বাধ্য হয়ে হাসিনা সরকার পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যায়। সারাদেশে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিছিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিকালে বাসা থেকে বের হন জুবায়ের। মিছিল সামনের দিকে অগ্রসর হয়। চারিদিক থেকে স্বৈরাচার হাসিনার দোসর পুলিশ বাহিনী গুলি চালাতে থাকে। হঠাৎ কয়েকটি গুলি জুবায়েরের পেটে এসে বিদ্ধ হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। উপস্থিত ছাত্র জনতা দ্রুত তাঁকে মুগদা মেডিকেলে নিয়ে যায়। বুক এবং পেট থেকে ফিনকি দিয়ে যেন রক্তের বন্যা বয়ে যায়। তাঁকে বাচাতে হাসপাতালের

চিকিৎসকেরা সব রকম প্রচেষ্টা করে। তারপরও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘাতকের গুলিতে হাসপাতালের বেডে সন্ধ্যা ০৭:৩০ এর সময় শাহাদত বরণ করেন শহীদ জুবায়ের। পরবর্তীতে শহীদের লাশ গ্রামের বাড়িতে নেয়া হয়। নিজ এলাকা লাহিনীপাড়া কেন্দ্রীয় গোরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হন শহীদ দেশপ্রেমিক বীর হাফেজ জুবায়ের আহমাদ।

'আশ্চর্য লোভ ছিল আমার, লোভ ছিল বেঁচে থাকবার, তবে, মাথা উঁচু করে,
অন্যায়, অনিয়ম, দাসত্বে মাথা নোয়াবো না বলে, আমি মিছিলে গিয়েছিলাম,
তথাকথিত সমরাস্ত্রের নির্লজ্জ বুলেট আমার মাথায় আঘাত করে!
মৃত্যু সমুদ্র ঝড়ে আমি লাশ হলাম।'

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ
কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
৪৬তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা
১৪৪৪ হিজরি/১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০২৩ ঈসায়ী

মারহালা - হিফযুল কুরআন

রোল নং - ১০৬৮৯৪		রেজি. নং - ২৭০৮৮
নাম - মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ		জন্ম তারিখ - ১৩-০৮-২০০৭
পিতা - মোহাম্মাদ কামাল উদ্দিন		
মাদরাসা - মুহাম্মদিয়া হাফিজুল উলূম মাদরাসা ও এতিমখানা, খিলগাঁও রেলগেট বাজার, মতিঝিল, ঢাকা, 5/1635		
মারকায - জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ১০৩৭, মালিবাগ বাজার রোড, খিলগাঁও, ঢাকা, 1/31		
ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাপ্ত নম্বর
১	হিফয (ইয়াদ)	৭৪
২	তাজবিদ	৪৮
৩	দীনিয়াত (মৌখিক)	৪৯
	মোট প্রাপ্ত নম্বর	১৭১
	প্রাপ্ত বিভাগ	জায়্যিদ জিদ্দান
	মেধা স্থান	০

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Chapra Union Parishad
Kumarkhali, Kushtia
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 18/08/2024
Death Registration Number 20072692002283733
Date of Issuance 18/08/2024

Date of Birth : 13/08/2007 Sex : Male
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ	Name	: Mohammad Jubayer Ahmad
মাতা	: মলিনা বেগম	Mother	: Molina Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন	Father	: Mohammad Kamal Uddin
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Moshiur 18.08.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MD. MOSHIUR RAHMAN
SECRETARY
6 NO. CHAPRA UNION PARISHAD
KUMARKHALI, KUSHTIA

18.08.24
Seal & Signature
Registrar
MD. ENAMUL HAQUE MONZU
CHAIRMAN
6 NO. CHAPRA UNION PARISHAD
KUMARKHALI, KUSHTIA

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

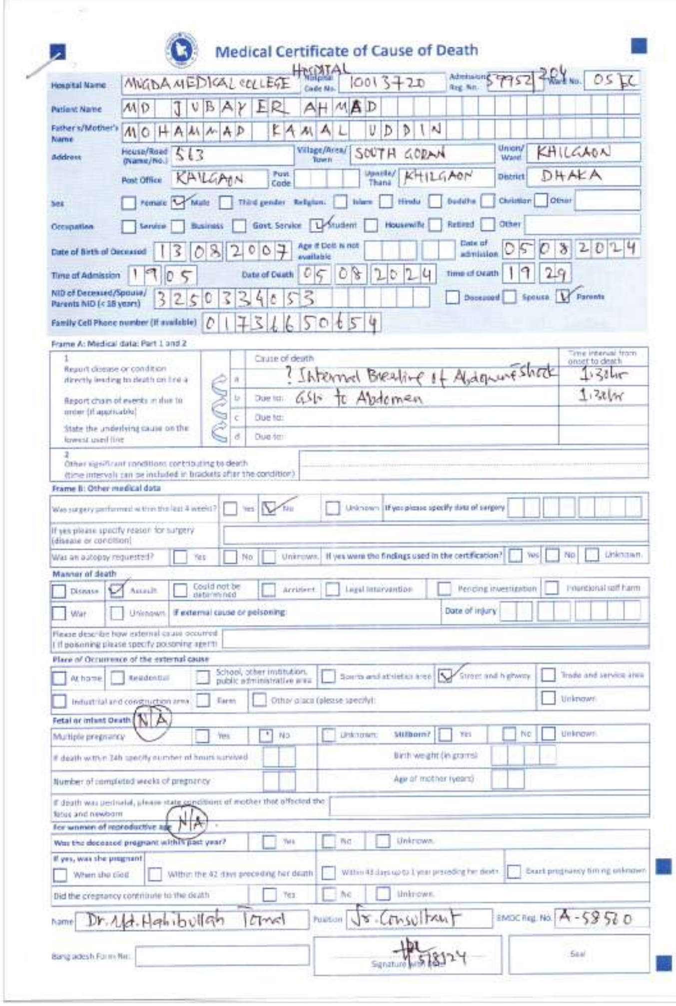

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name	MUGDA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
Hospital Code No.	10013720
Admission Reg. No.	57952/204
Ward No.	05 FC
Patient Name	MD JUBAYER AHMAD
Father's/Mother's Name	MOHAMMAD KAMAL UDDIN
Address: House/Road (Name/No.)	513
Village/Area/Town	SOUTH GORAN
Union/Ward	KHILGAON
Post Office	KHILGAON
Post Code	
Upazila/Thana	KHILGAON
District	DHAKA
Sex	Male ✓
Religion	
Occupation	Student ✓
Date of Birth of Deceased	13 08 2007
Age if DoB is not available	
Date of admission	05 08 2024
Time of Admission	19 05
Date of Death	05 08 2024
Time of Death	19 29
NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years)	3250334053 (Parents ✓)
Family Cell Phone number (If available)	01731650654

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

		Cause of death	Time interval from onset to death
1 Report disease or condition directly leading to death on line a	a	? Internal Bleeding of Abdomen & Shock	1:30hr
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Due to: GSI to Abdomen	1:30hr
State the underlying cause on the lowest used line	c	Due to:	
	d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? No ✓

Was an autopsy requested?

Manner of death: Assault ✓

Place of Occurrence of the external cause: Street and highway ✓

Fetal or infant Death: N/A

For women of reproductive age: N/A

Name: Dr. Md. Habibullah Tamal — Position: Jr. Consultant — BMDC Reg. No. A-58520

Signature with date: 5/8/24

Seal

এক নজরে শহীদ জুবায়ের আহমাদ

নাম	: হাফেজ মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ
পিতার নাম	: মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন
মাতার নাম	: মলিনা বেগম
পেশা	: ছাত্র
মাদ্রাসার নাম	: আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: লাহিনীপাড়া, ডাকঘর: মোহিনী মিল, থানা: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া
ডেথ সার্টিফিকেট নং	: ২০০৭২৬৯২০০২২৮৩৭৩৩
মৃত্যুর তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪
কিভাবে মারা যায়	: পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে পরবর্তীতে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে মারা যায়
কবরস্থান	: লাহিনীপাড়া কেন্দ্রীয় গোরস্থান, লাহিনীপাড়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
জন্ম-তারিখ	: ১৩/০৮/২০০৭; বয়স: (১৭)

শহীদ মো: রমজান আলী

ক্রমিক : ০৭২

আইডি : ঢাকা সিটি ০৭২

শহীদ পরিচিতি

নাম : মো: রমজান আলী

জন্ম : ১৫-১০-১৯৮১

নেত্রকোনা থেকে ঢাকায় আসেন আজ থেকে ৩৫ বছর আগে। গ্রামে ছিল তার কষ্টের জীবন। অভাব অনটনে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠেছিল। এরপর তার চলে আসেন রাজধানীতে। জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করছিলেন। রমজান আলী একজন সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ। ছিলেন মাতৃভক্ত। ঘরে তার মা অসুস্থ। অসুস্থ মাকে সুস্থ করে তোলা তার জীবনের বড় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যাবতীয় চিকিৎসা চালিয়ে যান। সংসারে একমাত্র রোজগারি মানুষ তিনিই। কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। গ্রামের বাড়িতে তার আছে কেবল বসত ভিটা। বসবাস করার জমিটুকু ছাড়া আর কোন জমিজমা নাই। এক ছেলে, এক মেয়ে, মা ও স্ত্রী নিয়ে তার সংসার। রমজান আলীর পিতা মৃত জনাব নুর হোসেন, মা খোদেজা বেগম।

রমজান আলীর শাহাদাত

৫ আগস্ট দেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়। দেশ স্বাধীন হয় দ্বিতীয়বারের মতো। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম অবিভক্ত পাকিস্তানের হয়ে ১৯৪৭ সালে। আমরা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত ছিলাম। এ অঞ্চলের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ভারত জারি রাখে তার চক্রান্ত। শক্তিশালী পাকিস্তানকে দুর্বল করতে হলে রাষ্ট্রটি ভাঙতে হবে, এই ছিল ভারতের বাঘা রাজনীতিবিদদের গোপন ভাবনা। সুবর্ণ সুযোগ আসে ১৯৭১ সালে। সহযোগিতার আবরণে একটি দেশকে দু টুকরো করে ভারত তার মিশন সফল করে। ইন্দিরা গান্ধী ৭১ এ ভারতের পার্লামেন্টে উল্লাস করে বলেন **"হাজার সালকা বদলা লে লো"**। তারপর থেকেই আমরা ভূখণ্ড পেলাম। সীমান্ত পেলাম, পৃথক মানচিত্র পেলাম। কিন্তু আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। বরং বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কুটনৈতিক চাপে পড়ে রইলাম বিগত পাঁচ দশক। ৫ আগস্ট তাই আমাদের যে মুক্তি এটি আসলে দ্বিতীয় স্বাধীনতাই। ৫ আগস্ট সফল করতে হাজার মানুষকে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে। নির্যাতন, নিপীড়ন সইতে হয়েছে। বরণ করতে হয়েছে শাহাদাতের মৃত্যু।

৫ আগস্ট এসেছে রক্তাক্ত জুলাইয়ের হাত ধরে। জুলাইয়ে শুরু হয় "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। পরবর্তীতে তা পরিণত হয় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। এই আন্দোলন দমন করতে সরকার তার সকল অস্ত্র প্রয়োগ করে। সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে দেশকে। একটি স্বাধীন দেশকে সরকার পরিকল্পিতভাবে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। একটি দেশে যুদ্ধ লাগলে যেসব পদক্ষেপ নেয় সরকার নিরীহ আন্দোলনকারীদের প্রতি তা প্রয়োগ করে। বিভিন্ন সূত্রমতে পার্শ্ববর্তী দেশের সেনাবাহিনীর স্পেশাল ইউনিটও কাজ করে এই দমন কার্যক্রমে। সরকার পুলিশ, বিজিবিকে মাঠে নামায়। সেনাবাহিনীকেও মাঠে নামায়। সমস্ত রকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ম্যাসাকার করে। আন্দোলন তবু দমে যায়নি। আরও উত্তপ্ত হয়। সরকার তার নিয়মিত বাহিনীর সাথে যোগ করে দলীয় ক্যাডার বাহিনী। নির্যাতনে অংশ নেয় যুবলীগ, আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী কর্মীবাহিনী।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক কর্মসূচি আসতে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিচিত ছিল হরতাল,অবরোধের মতো কর্মসূচি। বৈষম্যবিরোধী কর্মসূচির নায়করা আন্দোলনে প্রয়োগ করে শাটডাউনের মতো শব্দ। জনমানুষ আকৃষ্ট হয়। প্রথমত শাটডাউন চলে শাহবাগ কেন্দ্রিক। তারপর ক্রমান্বয়ে আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। শাটডাউন, কমপ্লিট শাটডাউনে চলে আসে সারাদেশ। পুলিশের গুলিতে, যুবলীগের গুলিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়তে থাকে লাশ। দেশ একসময় লাশের রাজ্য হয়ে পড়ে। একদিনে শতাধিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। শত্রু দমনের মতো সরকার ঠিক যুদ্ধবাজ ভূমিকায় নামে। টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেটের জায়গায় ব্যবহৃত হতে থাকে মারণাস্ত্র। সরাসরি গুলিতে প্রাণ চলে যায় শত শত জনতার। ছাত্র- জনতার সামনে পিছে হঠার সমস্ত রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিজয় ও মরণ এই দুই সমীকরণের মাঝামাঝি আর কোনো অপশন অবশিষ্ট থাকেনি। সরকার হেলিকপ্টার থেকে গুলি নিক্ষেপ করে। অবশেষে আসে ৫ আগস্ট। লং মার্চ টু ঢাকা। গণভবন ঘেরাও কর্মসূচি। জনজোয়ার নামে ঢাকায়। সফল হয় আন্দোলন। পালিয়ে যায় শেখ হাসিনা। আট শ বছরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। লক্ষণ সেনের পর শেখ হাসিনার পলায়ন। জাতি মুক্তি পায় ফ্যাসিস্ট, রেজিম, স্বৈরাচারের হাত থেকে। প্রাণ যায় শত মানুষের। শত নিরপরাধ মানুষের তরতাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বিজয়।

তখনও স্বৈরাচারের প্রেতাত্মারা কোথাও কোথাও থেকে যায় হায়েনা রূপে। ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পয়েন্টটিতে ওৎপেতে থাকে তখনও স্বৈরাচারের সন্ত্রাসী যুবলীগ ও পুলিশের খুনী বাহিনী।

রমজান আলী একজন খেটে খাওয়া মানুষ। প্রতিদিনের মতো কাজ করে ফিরছেন বাসায়। পুলিশের একটি গ্রুপ মারণাস্ত্র নিয়ে যেন অপেক্ষায় ছিল কারও প্রাণ কেড়ে নেওয়ার নেশায়। ৫ আগস্ট মানুষেরা বিজয় মিছিল শেষে ফিরছেন বাসায়। রমজান আলী ফিরছেন কাজ শেষে। ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আসতেই পুলিশ গুলি ছোড়ে। আক্রান্ত হন রমজান আলী। ডান হাতের বাহুতে গুলি

লাগে। সাথে সাথে লুটিয়ে পড়েন। রাত তখন দুইটা। পথচারীরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ঐদিনই। রমজান আলীর মৃত্যুতে পরিবারটি চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ঢাকার মিনার মসজিদে তার প্রথম জানাজা হয়। দ্বিতীয় জানাজা হয় নিজ গ্রামে। নেত্রকোনায় স্থানীয় গোরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

প্রতিবেশী আব্দুল কাদের বলেন,রমজান আলী একজন ভালো মানুষ ছিলেন। খুব বিনয়ী ও সৎ ছিলেন। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। কর্মঠ মানুষ ছিলেন। পরিবারের প্রতি ছিলেন দায়িত্ববান। মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন তিনি। রমজান আলীর মৃত্যুতে শোকাহত। দোষীদের বিচার চাই।

প্রস্তাবনা

- তার মা অসুস্থ। পরিবারে উপার্জনের আর কেউ নাই। এককালীন অনুদানের প্রস্তাব করছি।
- মাসিক ভাতা দেয়া যায়।
- বাসস্থানের ব্যবস্থা জরুরি।
- ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- মেয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগান প্রয়োজন।
- উপযুক্ত শিক্ষিত করতে সমস্ত খরচ ফ্রি করা দরকার।
- বিবাহ যোগ্য হলে বিবাহের খরচ বহন করা প্রয়োজন।

প্রোফাইল

নাম	: মো: রমজান আলী
জন্ম তারিখ	: ১৫-১০-১৯৮১ সাল
পিতা	: মৃত জনাব নুর হোসেন
মাতা	: মোসা: খোদেজা বেগম
পরিবারের সদস্য	: মা, স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে
পেশা	: কাঠমিস্ত্রী
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: ৫ম শ্রেণি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দুন্ধি, ইউনিয়ন: বিলজোড়া, থানা: পূর্বদোলা, জেলা: নেত্রকোনা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ৯৫০, পোস্ট অফিস এলাকা, গুলশান ১২১২, থানা: গুলশান ঢাকা
আহত	: পুলিশের গুলিতে আহত ৫ আগস্ট রাত ২টায় (ডান হাতের উপরের অংশ)
ঘটনার স্থান	: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে
মৃত্যু	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কবর	: নিজ গ্রাম
মৃত্যু	: ৫ আগস্ট, রাত ২টা, ২০২৪ সাল

“সবাইকে কাদিঁয়ে চলে গেলেন রবের তরে”

শহীদ মোঃ মনির হোসাইন

ক্রমিক : ০৭৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০৭৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: মনির হোসাইন ১৯৯৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার কয়রতখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব কাটে গ্রামের নির্মল বাতাসে। স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে পরিবারের সাথে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় খিলবাড়ির টেক, অটোস্ট্যান্ড, ভাটারা এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় উঠেন।

মনির পড়াশোনায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। ছোট থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী এবং পরিশ্রমী। রাজধানীর একটি পলিটেকনিক কলেজে পড়াশোনা শুরু করছিলেন। ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা শেষ করে পরিবারের হাল ধরবেন কিন্তু আর্থিক সংকটের কারনে তাঁকে পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়।

তাঁর বাবা-মা দুজনেই অসুস্থ। মা মোছাঃ মিনারা বেগম এক বিরল রোগে আক্রান্ত। মাথার রগ ছিড়ে গেছে। তিনি এখন প্রতিবন্ধি। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে বাবা পরিবার ছেড়ে চলে যান। শহীদ মনিরের ছোট আরও ২টা ভাই বোন আছে। বাবা দায়িত্ব না নিয়ে চলে যাওয়ার পর অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খরচ এবং ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব শহীদ মনিরের কাধে এসে পড়ে। পরিবারের করুণ অবস্থা দেখে তিনি বসে থাকতে পারেন না। কঠোর পরিশ্রম শুরু করে দেন। ঢাকায় একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ শুরু করেন। পরিবারে আর্থিক সহায়তা করার মত আর কেউ ছিল না। তার ছোট ভাই এলাকার বখাটেদের সাথে মিশে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর ছোট বোনের সার্বক্ষণিক মায়ের সেবা-যত্ন করতেই সময় চলে যায়। শহীদ মনিরের একমাত্র আয়েই সংসার চলত। মায়ের চিকিৎসা করার সামর্থ তাঁর ছিল না।

শহীদ মনির ছিলেন একজন অকুতোভয় সাহসী তরুণ। জীবদ্দশায় কখনো কোনো অন্যায় কাজে তিনি লিপ্ত হননি। সবসময় চেষ্টা করেছেন সৎ পথে থাকার। বাবা পরিবার থেকে চলে গেলে নিজেই সংসারের হাল ধরেন। ব্যবহারে ছিলেন অমায়িক। কখনো কারও সাথে বিবাদে লিপ্ত হননি।

জুলাই বিপ্লবের তিনি ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা। জীবন দিয়ে স্বাধীনতা উপহার দিয়ে যান আমাদেরকে। হাসতে হাসতে শামিল হন। মৃত্যুর মিছিলে। তিনি এক অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক। সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন অন্যের জন্য। কখনো নিজের কথা ভাবেননি। দেশের স্বার্থে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন তিনি। ১৯ জুলাই ২০২৪ স্বৈরাচারের নির্মমতার স্বীকার হন। ঘাতক পুলিশের বুলেটের আঘাতে মৃত্যু ঘটে তার। শাহাদাত বরণ করেন তিনি। দিয়ে যান একটি স্বাধীন দেশ। তার পরিবার হারায় একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটিকে।

শাহাদাতের নিদারুণ বর্ণনা।

১৯ জুলাই ২০২৪ মনির আন্দোলনে যোগ দেন। এই দিনটিই ছিল তার জীবনের শেষ দিন। শাহাজাদপুরের বাটার গলির সামনে আন্দোলনকারীদের সাথে অবস্থান নেন তিনি। সেখানেই পুলিশের গুলিতে তিনি আহত হন। গুলি তার পেটের এক পাশে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তখন তার মত আরও অনেকেই পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিল। উদ্ধার করার মত কেউ ছিল না। চারিদিকে টিয়ারশেলের ধোঁয়ায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সবাই পানি পানি বলে চিৎকার করছিল। কিন্তু এক ফোঁটা পানি দেওয়ার মত কেউ ছিল না সেখানে। পুলিশ আশেপাশের উচুঁ ভবনের উপর থেকে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল ও গুলি নিক্ষেপ করছিল। সেখানে আহত অবস্থায় পড়ে ছিল শহীদ মনিরের নিথর দেহটি।

গুরুতর আহত অবস্থায় আন্দোলনকারীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শহীদ মনির হোসেনের লাশ গুম করার চেষ্টা করা হয়। টানা ৫ দিন পরে ২৪ জুলাই মরদেহ উদ্ধার করে বরিশালে নানার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত ১১ টায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। একটি পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

এক অসহায় অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারে জন্ম হয় শহীদ মোঃ মনির হোসাইনের। দরিদ্রতার কারনে জীবিকার তাগিদে পরিবারের সাথে ঢাকায় পাড়ি জমান। ঢাকায় এসে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠেন। বাবা-মা দুজনেই অসুস্থ। তাঁর মা এক বিরল রোগে আক্রান্ত। মাথার রগ ছিড়ে গেছে। তিনি এখন প্রতিবন্ধি। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে বাবা একদিন পরিবার ছেড়ে চলে যান। আর ফিরে আসেন না। তাঁর ছোট আরও ২ টা ভাই বোন আছে। বাবা পরিবার থেকে চলে যাওয়ায় সংসারের সকল দায়-দায়িত্ব শহীদ মনিরের উপর পড়ে। একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ শুরু করেন। পরিবারে আর্থিক সহায়তা করার মত আর কেউ ছিল না। তার ছোট ভাই এলাকার বখাটেদের সাথে মিশে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর ছোট বোনের

সার্বক্ষণিক মায়ের সেবা-যত্ন করতেই সময় চলে য়ায়। শহীদ মনিরের একমাত্র আয়েই সংসার চলত। মায়ের চিকিৎসা করার সামর্থ তাঁর ছিল না। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ঢেউ বইতে থাকে। ছেলেকে হারিয়ে মা পাগলপ্রায়। তাদের অবস্থাও এখন শোচনীয়। বাড়িতে নিজস্ব কোন জায়গা জমিও নেই, যা দিয়ে তাদের সংসার চলবে। আত্মীয়স্বজনদের কেউ তাদের সহযোগিতা করবে সে সুযোগও নেই।

নিকটাত্মীয়ের বর্ণনা

প্রতিবেশি মো: সোহেল রানা বলেন, "শহীদ মনির হোসাইন আন্দোলনে যোগদান করে শহীদ হন। তিনি তার পরিবারের খরচ বহন করতেন। তার মা অসুস্থ। মনির ছাড়া তার পরিবার খুবই অসহায়। মনির হোসাইন ছিলেন সৎ ও সাহসী যুবক। পরিবারের সবাইকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তার মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকাহত।"

Medical Certificate of Cause of Death

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: মনির হোসাইন; পেশা: চাকরিজীবি
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৫/১২/১৯৯৬, ২৭ বছর
পিতা	: জনাব মো: শাহাজাহান ফরাজী
মাতা	: মোছা: মিনারা বেগম
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪
আহত হওয়ার স্থান	: শাহাজাদপুর বাটার গলির সামনে
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪, সন্ধ্যা: ৬:৩০
দাফন	: ২৪ জুলাই, ২০২৪, তার মরদেহ উদ্ধার করে বরিশালে নানার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় জানাজা শেষে সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়

"সারা জীবন অন্যের নিরাপত্তা দিলেও নিজের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারলেন না ইসহাক"

শহীদ মোঃ ইসহাক জমদ্দার
ক্রমিক : ০৭৪
আইডি : ঢাকা সিটি ০৭৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ ইসহাক জমদ্দার ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সালে বরগুনা জেলার বামনা উপজলোর বেবাজিয়াখালী গ্রামের একটা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুল আজিজ একজন কৃষক এবং মাতা জোবেদা খাতুন একজন গৃহিণী ছিলেন। দরিদ্রতার কারণে তিনি তাঁর পড়াশোনা বেশিদুর চালিয়ে যেতে পারেননি। অল্প বয়সেই পরিবারের হাল ধরতে হয় তাঁকে।

কর্মজীবন

পেশাগত জীবনে তিনি নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে ঢাকার আদাবরে বসবাস শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত সৎ এবং নিষ্ঠাবান একজন ব্যাক্তি ছিলেন। ইসহাক পেশায় নিরাপত্তা প্রহরী হলেও সামান্য বেতনে বাবা-মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তানসহ ৬ সদস্যের বড় পরিবারের ভরণপোষণ মেটাতে মাঝে মাঝে তিনি দিনমজুরের কাজও করতেন। অভাবী পরিবারের হাল ধরতে তাঁর দুই ছেলে সবুজ সেলসের কাজে এবং সজীব রংমিস্ত্রির কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পেশাজীবনে নিরাপত্তা প্রহরী হওয়ায় অন্যকে নিরাপত্তা দেওয়াই ছিল ইসহাকের প্রধান কাজ।

সংগ্রামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ

সারাজীবন অন্যকে নিরাপত্তা দিলেও ৫ আগস্ট দ্বিতীয় স্বাধীনতার দিনে নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে আন্দোলনে অংশ নেন বরগুনার বীর সন্তান ইসহাক জমাদ্দার। ঐদিনই (৫ আগস্ট, ২০২৪) ছাত্রজনতার আন্দোলনের চাপে স্বৈরাচারী হাসিনা যখন পদত্যাগ করে দেশ হতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তখন ইসহাক জমাদ্দার সেই খবর পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বেলা ১২ টায় গণভবন অভিমুখে রওয়ানা দেন। এদিকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পেটুয়া বাহিনী ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালাচ্ছিল। তারা পাখির মতো মানুষ মারছিল। তারা সাইকো শেখ হাসিনার পালানোর খবর জানতেই পারেনি। পেটুয়া পুলিশ বাহিনী সাধারণ মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করেনি। ওরা স্নাইপার, রাইফেল, একে-৪৭ দিয়ে একের পর এক সাধারণ ছাত্র জনতার বুক তাক করে গুলি ছুড়তে থাকে।

এমতাবস্থায় ইসহাক জমাদ্দার শ্যামলীর লিংক রোডে যখন পৌঁছান তখন নির্দয় পুলিশ বাহিনীর ছোড়া একটি বুলেট হঠাৎ তার বাম হাতের বাহু ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে যান পীচঢালা শক্ত রোডে, রক্তে লাল হয়ে যায় তার শরীর। সেখানেই পড়ে ছটফট করতে থাকেন তিনি। তাৎক্ষনিক ইসহাকের সহযোদ্ধারা তাঁকে সোহরাওর্য়াদী মেডিক্যাল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করান। তখন ডাক্তাররা শুনিয়ে দেয় সেই হৃদয় বিদারক দুটি শব্দ, 'আমরা দুঃখিত' ' তিনি আর এ পৃথিবীতে নেই। বুলেটে জর্জরিত হওয়ার আগে বিকাল ৫ টায় তাঁর ছেলের সাথে মাত্র কয়েক মুর্হুত কথা বলার সুযোগ পান তিনি। দেশের জন্য চিন্তা করতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দেন। জমাদ্দারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে তার পরিবারের উপর। দুঃখের ছায়া নেমে আসে এলাকাবাসীর মাঝে। তাঁর প্রথম জানাজা হয় ঢাকার আদাবরে এবং দ্বিতীয় জানাজা হয় তাঁর জন্মভূমি বরগুনার বামনায়।

ফ্যাসিস্ট হাসিনার নির্মমতার শিকার এই নিরীহ ব্যাক্তি ছিলেন তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-প্রতিবেশিদের মাঝে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। এভাবেই ঝড়ে গলে আরেকটি তাজা প্রাণ। তিনি তার সাহসিকতার জন্য বাংলার বুকে এবং প্রতিটি বাঙালীর বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

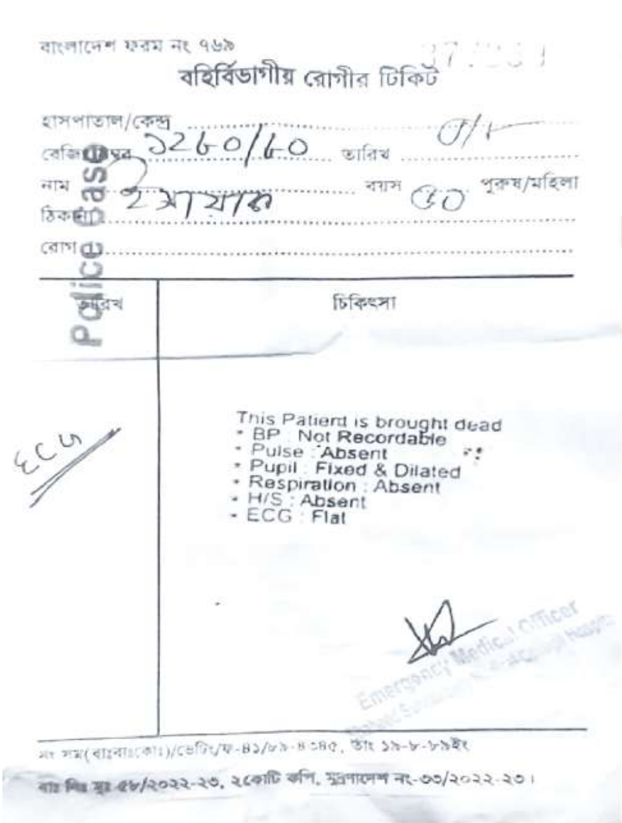

বাংলাদেশ ফরম নং ৭৬৯

বহির্বিভাগীয় রোগীর টিকিট

হাসপাতাল/কেন্দ্র ...... রেজিঃ নম্বর ১২৮০/৮০ তারিখ ......

নাম ইসহাক ...... বয়স ৫০ পুরুষ/মহিলা

ঠিকানা ......

রোগ ......

তারিখ	চিকিৎসা
ECG	This Patient is brought dead - BP Not Recordable - Pulse Absent - Pupil Fixed & Dilated - Respiration Absent - H/S Absent - ECG Flat Emergency Medical Officer

বাঃ মুঃ বাঃ ৫৮/২০২২-২৩, ২কোটি কপি, মুদ্রণাদেশ নং-৩৩/২০২২-২৩।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পুরো নাম	: মো: ইসহাক জমদ্দার
জন্ম তারিখ	: ০৪-০২-১৯৭৭
পিতার নাম	: আব্দুল আজিজ
মাতার নাম	: জোবেদা খাতুন
পেশা	: নিরাপত্তা প্রহরী
পরিবারের সদস্য	: ৬ জন
মাসিক আয়	: ২০,০০০ টাকা
ছেলে-মেয়ের সংখ্যা	: দুই ছেলে
প্রথম ছেলে	: সবুজ, পেশা: সেলস ওয়ার্কার
দ্বিতীয় ছেলে	: সজীব, পেশা: রংমিস্ত্রি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বেবাজিয়াখালী, ইউনিয়ন: বামনা সদর, উপজেলা: বামনা, জেলা: বরগুনা
বর্তমান ঠিকানা	: উত্তর আদাবর ২৩ নং হোল্ডিং
থানা	: আদাবর, জেলা-ঢাকা
আঘাতকারী	: সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর গুলিতে
আঘাত পাওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫টা
নিহত হওয়ার সময় ও স্থান	: সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল হাসপাতালে, গুলি লাগার কয়েক ঘন্টার মধ্যে
শহীদের কবর	: নিজ গ্রামে, বরগুনার বামনায়

শেরেবাংলা নগর

“একই মিছিলে বাবা হলেন গাজী, ছেলে হলেন শহীদ”

শহীদ মোঃ শাহাবুদ্দিন

ক্রমিক : ০৭৫

আইডি: ঢাকা সিটি ০৭৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ শাহাবুদ্দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে ভোলা জেলার চর সামাইয়া গ্রামের আব্দুল কালাম ও মনোয়ারা বিবি দম্পতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আবুল কালাম ও মনোয়ারা বিবি দম্পতি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। শহীদের পিতা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। অভাব অনটনের সংসার সামলানোর জন্য ৬৩ বছর আগে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে ভাতের হোটেলের ব্যবসা শুরু করেন শহীদের পিতা। শহীদের মা একজন গৃহিণী। শাহাবুদ্দিন ও তার স্ত্রী একসাথে বাবা-মায়ের সাথেই ঢাকার ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

শাহাবুদ্দিনের জীবন ছিল খুব সংগ্রামের। অভাব অনটনের সংসারে পড়াশোনার তেমন সুযোগ হয়নি। শৈশব থেকে তিনি ছিলেন কর্মঠ। বাবার ব্যবসা দেখাশোনার পাশাপাশি সিএনজি চালিয়ে সংসারের খরচ বহন করতেন।

যে ভাবে শাহীদ হলেন

এ আন্দোলনটি ছিল মূলত ছাত্রদের যৌক্তিক কোটা সংস্কার আন্দোলন। আর এই যৌক্তিক কোটা সংস্কার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার ও তার পেটুয়া গুন্ডাবাহিনী ছাত্রলীগকে দিয়ে ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে নেক্কারজনক ঘটনার সৃষ্টি করে । অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে পরের দিন সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি দেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। যার মাধ্যমে আন্দোলন তীব্রতর হয়। আন্দোলন সব জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন দমাতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এমপিদের নির্দেশে বিতর্কিত দলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়ে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহত করে।

সেই দিন শহীদ হয় সারা বাংলাদেশে ছয় জন। প্রথমজন হচ্ছেন শহীদ আবু সাঈদ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ১৭ জুলাই থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ন সমাবেশে হামলার প্রতিবাদে এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে রাজপথে নেমে আসে। ছাত্ররা রাজপথ ব্লক করার আহ্বান জানায়। তাদের ডাকে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ ও র‍্যাব আন্দোলনকারীদের রাজপথ থেকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। তাৎক্ষনিকভাবে আন্দোলনকারীরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকে। গুলিতে আহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গুলিবিদ্ধ হওয়া আহতদের অনেকে অধিক রক্তক্ষরণ ও সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিতে না পারায় ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে। লাশের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। তারা যেন হত্যার আনন্দে মেতে উঠে। সারাদেশ জুড়ে সাধারণ জনতার মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ১৭ জুলাই রাতে সারা দেশে কমপ্লিট শাটডাউন অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৮ জুলাই সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকা সহ ৫ জেলায় বিজিবি মোতায়ন করা হয়। ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে সারাদেশে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরের দিন থেকে অবরোধ কর্মসূচিতে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি নির্মমভাবে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে গণহত্যা শুরু করে। ছাত্র জনতা যেন বেরিয়ে আসতে না পারে তাই সেই দিন রাতেই কারফিউ জারি করে স্বৈরাচার সরকার। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের পেটোয়া বাহিনীর মাধ্যমে পরিচালিত ছাত্র জনতার গণহত্যার আন্দোলনের দাবি তখন ১ দফার দাবিতে পরিনত হয়।

৫ আগস্ট পূর্ব ঘোষিত 'মার্চ ফর ঢাকা' সফল করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী পিতা আবুল কালাম ও শাহাবুদ্দিন দোকান বন্ধ করে ছাত্র জনতার গণ আন্দোলনে যোগ দেন । দুপুর বেলায় খবর আসে মাফিয়া সরকার প্রধান শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশের শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ বিজয়োল্লাসে রাজপথে নেমে আসে। মিষ্টির দোকান গুলো খালি হতে থাকে। দেশের কোটি টাকা নষ্ট করে স্বৈরাচার সরকারের বানানো সমস্ত মূর্তি ভাঙ্গা হতে থাকে। সর্বত্র শুরু হয় ঈদের আনন্দ।

আনুমানিক ৭:৩০ মিনিটে শেরে বাংলা নগর চৌরাস্তার কাছে একটি বিজয় মিছিল চলছিলো। মিছিল শেরেবাংলা নগর থানার সামনে আসলে ফ্যাসিস্ট কুলাঙ্গার পুলিশ বাহিনী এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে উচ্ছ্বসিত জনতার উপর। পুলিশের ছোড়া একটি গুলি শাহাবুদ্দিনের মাথায় এসে বিদ্ধ হয় এবং অপর একটি গুলি পায়ে এসে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শাহাবুদ্দিন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনকারীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে জরুরী ভিত্তিতে নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। রাত ৮:৩০ মিনিটে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Charsamaia Union Parishad
Bhola Sadar, Bhola

Death Registration Certificate

Death Registration Number
19870911821123304

Date of Birth: 25/02/1987
Date of Death: 05/08/2024
In Word: Fifth of August Two Thousand Twenty Four
Sex: Male

Name	Md Shahabuddin
Mother	Manwara Bibi
Nationality	Bangladeshi
Father	Abul Kalam
Nationality	Bangladeshi
Place of Death	Dhaka, Bangladesh
Cause of Death	Murder

Seal & Signature

Seal & Signature

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: শাহাবুদ্দিন
জন্মতারিখ	: ২৫-০২-১৯৮৭
পিতার নাম	: আবুল কালাম
মায়ের নাম	: মনোয়ারা বিবি
পেশা	: গৃহিণী
স্ত্রীর নাম	: বিবি হালিমা
বয়স	: ৩৫, পেশা: গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৫ জন
পরিবারের মাসিক আয়	: ১৫ হাজার টাকা
ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা	: দুই মেয়ে
	১. বড় মেয়ে: মোসা: লামইয়া, বয়স ১৪, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সপ্তম শ্রেণি
	২. ছোট মেয়ে : সানজিদা, বয়স সাত, স্বদেশ মৃত্তিকা আদর্শ বিদ্যানিকেতন, প্রথম শ্রেণি
পেশা	: সিএনজি চালক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামচর সুমাইয়া, ইউনিয় চন্দ্র প্রসাদ, থানা সদর, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: ২৮ নং ওয়ার্ড, এলাকার শেরেবাংলা নগর-১২০৭, থানা: শেরেবাংলা নগর, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: শেরেবাংলা নগর থানার সামনে
আঘাতকারী	: সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, সন্ধ্যা ৭:৩০টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪ রাত ৮:৩০ মিনিট নিউরোসাইন্স হাসপাতাল
শহীদের কবরের অবস্থান	: ভোলা

“ফুটবল খেলতে গিয়ে আর ফেরা হলো না রাকিবের”

শহীদ মো: রাকিব হাসান

ক্রমিক : ০৭৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০৭৬

শহীদ পরিচিতি

মাত্র ১২ বছরের হাস্যজ্জ্বল কিশোর মো: রাকিব হাসান। তার জন্ম ২০১২ সালে লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার ৪ নং ঈসাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ নারায়ণপুর গ্রামে। রাকিব মোহাম্মদপুর আই টি জেট স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। পিতা মো: আবুল খায়ের (৪৬) ও মাতা পারভিন আক্তারের তৃতীয় সন্তান রাকিব।

শহীদ রাকিব, একজন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, যার ফুটবল খেলার দক্ষতা এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তাকে তার বন্ধু- বান্ধব ও শিক্ষকদের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল মেধাবী, বিনয়ী এবং ভদ্র আচরণের জন্য সুপরিচিত। গ্রামে তাদের পরিবারিক জমির পরিমাণ প্রায় ১০ কাঠা। কিন্তু পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী তার বাবা। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। ৪৩ বছরের বেশি সময় ধরে শহীদের পরিবার মোহাম্মদপুরের জাকির হোসেন রোডে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করেন।

১৯ জুলাই ছিল অন্য সব দিনের মতোই, শহীদ রাকিব বিকেল ৪:৩০টার দিকে খেলার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। তার গন্তব্য ছিল মোহাম্মদপুর ক্লাবের পাশের কাজী নজরুল ইসলাম রোড, যেখানে প্রতিদিনের মতো ফুটবল খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু সেদিন ছিল তার জীবনের শেষ দিন। হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হয় সে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পুলিশ একটি গুলি ছোড়ে যা সরাসরি তার মাথায় আঘাত হানে। গুলি তার মাথার সামনের দিক থেকে প্রবেশ করে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। গুলির আঘাতে সে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে তার প্রাণবন্ত চোখ দুটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

পথচারীরা দ্রুত তাকে সিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে রাত ৯টার দিকে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শহীদের মৃত্যুতে পরিবার, বন্ধুবান্ধব, এবং প্রতিবেশীরা শোকাহত হয়ে পড়ে। তার এমন আকস্মিক মৃত্যু যেন কেউই মেনে নিতে পারছিল না।

২০ জুলাই, গ্রামের মাটিতে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। রাত ১১টায় লক্ষ্মীপুরের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। গ্রামের প্রতিবেশী কালাম হোসেন, যিনি শহীদকে ছোটবেলা থেকেই চেনেন, তিনি বলেন, "শহীদ অনেক ভালো ছেলে ছিল। ছোট থেকেই পড়াশোনায় খুব মনোযোগী ছিল, এবং ফুটবলেও সে ছিল দুর্দান্ত। সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ হয়ে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের দেখলে সালাম দিতো। সে খুব ভদ্র ছেলে ছিল।"

শহীদের মৃত্যুতে যেন একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। সে ছিল সম্ভাবনাময় এক তরুণ, যার প্রতিভা শুধু ফুটবলে নয়, তার শিক্ষায়ও ফুটে উঠেছিল। তার মৃত্যু শুধু পরিবার নয়, তার স্কুল, খেলার সাথী এবং পুরো সমাজের জন্য এক অমোচনীয় ক্ষতি। শহীদ চিরতরে আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেও তার আদর্শ, তার বিনয়, এবং তার সংগ্রাম আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম

মৃত্যু সনদপত্র

ব্যাক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রাকিব হাসান
পিতা	: মো: আবুল খায়ের
মাতা	: পারভীন আক্তার
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: ৭ম, মোহাম্মদপুর আই টি জেড স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম	: ২০১২
বর্তমান ঠিকানা	: জাকির হোসেন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: দক্ষিণ নারায়নপুর, ৪৯, ইছাপুর, লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ
ঘটনার স্থান	: কাজী নজরুল ইসলাম রোড, মোহাম্মদপুর
আঘাতকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪.৩০টা
নিহত হওয়াত সময়	: রাত ৯.০০টা নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল
কবরের অবস্থান	: নিজ এলাকা, লক্ষ্মীপুর

শহীদ মো: ইয়াসির সরকার

ক্রমিক : ০৭৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০৭৭

শহীদ পরিচিতি

পিতা মাতার অতি স্নেহের সন্তান শহীদ মো: ইয়াসির সরকার। তিনি ২০০৬ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকার শনির আখড়ায় নিজ বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। শহীদ ইয়াসিরের পরিবার ঢাকার স্থায়ী বাসায় বসবাস করেন। তিনি ঢাকার বাড়িতেই লালিত পালিত হন ও বেড়ে ওঠেন। সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জের সরকারি কলেজে এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করতেন। তার পিতা জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেন পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী এবং তার একটি টেইলার্সের ব্যবসা আছে। তবে বর্তমানে শহীদ ইয়াসিরের কারণে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে। শহীদ ইয়াসিরের মা বিলকিস আক্তার পেশায় একজন গৃহিণী।

৫ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ তম। শহীদ ইয়াসিরের বাবা-মাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার কাজটি তিনিই করতেন। ছোট বোনকে মাদ্রাসায় আনা নেওয়া করতেন। পরিবারের বিভিন্ন কাজ তিনি খুবই আন্তরিকতার সাথে করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের মধ্যমণি। শহীদের বড় ভাই সফটওয়্যার কোম্পানিতে এবং মেঝ ভাই একটি বেসরকারি মাদ্রাসায় চাকরি করেন। এছাড়া ছোট দুই বোন পড়াশোনা করেন। তার বড় দুটি ভাই পেশাজীবী হওয়ার কারণে তাকেই সময় দিতে হয়েছে পরিবারে। সেই ছেলেটিকে কেড়ে নিয়েছে খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী। পরিবার তার সন্তানের শহীদি মর্যাদা কামনা করেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ: শহীদ ইয়াসির সরকার দেশ প্রেমিক নাগরিক। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দেশকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছিলেন সর্বদা সোচ্চার। ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ে জুলাই ২৪ এর কোটা সংস্কার আন্দোলনে ১৬ তারিখে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। আহত হয় অসংখ্য নারী শিক্ষার্থীরাও। এরপরে আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রীদের নির্দেশে ছাত্র জনতার উপরে হত্যার মিশন চালানো হয়। আবু সাঈদ থেকে শুরু হয় পুলিশের সরাসরি গুলি করার অভিযান। সারা দেশে প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থীকে তারা গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবকে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন রূপ লাভ করে এক দফার। অর্থাৎ শেখ হাসিনার পতন। এই উপলক্ষে ৫ তারিখে মার্চ টু ঢাকা প্রোগ্রাম দেওয়া হয়। সারা দেশ থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা ঢাকায় আসে। ঢল নামে ঢাকার রাজপথে। লক্ষ কোটি ছাত্র জনতার আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীরা সেদিনও অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। ৩টা থেকে চলছিল বিজয় উল্লাস। অন্যদিকে চলছিল গুন্ডাবাহিনীর তাণ্ডব। হত্যা করছিল শতাধিক মানুষকে। বাদ যায়নি কৃষক শ্রমিক কেউই।

৫ আগস্টে শহীদ ইয়াসির সকাল দশটার সময় শনির আখড়ার বাসা থেকে বের হয়ে যান। তার মা তাকে আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করেন। তবুও কিছুটা বুঝিয়ে তিনি বেরিয়ে পরেন রাজপথে। তিনি শামিল হন মজলুম ছাত্র-জনতার কাতারে। সারাদিন আন্দোলন শেষে বেলা তিনটার দিকে গণভবনে যাওয়ার জন্য তিনি রওনা দেন। তখন হঠাৎই যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী এলাকায় ১০০ থেকে ১৫০ জন আওয়ামী লীগের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। আশেপাশে থাকা

অনেকেই গুলিতে আহত ও নিহত হন। সেখানে ইয়াসিরের বুকের দু পাশে দুইটা এবং পেটের নিচের অংশে একটি গুলি লাগে। এর মধ্যে বুকে দুটি গুলি পিছন দিক দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যায়।

সকালবেলা আন্দোলনে যাওয়ার সময় মায়ের কাছে বলে গিয়েছিল, মা আমি বাহিরে যাচ্ছি দুপুরে আসবো। দুপুরে তার বাবা বাসায় এসে ছেলেকে খোঁজ করলে তার মা জানান ইয়াসির এখনো বাসায় ফেরেনি। তিনটার দিকে সারা দেশে বিজয় উল্লাস ছড়িয়ে পড়লে তার পিতা ভাবেন যে ছেলে হয়তো গণভবনের দিকে গেছেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও ছেলে বাসায় ফেরেনি । খোঁজ না পেয়ে সবাই তাকে খুঁজতে বের হন।

তার বড় বোন হাফসা বুশরা (২০) ফেসবুকে সন্ধান চেয়ে ভাইয়ের ছবিসহ একটি স্ট্যাটাস দেন। কয়েকজন তার ফোনে কিছু ছবি পাঠান। রাত দশটার দিকে ঢাকা মেডিকেল থেকে একজন তার ইনবক্সে রক্তাক্ত একটি ছবি পাঠান এবং জানতে চান এটি তার ভাই কিনা? হাফসা ছবিটি দেখে কান্নায় ভেঙে পরে। সবাই কান্নার শব্দ শুনে জানতে চায় কি হয়ছে? তখন তিনি তার ভাইয়ের রক্তাক্ত ছবিটি দেখান। মুহূর্তে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরিবারের স্বজনদের অনুভূতি

শহীদের বাবা বলেন: আমি বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগি। সবসময় সে আমাকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতো। তিনি আরো বলেন, আমি কাপড় এবং টেইলার্সের ব্যবসা করি কিন্তু বর্তমানে ছেলের শোকের কারণে ব্যবসা করছি না। শহীদের বড় বোন বুশরা বলেন, ইয়াসির আন্দোলন থেকে এসে আমাদেরকে গল্প শোনাতো। আমি তাকে নিষেধ করলেও সে বলতো যে, সবাই যদি ভয় পেয়ে বাসায় বসে থাকে তাহলে কীভাবে হবে?

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা: শহীদ ইয়াসির এর বড় দুটি ভাই এর চাকরির টাকা দিয়ে ভালোভাবেই সংসার চলে। তারা দুজনে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা বেতন পান। তবে পিতা ক্যান্সার ও মা হাড় ক্ষয় রোগে ভুগছেন। উপার্জিত ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে শহীদ ইয়াসিরের পরিবার চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে পারছে না।

HATIL

Video
Mohiuddin
Follow
UP NEXT: Md Yeasin Hossain Riyad · 0:10
আলহামদুলিল্লাহ এই হাসি কখনো ফুরাবে না ইনশাআ...

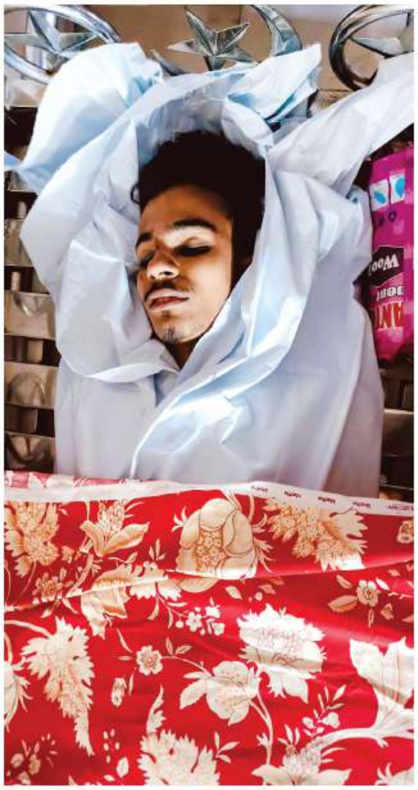

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: শহীদ মো: ইয়াসির সরকার
জন্মতারিখ	: ২০/১১/২০০৬
পিতার নাম, বয়স, পেশা	: মো: ইউসুফ সরকার, ৬০ বছর, কাপড়ের ব্যাবসা
মায়ের নাম, বয়স, পেশা	: বিলকিছ আক্তার, ৪৫, গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৬ জন
পরিবারের মাসিক আয়	: ৩৫ হাজার টাকা
ভাই বোন সংখ্যা	: তিন ভাই, দুই বোন ১. বড় ভাই: মোহাম্মদ ইয়াকুব সরকার, সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকুরি করেন ২. মেঝ ভাই: মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সরকার, বয়স :২৬, পেশা: শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান: মাদ্রাসা ৩. বড় বোন: হাফসা বুশরা, বয়স: ২০, পেশা: শিক্ষার্থী ৪. শহীদ মো: ইয়াসির সরকার ৫. ছোট বোন: নুসাইবা, বয়স: ৬, পেশা: মাদ্রাসার ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: শনির আখড়া, ইউনিয়ন: দনিয়া, থানা: কদমতলী, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: শনির আখড়া, ইউনিয়ন: দনিয়া, থানা: কদমতলী, জেলা: ঢাকা
আঘাতকারী	: পুলিশ ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময় কাল	: বিকাল ৩.০০টা, যাত্রাবাড়ি
নিহত হওয়ার সময়কাল ও স্থান	: ৩.৪০টা, যাত্রাবাড়ী কুতুবখালী
শহীদের কবরের অবস্থান	: জনতাবাগ, পুলিশ ফাঁড়ি কবরস্থান

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর মৃধা

ক্রমিক : ০৭৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০৭৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর মৃধা ১৯৮০ সালের পহেলা এপ্রিল পটুয়াখালি জেলার দ্বিপসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় একজন ভ্যান চালক ছিলেন। তাঁর ঘেরে দুই সন্তান। শহীদ মো: জাহাঙ্গীর মৃধার পিতার নাম জনাব নয়ন উদ্দিন এবং মাতার নাম মোসা: লালমোন বিবি। পিতা-মাতার ৬ সন্তানের মধ্যে তিনিই বড়। পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি ঢাকার কদমতলীতে বসবাস করতেন। তার বড়ো ছেলে আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে পড়াশোনা বাদ দিয়ে গ্লাস মিস্ত্রির কাজ নেন। আর ছোট ছেলে মো: শান্তর বয়স মাত্র ৩ বছর। তার স্ত্রী লাইজু বেগম দীর্ঘদীন ধরে অসুস্থতায় ভুগছেন। তাঁর ডান চোখে ও নেত্রনালীতে সমস্যা। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।

১৯ জুলাই ২০২৪ শহীদ মোঃ জাহাঙ্গীর মৃধা স্বৈরাচার সরকারের ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারায়। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে এক দুঃসহ পরিস্থিতি নেমে আসে। জীবন যাত্রা অচল হয়ে যায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন শহীদ জাহাঙ্গীরের স্ত্রী লাইজু বেগম। উপায়ন্তর না দেখে নিজেই কাজে নেমে পড়েন। অসুস্থতা সত্বেও তিনি একটি অফিসে রান্নার কাজ নেন। সামান্য বেতনে কোনমতে দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। অপরদিকে তিনি কাজে চলে গেলে ছোট ছেলে শান্তকে একা একা থাকতে হয় বাড়িতে। তাকে দেখার কেউ থাকে না। অর্থের অভাবে তিনি চিকিৎসা করাতে পারছেন না। আবার সন্তানদের মুখে একটু ভালো-মন্দ খাবার তুলে দিবেন তারও সুযোগ হচ্ছে না। ছোট ছেলে যখন বাবা বাবা করে কান্না করে তখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননা লাইজু বেগম।

শাহাদাতের নির্মম ঘটনা

অবৈধ সরকার শেখ হাসিনা নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। জনগণের ভোটাধিকার হরনের মাধ্যমে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করে। গুম-খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অন্যায়, জুলুম, অবিচার, অত্যাচার, চাদাবাজি, সন্ত্রাসী, অর্থ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। তাদের অন্যায় অত্যাচারের মাত্রা পূর্বাপর সকল স্বৈরশাসককে ছাড়িয়ে যায়। দীর্ঘদীনের ক্ষোভ জনগনের মনে দানা বেঁধে উঠে। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ আন্দোলনে রুপ লাভ করে। দলীয় পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে জনগনের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পুলিশের পৈশাচিকতা ৭১'র পাক হানাদার বাহিনীকেও ছাপিয়ে যায়। ছাত্র-জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলন রুপ নেয় স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে সরকার মারমুখি নীতি অবলম্বন করে।

১৫ জুলাই রাতে স্বৈরশাষক খুনি হাসিনা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-জনতাকে রাজাকার বলে গালি দেয়। মুহুর্তেই ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলো থেকে ভেসে আসে, "তুমি কে আমি কে?-রাজাকার, রাজাকার।" মুহুর্তেই ৭১'র ঘৃণিত শব্দ ২৪ এ এসে মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের মেয়েরা মধ্য রাতে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকা সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ক্রমেই ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে। ছাত্রদের দমন করতে সরকার তার দলীয় পোষা গুণ্ডা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। ১৬ জুলাই ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের নির্দেশে ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লোহার রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, রামদা, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্রলীগের পোষা গুণ্ডা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া করে আনা টোকাইদের নিয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার হাত থেকে নিরস্ত্র বোনদেরও রক্ষা মিলেনা। রাস্তায় আটকিয়ে বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে নির্বিচারে পিটাতে থাকে।

আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ আন্দোলনের শক্তি আরও বৃদ্ধি করে। অনেকটা আগুনে ঘি ঢালার মত। এরপর থেকে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯ জুলাই বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন দমনে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঘাতক পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা, ফাঁকা গুলি, গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সেদিন রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ সাজোয়া যান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। শুধু তাই নয় স্বৈরাচারের হেলিকপ্টার ও উচু ভবনের উপর থেকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনার সংবাদ যেন বহির্বিশ্বে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য সরকার ১৯ জুলাই রাত ১০ টায় সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। দলীয় কর্মীদের দ্বারা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা ভাংচুর করে আন্দোলকারীদের উপর দায় চাপানোর নোংরা রাজনীতি শুরু করে।

১৯ জুলাই সকাল ১০ টার দিকে শহীদ মোঃ জাহাঙ্গীর মৃধা ফার্মেসীতে যান তার স্ত্রীর জন্য ঔষধ কিনতে। ঔষধ কিনে বাড়ি ফেরার পথে স্বৈরাচারের ঘাতকদের থাবার মুখে পড়েন। একটি গুলি এসে তার পিঠ বরাবর ঢুকে সামনে দিয়ে বেড়িয়ে যায়। মুহুর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর চারপাশ রক্তে ভেসে যায়। উপস্থিত ছাত্ররা তাকে নিয়ে একটি ফার্মেসীতে নিয়ে যায়। চতুর্দিকে পুলিশের বেরিকেড থাকায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফার্মেসীতে থাকা অবস্থাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর স্ত্রী কান্নায় ফেটে পড়ে। শহীদ জাহাঙ্গীরের ৩ বছরের সন্তান শিশু শান্তর কান্না দেখে আশেপাশের মানুষজন আর কান্না ধরে রাখতে পারে না। পিতার এমন আকস্মিক মৃত্যুতে বড় ছেলে স্বজনও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ জাহাঙ্গীরের পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ। সামান্য ভ্যান গাড়ী চালিয়ে সংসার চালাত। যাত্রাবাড়িতে একটি ভাড়া বাসায় স্ত্রী সন্তান নিয়ে বসবাস করত। তার দুই ছেলে। বড় ছেলের বয়স ২৪ বছর। দরিদ্রতার কারণে ছেলেকে পড়াশোনা করাতে পারেনি। বড় ছেলে স্বজন সামান্য বেতনে গ্লাস মিস্ত্রির কাজ করে। আর ছোট ছেলে শান্তর বয়স ৩ বছর। স্ত্রী অসুস্থ। চোখে কম দেখে। নেত্রনালীতে সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে। স্বামীর মৃত্যুর পর একটি অফিসে রান্নার কাজ নিয়েছেন।

AZTA

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Madanpura
Bauphal, Patuakhali
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 27/08/2024
Death Registration Number 19807813877100501
Date of Issuance 27/08/2024

Date of Birth : 01/04/1980 Sex : Male
Date of Death : 19/07/2024
In Word : Nineteenth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ জাহাঙ্গীর	Name	: Md
মাতা	: মৃত: লালমোন বিবি	Mother	: Let
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মৃত: ময়ন উদ্দিন	Father	: Let
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

27.08.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
GAZI AMINUL ISLAM
Secretary
8 No Madanpura Union Parishad
Bauphal, Patuakhali

Seal & Signature
Registrar
MD. GOLAM MOSTOFA
Chairman
8 No Madanpura Union Parishad
Bauphal, Patuakhali

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ জাহাঙ্গীর মৃধা
Name: MD. JAHANGIR MIRDHA
পিতা: ময়ন উদ্দিন মৃধা
মাতা: লালমোন বিবি
Date of Birth: 01 Apr 1980
ID NO: 8257852437

ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মোঃ জাহাঙ্গীর মৃধা, পেশাঃ ভ্যান চালক
জন্ম তারিখ	: ০১/০৪/১৯৮০
জন্ম স্থান	: পটুয়াখালি
পিতা	: জনাব মোঃ ময়ন উদ্দিন (মৃত)
মাতা	: মোসাঃ লালমোন বিবি (মৃত)
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক সকাল ১০ টার দিকে
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সকাল ১১ টার দিকে, যাত্রাবাড়ী
দাফন	: তার পরিবার হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে এসে জানাজা সম্পন্ন করে তাকে গ্রামের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।
স্থায়ী ঠিকানা	: পটুয়াখালী, বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: রায়েরবাগ, কদমতলী, ঢাকা

শহীদ মো: হাবিব

ক্রমিক : ০৭৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০৭৯

শহীদ পরিচিতি

মো: হাবিব পেশায় ছিলেন একজন প্রাইভেটকার চালক। তিনি ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ধলিগর নগর ইউনিয়নের চর মোল্লাজির (চতল বাজার) গ্রামের মো: শফিউল্যাহর ছেলে। এলাকাতে জায়গা জমি না থাকাতে ছয় সদস্যের বড় পরিবার নিয়ে ঢাকাতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। থাকতেন ঢাকার কদমতলী থানার পাটেরবাগ পানির পাম্প এলাকায় ভাড়া বাসাতে। তিনি অনেক ধরনের গাড়ি চালাতে পারতেন। নিজের ব্যক্তিগত কোন গাড়ি না থাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মালিকের কখনো সিএনজি, কখনো প্রাইভেটকার আবার কখনো ট্রাক চালাতেন এবং অন্যান্য কাজ যখন যে কাজ সামনে আসতো সেটা করেই নিজের সংসার সামলে নিচ্ছিলেন।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

শহীদের বড় মেয়ে ফাতেমা আক্তারের জবানি থেকে জানতে পারা যায়, জুলাই ২০২৪ এর মাঝ থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল তখন থেকে তাঁর বাবা প্রতিনিয়ত ছাত্রদের যৌক্তিক দাবির স্বপক্ষে নিজেকে শামিল করেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর পরিবারকে বিভিন্ন রকম কথা বলে বিষয়টি আড়াল করতেন। তিনি বাসার সবাইকে বলতেন যে, তিনি যাত্রাবাড়ী অঞ্চলে আছেন। সরাসরি নিজেই যে আন্দোলনে আছেন সে কথা পরিবারকে জানাতেন না। ফাতেমা আক্তার বলেন, তাঁর বাবা শারীরিক ও মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী একজন মানুষ ছিলেন। ঘটনার দিন ২০ জুলাই তাঁর বাবা এবং তাঁর বাবার আরো কয়েকজন বন্ধু মিলে যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া অঞ্চলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দুর্দশার চিত্র অবলোকন করে তাদের মুখে সামান্য কিছু খাবার উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর সেই থেকে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা ও আশপাশের কিছু মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা উঠিয়ে ঐদিন খিচুড়ি রান্না করিতেছিলেন। খিচুড়ি রান্নার এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলতে থাকে।

পুলিশ যখন ধাওয়া দিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের তাঁদের রান্না করার স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে তখন তাঁর বাবা এবং তাঁর বন্ধুরা নিরাপদ স্থানে সরে যান। কিছুক্ষণ পর তাঁরা ভেবেছিলেন পুলিশ

ওখান থেকে চলে গেছে। এই ভেবে তাঁরা আবারো রান্নাস্থলের দিকে আসে কিন্তু তখনো পুলিশ সেই স্থানথেকে যায়নি এটা তাঁর বাবা বুঝতে পারেননি। এরপর পুলিশ তাঁর বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তখন সময় আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিট। পুলিশের ছোড়া গুলির একটি তাঁর বাবার পেটের ডানপাশে বুকের নিচ ভেদ করে বাহির হয়ে যায়। তাঁর বাবা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে একা পড়ে থাকেন কারণ সেখানে তখনো পুলিশ অবস্থান করছিল। পরবর্তীতে যখন পুলিশ চলে যায় তখন আশপাশের লোকজন তাঁর বাবার কাছে যান।

এ সময় তাঁর বাবা বারবার উদ্ধারকারী ব্যক্তিদের বলছিলেন আমাকে দয়া করে বাচাঁন আমার বাড়িতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। আমাকে দয়া করে বাঁচান। তখন আশপাশের কয়েকজন মিলে তাঁর বাবাকে প্রথমে দেশ বাংলা হাসপাতালে নিয়ে যায় কিন্তু দেশ বাংলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এরকম সিরিয়াস রোগীকে চিকিৎসা না করানোর কথা জানায়। কারণ এরকম আহত রোগীকে চিকিৎসা করালে ক্ষমতাসীনদের রোশনালে পড়ার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তীতে তাঁরা হাবিবকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে যায়। তখনো হাবিব জীবিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আনুমানিক ৩:৩০ মিনিটের দিকে তিনি ঢাকা মেডিকেলের ইমারজেন্সি তিন (৩) নং ইউনিটে মৃত্যু বরন করেন। আর সে সময়ই ফাতেমা আক্তার, তাঁর ভাই এবং তাঁর মা ঢাকা মেডিকেলে পৌঁছান এবং তাঁর বাবাকে ইমারজেন্সিতে মৃত অবস্থায় পান।

ফাতেমা আক্তারের ভাষ্য মতে সে দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। ঢাকা মেডিকেলের জরুরী বিভাগের বাইরে তখন অনেক পুলিশ ও আর্মি দাড়িয়ে ছিল। তাঁদেরকে সকলে নানারূপ ভয়-ভীতি এবং হুমকি ধমকি দিচ্ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লাশ হস্তান্তরের কথা বললে তাঁরা তাঁদেরকে স্থানীয় (ঘটনার স্থান) থানার ওসির লিখিত আবেদন আনতে বলে এবং উক্ত লিখিত আবেদন ছাড়া তাঁরা লাশ হস্তান্তর করবে না এই মর্মে জানায়। এরপর বাধ্য হয়ে তাঁর মা এবং তাঁর ভাই যাত্রাবাড়ী থানাতে যায় কিন্তু ঐ সময় থানার আশপাশে অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা ছিল। ছাত্রদের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ চলছিল তাঁরা কোনভাবে জান বাঁচিয়ে থানার ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু থানার ভিতরের পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁদের নানা রকম কথাবার্তা বলতে থাকে এবং বিভিন্ন রকম হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। তাঁরা তাঁদেরকে নানাজনের কাছে পাঠাতে থাকে এবং কোনভাবেই ওসি লিখিত দিবে না বলে জানায়। এমনকি তাঁরা তাঁর ভাইয়ের ঠিক বুকের মাঝ বরাবর বন্দুকের নল ধরে তাঁকে থানার ভিতরে গুলি করবে বলে শাসিয়ে চলে যেতে বলে। এ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা আবারও ঢাকা মেডিকেলে ফিরে যায় এবং ঐ সকল ঘটনার বর্ণনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানায়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই লিখিত ছাড়া লাশ হস্তান্তর করতে পারবে না মর্মে জানায় এবং তাঁদের বলে তাঁরা যেন আবার থানায় ফিরে গিয়ে কোনমতে থানার ওসির হাত-পা ধরে হলেও লিখিত

নিয়ে আসে। তাঁরা মা-ছেলে আবারো থানাতে ফিরে গিয়ে থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে লিখিত দেয়ার জন্য বলে। সর্বশেষ তাঁরা থানা থেকে ওসির লিখিত পায় এবং তা নিয়ে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে যায়। এরপর ঢাকা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ তাদের লাশ হস্তান্তর করে। ইতোমধ্যে ২০ তারিখ পেরিয়ে ২১ তারিখ সন্ধ্যা হয়ে যায়। এদিকে লাশের অবস্থাও অনেক খারাপ হয়ে যায়। এমনকি ফাতেমা আক্তারের ভাষ্যমতে লাশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। এমতাঅবস্থায় তাঁরা তাঁর বাবার লাশ নিজেদের গ্রামের বাড়ি ভোলাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তড়িঘড়ি করে লাশের গোসল, কাফন ও জানাযা শেষে জুরাইন কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের মন্তব্য

হাবিবের এক চাচা জানান, "হাবিবের বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। এলাকায় তাঁর কোনো জমি বা বাড়িঘরও নেই। পরিবার নিয়ে সে ঢাকায় থাকত।"

হাবিবের বড় মেয়ে কলেজছাত্রী ফাতেমা আক্তার বলেন, "ওরা আমাদেরকে এতিম করে কেন আমার অসহায় বাবাকে গুলি করে মেরে ফেললো? আমাদের এখন কী উপায় হবে?" তিনি আরো বলেন, "তাঁর বাবা গরিব ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁদের কখনো সেটি বুঝতে দেননি। তিনি অনেক বেশি পরিশ্রম করতেন কিন্তু আমাদেরকে তাঁর পরিশ্রম বুঝতে দিতেন না। তিনি তাঁর মেয়েদেরকে রানীর মত করে রেখেছিলেন। যত কিছু হোক না কেন তিনি বাড়িতে ফেরার পথে তাদের জন্য কিছু না কিছু খাবার নিয়ে বাড়িতে ফিরতেন। তাঁর বাবা তাঁদেরকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের পরিবারই যেন ছিল তাঁর বাবার সমস্ত পৃথিবী। আর তাঁরা সেই বাবাকে হারিয়ে ফেলল, যে আর কখনো তাঁদের জন্য আর খাবার নিয়ে ঘরে ফিরবে না। তিনি আরো বলেন, তাঁর মা এখন তাঁদের পরিবারের এবং ছোট ভাইবোনদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এত পেরেশান থাকেন যে রাতে ঘুমুতে পারেন না। আর তাঁর ছোট বোনটি এখনো ঘরের প্রধান দরজার কাঠামোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন কখন বাবা আসবে সেই অপেক্ষায়। কিন্তু ওর অবুঝ মন জানে না তাঁর অপেক্ষার আর কখনো শেষ হবে না! এই পথে বাবা আর কখনো ঘরে ফিরবে না।"

হাবিবের একমাত্র ছেলে হাফেজ মো: জিহাদ (১৭) ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'আমার বাবারতো কোনো দোষ নেই, তিনি কোনো রাজনীতির সাথেও কখনো জড়িত ছিলেন না। বিভিন্ন গাড়ি চালিয়ে আমাদের সংসার চালাতেন। আমার বাবার ধ্যান-জ্ঞান সবই ছিল আমাদের মা, তিন বোন ও এক ভাইকে ঘিরে। কিন্তু খেটে খাওয়া আমার এই বাবাটাকেই কেন গুলিতে নিহত হতে হলো?' জিহাদ আরো জানায়, 'বাবাকে হারিয়ে আমরা এখন চোখে অন্ধকার দেখছি। আমার বড় বোনটি আইএ পরীক্ষা দিতেছে। পাঁচ বিষয় পরীক্ষা শেষও হয়েছে। বাবা তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। আমার আরো ছোট দুই বোন রয়েছে। আমি সামান্য যা আয় করি তা দিয়ে আমার পড়ালেখার খরচই মেটানো যায় না। আমাদের কথা চিন্তা করে আমার মায়ের এখন রাতে ঘুম হয় না।'

শহীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

হাবিবের বড় মেয়ে ফাতেমা আক্তারের ভাষ্যানুযায়ী তাদের গ্রামের বাড়িতে বেশ কিছু জমি আছে কিন্তু সেগুলো অন্যরা জবরদখল করে খাচ্ছে। এখন তাদের নিজেদের দখলে কোন সম্পত্তি নেই। এগুলো এখন আর উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর ঢাকাতে তাঁর বাবা ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতেন। নিজের মালিকানায় গাড়ি না থাকায় ভাড়ায় বিভিন্ন মালিকের গাড়ি চালাতেন। মাঝে তাঁর মালিক গাড়ি বিক্রি করে দিলে তিনি বেকার হয়ে পড়েন এবং চাকরি চলে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন তিনি কাজ ছাড়াও ছিলেন।। তাঁর বাবা তাঁর (ফাতেমা আক্তারের) এইচএসসি পরীক্ষার সময় পরিবারের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন এজন্য তাঁর ভাই হাফেজ রিহাতকে কারখানার কাজে লাগিয়ে দেন, যাতে সে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। আর সে নিজেও দুইটি টিউশনি করিয়ে দুই ভাই-বোন মিলে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করছিলেন। আর তার মাঝে ঘটে গেছে এই দুঃসহ ঘটনা।

শহীদের পরিবারের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। শহীদের পরিবারের সহযোগিতা সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলে

১. জরুরী ভিত্তিতে শহীদের পরিবারের থাকার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন সুতরাং তাঁদের থাকার জন্য স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া কাম্য।

২. শহীদের পরিবারের জন্য এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে যাতে পরিবারটি বর্তমানে নিজেদের চালিয়ে নিতে পারে।

৩. শহীদের বড় মেয়ে ফাতেমা আক্তারের জন্য স্থায়ীভাবে কোন চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সে তাঁর পরিবারের হাল ধরতে পারে এবং তাঁর মা ও ছোট ভাইবোনদের সুন্দর মত দেখাশোনা করতে পারে। বাবার রেখে যাওয়া স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করাতে পারে।

৪. যেহেতু শহীদের ছেলে পবিত্র কোরআনের হাফেজ সেহেতু হাফেজ ছেলের জন্য তাঁর উপযোগী কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কোনো চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং তাঁর ছোট বোনদের সম্পূর্ণ সরকারি খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. যেহেতু শহীদের মেজো মেয়ে কিছুটা হলেও শারীরিকভাবে অপ্রকৃতস্থ সুতরাং তাঁকে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: হাবিব
পিতা	: মৃত মো: শফিউল্যাহ
মাতা	: মৃত আছিয়া খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চর মোল্লাজি(চতল বাজার), ইউনিয়ন: ধোলিগর নগর, থানা: লালমোহন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: দক্ষিণ দনিয়া, পাটের বাগ, এলাকা: পাটের বাগ, পানির পাম্প, থানা: কদমতলী, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ি শনির আখড়া
আক্রমণকারী/ঘাতক	: স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ ও ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪, ২:৩০ ঘটিকায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪, ৩.৩০ ঘটিকায়
শহীদের কবরের অবস্থান	: জুরাইন কবরস্থান, ঢাকা
পরিবারের মোট সদস্য	: ৬ জন

১। স্ত্রী: নাম: আয়েশা বেগম, পেশা: গৃহিনী
২। বড় মেয়ে: নাম: ফাতেমা আক্তার, বয়স: ২০, লেখাপড়া: এইচএসসি, কমলাপুর শেরে বাংলা কলেজ
৩। ছেলে: নাম: হাফেজ মো: রিহাদ হোসেন, বয়স: ১৭
৪। মেজো মেয়ে: নাম: হাবিবা ইসলাম কুলসুম, বয়স: ৭, লেখাপড়া: প্লে
৫। ছোট মেয়ে: নাম: হুমায়রা ইসলাম আয়াত, বয়স: দেড় বছর

শহীদ আবু ইসাহাক

ক্রমিক : ০৮০

আইডি: ঢাকা সিটি ০৮০

সৌদি আরবে আর ফেরা হলো না শহীদ আবু ইসাহাকের

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আবু ইসাহাক ছিলেন সৌদি প্রবাসী। একজন গর্বিত রেমিট্যান্স যোদ্ধা। তিনি খোদা ভীরু, সৎ, পরোপকারী মানুষ ছিলেন সাদা মনের সহজ সরল।

তিনি কোম্পানি থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে। আগস্ট মাসের ২৪ তারিখেই ছিল তার ফিরতি ফ্লাইট। সৌদি আরবে গিয়ে আবার কাজে যোগ দিবেন এমনটাই পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু এক ছেলে এক মেয়ে আর প্রিয়তমা স্ত্রীকে ছেড়ে খোদার অমোঘ ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের নাজরানা পেশ করেন শহীদ আবু ইসাহাক। ফুটফুটে ছেলে মেয়ে দুটি চিরদিনের জন্য এতিম হয়ে যায়। এই এতিম শিশুদের কষ্টের কথা আর বিধবা স্ত্রীর করুণ আহাজারি কী জালেম শাসক শেখা হাসিনার সভাসদদের কানে পৌঁছাতে পেরেছিল? নাকি আল্লাহ তাদের কানে মোহর মেরে দিয়েছিল? তার ৯০ বছরের বয়োঃবৃদ্ধ পিতার নির্বাক করুণ মুখটি যেন শুধু অভিশাপই দিচ্ছে খুনিদের। বাবা বলে মেয়েটি আর কোনদিন ঝাপিয়ে পড়বে না আবু ইসাহাকের বুকে!

শহীদ আবু ইসাহাক ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। আই. কে. কে. গ্রুপ অব কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। কদমতলীর নুরপুর মসজিদ রোডের ৪২৫ নম্বর বাসার ৩য় তলায় সপরিবারে বসবাস করতেন শহীদ আবু ইসাহাক।

যেভাবে শহীদ হয় :

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে প্রথম থেকেই তিনি পানি, খাবার দিয়ে সহযোগিতা করে আসছিলেন। নিজেও স্লোগান তুলেছেন ছাত্রদের সাথে। পঞ্চাশোর্ধ বয়স হলেও মনের দিক থেকে ছিলেন ছাত্রদের মতই তারুণ্যদীপ্ত। আন্দোলনে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ক্যাডারদের আক্রমণে আহত ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা প্রদানে অব্যাহত সহযোগিতা করতে থাকেন আবু ইসাহাক। আগস্টের ৫ তারিখ ঘৃণিত পতিত শাসক শেখ হাসিনা জনরোষে পালিয়ে গেলে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে।

কিন্তু ৫ তারিখ সকালেও আন্দোলনকারীদের দমন করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে থাকে পুলিশ, র‍্যাব, এসবি ও আনসার সদস্যরা। ৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৪৫ মিনিটে বাসা থেকে বের হন তিনি। শনির আখড়ায় আন্দোলনকারীদের সাথে যোগ দেন। পরবর্তীতে তার স্ত্রী বেলা ১.৩৫ এ ফোন দিলে আন্দোলনকারী একজন রিসিভ করে। অপরপ্রান্ত থেকে জানানো হয় আবু ইসাহাক গুলিবিদ্ধ হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন। তিনি গুলিবিদ্ধ হন আনুমানিক ১.২০ টায়। তার স্ত্রী ও ছেলে শনির আখড়ার ঘটনাস্থল থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ১. ৩৫ এর দিকে দায়িত্বরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। তাকে সমাহিত করা হয় গৌরিপুর, কুমিল্লা (নানা বাড়ির পারবিারিক কবরস্থানে)

শহীদের আপনজনদের কথা

মেয়েঃ আমার আব্বু এখন আর দুনিয়াতে নেই। আমি এখন বুঝতে পারছি যে আমার আব্বু আমাকে খুবই ভালোবাসত।

শ্যালক : তিনি অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি একাধিকবার হজ্জ করেছেন। অত্যন্ত সাদাসিধা ও ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তার প্রতি আমাদের পরিবারের কোন সদস্যের কোন ধরনের অভিযোগ ছিল না। তিনি সব সময় মানুষকে সহযোগিতা করতে চাইতেন। জুলাই আগস্টে চলমান আন্দোলনেও তিনি ছাত্রছাত্রী ও আন্দোলনকারী জনতাকে পানি ও খাবার সরবরাহ করেছিলেন।

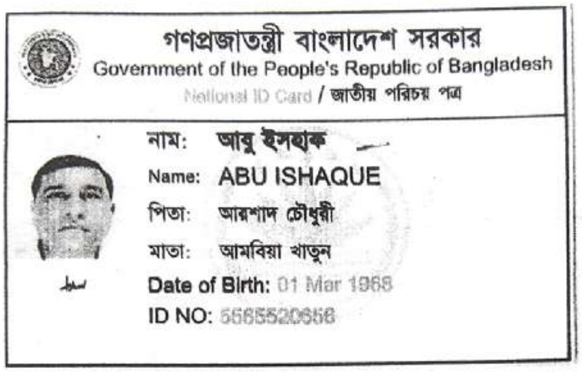

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: আবু ইসহাক
Name: ABU ISHAQUE
পিতা: আরশাদ চৌধুরী
মাতা: আমবিয়া খাতুন
Date of Birth: 01 Mar 1968
ID NO: 5665520656

ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: আবু ইসাহাক
পিতা	: আরশাদ চৌধুরী (৯০)
মাতা	: মৃত আমবিয়া খাতুন
জন্ম	: ০১/০৩/১৯৬৮
পেশা	: প্রবাসী (সৌদি আরব)
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: আই. কে. কে গ্রুপ অব কোম্পানি
ছেলে	: ইশতিয়াক চৌধুরী আদিপ, ২২ বছর, ১ম বর্ষ, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
মেয়ে	: সারা চৌধুরী (১৪), ৮ম শ্রেণি, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা	: ৮২৮ নুরপুর, ৬০ নং ওয়ার্ড, থানা: কদমতলী, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: ৪২৫, ৩য় তলা, এ-ইউনিট, নুরপুর মসজিদ রোডে, কদমতলী ঢাকা

"একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তির বুক ঝাঁঝরা করে দিল পুলিশ"

শহীদ মোঃ রিয়াজ

ক্রমিক : ০৮১

আইডি : ঢাকা সিটি ০৮১

শহীদ পরিচিতি

অতি দরিদ্র পরিবারের সংগ্রামী এক যুবক মোঃ রিয়াজ। তিনি ১৯৯৮ সালের ০১ জানুয়ারি ভোলা জেলার অন্তর্গত দৌলতখান থানার চর খলিফা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ রিয়াজ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি পেটের দায়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন। তবে তিনি অধিকাংশ সময়ই রড মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। শহীদের পিতার নাম আব্দুল রহমান। তার মায়ের নাম মনি বেগম। বাবা প্রতিবন্ধী হওয়ায় জীবিকার তাগিতে অল্প বয়সেই তাকে ঢাকায় আসতে হয়। তিনি ঢাকা মাতুয়াইলের মদিনার চত্বর এলাকায় বসবাস করতেন মাতুয়াইল জিরো পয়েন্টে মাত্র একটি রুম ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন। শহীদ রিয়াজ ২০১৫ সালে ফারজানা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দুই সন্তানের জনক। শহীদ মোহাম্মদ রিয়াজ ছিলেন হাসিখুশি স্বভাবের প্রিয় মানুষ। তিনি সবার সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক করতেন। কারো সাথে তার বৈরী সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলেও তিনি ছিলেন মানবিক এবং ন্যায়বান। অন্যের দুঃখে তিনি সর্বদা এগিয়ে যেতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন রিয়াজ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি পালন করেন ১৫ তারিখ পর্যন্ত। অবৈধ হাসিনা সরকার সাধারণ ছাত্র জনতাকে রাজাকার বলে অপবাদ দেয়। যার প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই মাসের ১৬ তারিখে আন্দোলনের ব্যাপকতা লাভ করে। সেখানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী জঙ্গি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপরে হামলা করে। অনেক নারী শিক্ষার্থীকেও নির্মমভাবে আঘাত করা হয়। এরপরে পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক আওয়ামী সরকার সারাদেশে ক্র্যাকডাউন চালায়। শিক্ষার্থীদেরকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে মিথ্যা মামলা দেন। এরপরেও ১৮ তারিখ থেকে আওয়ামী দালাল প্রশাসন বাহিনী ছাত্র জনতার ওপরে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। এরপর আন্দোলন ক্রমান্বয়েই ছড়িয়ে যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। অসংখ্য ছাত্রকে ইতোমধ্যেই হত্যা করা হয়। চার তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব সমন্বয়করা মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন শহীদ রিয়াজ।

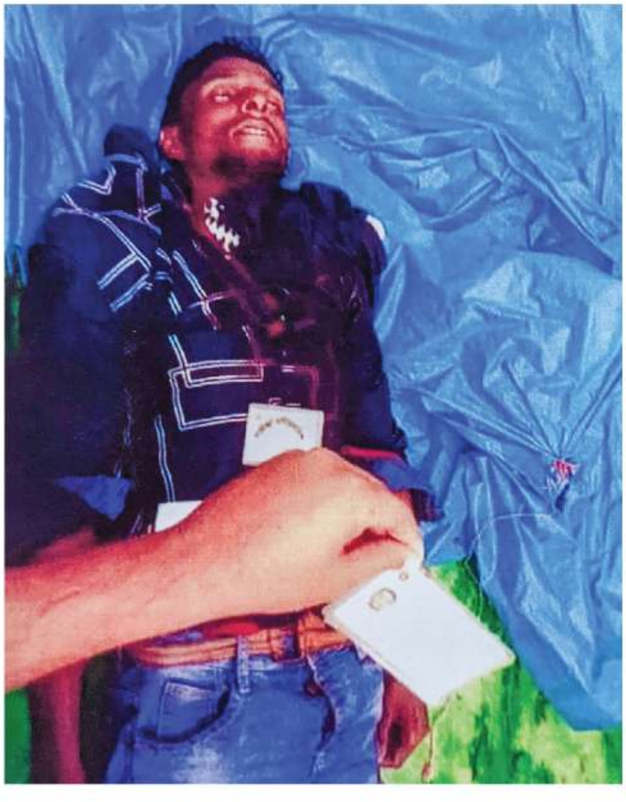

তিনি দুপুর একটার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে পরেন। তার সাথে ছিল তার চাচাতো ভাই। যাত্রাবাড়ীতে পৌঁছালে সেখানে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী লংমার্চ ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি ছুটতে থাকে। সবার সাথে শহীদ রিয়াজ ও প্রতিরোধ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যান। পুলিশ তার দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলিটি সরাসরি তার মাথায় বিদ্ধ হয়। পুলিশ সেখানে সুবিধা জনক স্থান থেকে থেমে থেমে গুলি চালান। এজন্য তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এরপর বৃষ্টি শুরু হলে পুলিশ সেখান থেকে সরে যান। শহীদ রিয়াজের চাচাতো ভাইয়েরা তাকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তারা যাত্রাবাড়ী থানার ৩ নং গেটের সামনে শহীদ রিয়াজের নিথর দেহ খুঁজে পান। অতঃপর তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তার জানান তিনি অনেক আগেই মারা গিয়েছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়দের বক্তব্য

ব্যক্তি হিসেবে রিয়াজ খুবই সহজ সরল ছিল। খারাপ কোন অভ্যাস ছিল না। আমার মায়ের সাথে কখনো দুর্ব্যবহার করেনি। নিজের ছেলের মত জানতাম। সুন্দরভাবে আমার মেয়ের সংসার চলছিল। যেকোন প্রয়োজনে রিয়াজকে যখনই ডাকতাম তখন আমার বাসায় চলে আসতো। আমি আমার একটা ছেলেকে হারিয়েছি। (শহীদের শশুর)

শহীদ পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শহীদ মোহাম্মদ রিয়াজ ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। শহীদ মোহাম্মদ রিয়াজের বাবা, মা, স্ত্রী এবং দুটি সন্তান রয়েছে। শহীদ রিয়াজের পারিবারিক অবস্থা ভালো না হওয়ার কারণে বর্তমানে তার স্ত্রী (২৬) ফারজানা দুটি সন্তান নিয়ে বাবার বাসায় বসবাস করছে। স্ত্রীর উপার্জনের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। ছেলে সন্তানদের নিয়ে বর্তমানে দুশ্চিন্তায় দিন পার করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ রিয়াজ
Name: MD. RIAZ
Date of Birth: 01 Jan 1998
ID NO: 3752240238

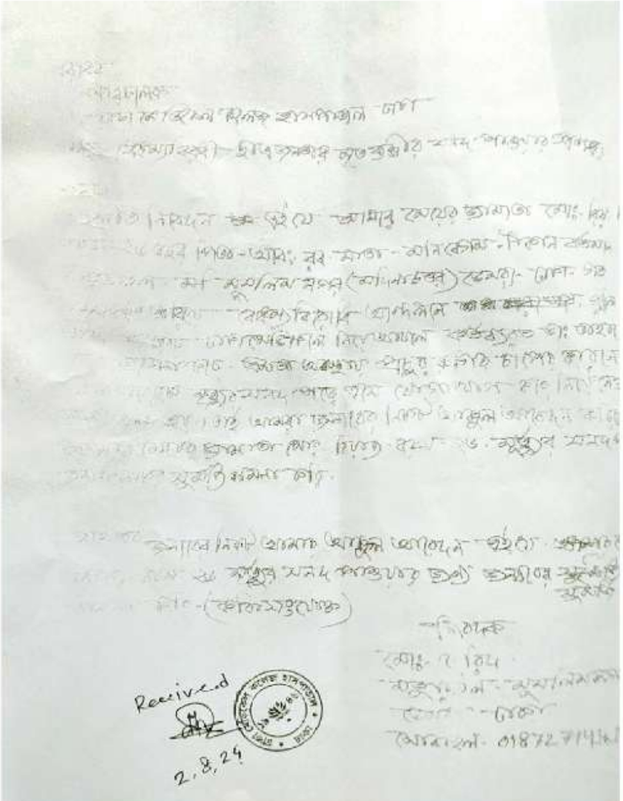

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Char Pata Union Parishad
Daulat Khan, Bhola

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 10/06/2005	Birth Registration Number 19990912928000635	Date of Issuance 15/06/2005

Date of Birth : 02/08/1999
In Word : Second of August Nineteen Ninety Nine
Sex : Female

নাম	: ফারজানা বেগম	Name	: Farjana Begum
মাতা	: জাহানারা বেগম	Mother	: Zahanara Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ ফরিদ	Father	: Md Farid
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: ভোলা, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Bhola, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা		Permanent Address	: Charpata Vill Boro Charlamchipata, Ward No: 06 Post: Kazirhat-8300, Char Pata, Daulat Khan, Bhola

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Bibi Saera Poly

Seal & Signature

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রিয়াজ
জন্ম	: ০১ জানুয়ারি, ১৯৯৮
পিতার নাম, বয়স	: জনাব আব্দুর রব, ৪৫ বছর
মায়ের নাম, পেশা	: মনি বেগম, গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৫ জন
ছেলে মেয়ে	: ২ জন
	: ১.বড় মেয়ে: বিবি ফাতেমা, বয়স: ৭
	: ২. ছোট মেয়ে: বিবি ফারিয়া, বয়স: ৫
ভাই-বোন	: তিন ভাই
	: ১. বড় ভাই: শহীদ মো: রিয়াজ
	: ২. মেঝ ভাই: মো: আরিফ, বয়স: ১৬, পেশা: কর্মচারী, প্রতিষ্ঠান: বেকারী
	: ৩. ছোট ভাই: মো: সজিব, বয়স: ১২
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মিঠু হাং বাড়ি, ইউনিয়ন: চর খলিফা, থানা: দৌলতখান, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: ৮৭/ ৩৭, এলাকা: মদিনা চত্বর মাতুয়াইল, থানা: ডেমরা, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী
আঘাতকারী	: স্বৈরাচারের পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪ সকাল ১০.৩০ মিনিট
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪ সকাল ১১ টা
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, ভোলা

প্রস্তাবনা: ১. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. সন্তানের লেখাপড়ার দায়দায়িত্ব বহন করা যেতে পারে

শহীদ জাহিদুজ্জামান তানভীন

ক্রমিক : ৮২

আইডি : ঢাকা সিটি ৮২

"মেধাবী তানভীনের শাহাদাত বরণ বাংলাদেশের অপূরনীয় ক্ষতি"

শহীদ পরিচিতি

রাজধানীর উত্তরায় ফ্যাসিস্ট হাসিনার পেটুয়া বাহিনী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী জাহিদুজ্জামান তানভীন (২৫)। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম শহীদ তানভীন। ছোটবেলা থেকেই প্রযুক্তির প্রতি ঝোঁক ছিল মেধাবী জাহিদুজ্জামান তানভীনের। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পড়ালেখাটাও তিনি মন দিয়ে করেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুই বোর্ড পরীক্ষায় তিনি জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন। কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে তানভীন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রডাকশন বিভাগে ভর্তি হন। উক্ত বিভাগের ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও শুরু থেকেই রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে থাকাকালীন বুয়েটে আয়োজিত "মডেল শিপ প্রোপালশন কম্পিটিশন" ও "সকার বট কম্পিটিশন"-এ অংশ নিয়ে হাতে তুলেন পুরস্কার।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছিল তানভীনের পদচারণা। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনস্টিটিউশন অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আয়োজিত ইউএএস এয়ারক্রাফট সিস্টেম প্রতিযোগিতায় তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। ওই প্রতিযোগিতার ছয়টি পুরস্কারের মধ্যে তিনটিই তানভীন ও তার দল জয় পেয়েছিলেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় নাসা আয়োজিত ইউরোপিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় বিশ্বে দশম এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন তানভীনের দল।

যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তরে পড়তে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। জাহিদুজ্জামানের স্নাতক শেষ হয়েছিল ২০২২ সালে। তিন বন্ধুকে নিয়ে 'অ্যান্ট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা ড্রোন দিয়ে জরিপের কাজ করতেন। পাশাপাশি অনলাইনে ড্রোন বিক্রি করতেন।

একমাত্র বোন জেসিকা জামান আয়েশা যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর করছেন। জাহিদুজ্জামান তানভীন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ভাবে অংশ নেন।

পরিবারের প্রয়োজনে আজমপুর এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে জাহিদুজ্জামান ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বাসা থেকে বের হন। দ্রুতই ফিরে আসবেন বলে তাঁর মাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আধা ঘণ্টা পর এক শিক্ষার্থী ফোন করে জানান, তাঁর ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

১৮ জুলাই সাধারণ ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে উত্তরায় ঘাতক যুবলীগের সন্ত্রাস বাহিনী বা স্বৈরাচারের পুলিশের নিক্ষিপ্ত বুলেট তার গলায় বিদ্ধ হয়। বুকে বিদ্ধ হয় ছররা গুলি। কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নিলে ডাক্তার মেধাবী এই তরুণকে মৃত ঘোষণা করেন।

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে এখন তার মা বিলকিস জামান (৪০) পাগলপ্রায়। থেকে থেকেই তিনি মূর্ছা যাচ্ছেন, বিলাপ করছেন। তানভীনের লাশকে জড়িয়ে তার আহাজারীতে ভারী হয়ে ওঠেছিল পুরো হাসপাতাল। তিনি বলেছিলেন, 'আমার সন্তানের লাশের বিনিময়ে দেশে শান্তি চাই।'

বিলকিস জামান আরো বলেন, 'আমার ছেলে দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন।' এসময় শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ কামনা করে তিনি বলেছিলেন, 'আর যেন কোনো মায়ের বুক খালি না হয়।'

জাহিদুজ্জামান তানভীন মা-বাবা আর এক বোনকে নিয়ে থাকতেন উত্তরা আজমপুর কাঁচাবাজার জামতলার ভাড়া বাড়িতে। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টের ছাত্র ছিলেন তিনি। মা বিলকিস জামান গৃহিণী।

জাহিদুজ্জামান তানভীনের মামা সমকালের সাংবাদিক আবু সালেহ মুসা বলেন, "অত্যন্ত মেধাবী জাহিদুজ্জামান তানভীনের গ্রামের

বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের ডিটি ভিশারা গ্রামে। তার বাবা শামসুজ্জামানও একজন ইঞ্জিনিয়ার। ঢাকায় টোয়া করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

তিনি আরো জানান, বৃহস্পতিবার সকালে আজমপুর ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য বের হয়েছিলেন তিনি। বারোটার দিকে সংবাদ পান ভাগ্নে গুলিবিদ্ধ হয়ে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে আছেন। এরপর হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারেন আদরের ভাগ্নে মারা গেছেন।"

শহীদ তানভীন সম্পর্কে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারই বিভাগের সহপাঠী মো. মুস্তাকীম আবতাহী বলেন, "সাউথ হল অব রেসিডেন্সের ১১৯ নম্বর রুমের সি বেডে থাকত জাহিদুজ্জামান তানভীন। যন্ত্রকৌশল '১৭-এর সেরা ছাত্র। আমাদের বন্ধু। এই রুমে থাকতাম আমি, মিতিন, নেহাল, শাতিল আর তানভীন। চারজনের রুমে আমরা পাঁচজন থাকতাম।

আমরা অনেকেই অনেক কিছু করার স্বপ্ন দেখতাম, শেষ পর্যন্ত সেটা আর বাস্তবায়ন করা হয়ে উঠত না। কিন্তু তানভীন যেটা চিন্তা করত, তা করে দেখাত। আমরা হয়তো ভাবতাম, টিউশনি করে টাকা জমিয়ে একটা ভালো ফোন কিনব। তানভীনের ভাবনা আলাদা। একবার তানভীন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একটা রোবোরেস কম্পিটিশন জিতে এল। আমরা সবাই বললাম, 'ট্রিট দে!' কিন্তু সে ওই টাকার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে একটা রেডিও ওয়েভ কন্ট্রোলার কিনে ফেলল। কারণ, থেমে থাকা যাবে না। এরপর বোট বানানো, বিদেশ থেকে ডিফারেন্সিয়াল আনিয়ে রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি বানানো। জল-স্থল-আকাশ, সব দিকেই ছিল তানভীনের আগ্রহ।

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ শেষে দুই মাসের ছুটি থাকে। আমরা সবাই বছর শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকতাম। কারণ, ছুটি কাটাতে বাসায় যাব। তানভীন ওই সময়ে হলে বসে থেকেই ড্রোন বানানোর কাজ করত। আমরা যখন মেকানিকসের পড়া পড়তাম, তানভীনের টেবিলে তখন ফ্লুয়িড মেকানিকসের বই। আগ্রহের বিষয়গুলোর পেছনে ও এত বেশি সময় দিত, খুব অবাক হতাম।

তানভীনের গল্প আসলে বলে শেষ করার নয়। কোনো কিছুতেই ওর 'না' নেই। আইইউটিতে ক্রিকেটে লং অনের সেরা ফিল্ডার, ফুটবলে লেফট ব্যাকের ভরসা, ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন। মার্শাল আর্টে ব্রাউন বেল্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়ররা অনেকেই ক্লাস বাদ দিয়ে তানভীনের সঙ্গে কাজ করতে চলে আসত। কারণ, সবার চোখেই তানভীন সেরা। ছোট-বড় সবার মনেই দাগ কেটে যেত। বেলা দুইটা হোক, কিংবা রাত দুইটা; আর কাউকে না পাওয়া গেলেও প্রয়োজনে তানভীনকে পাওয়া যেত ঠিকই।

অথচ সেই ছেলেটার জানাজায়ও আমরা কেউ থাকতে পারলাম না। ১৮ জুলাই ঢাকার উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মারা যায়। তানভীনের লাশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে জানাজা শেষে নিজ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জাহিদুজ্জামান তানভীনের ব্যাংকে জমানো টাকা বন্যার্তদের সহায়তায় দিয়েছেন তার মা। ২৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে গিয়ে তার মা বিলকিস জামান টাকাগুলো জমা দেন। বিলকিস জামান বলেন, তানভীন মাটির ব্যাংকে টাকা জমাতো। ঘর গোছানোর সময় ব্যাংকটি পাই। এরপর টিএসসিতে ত্রাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে শুনে চলে এসেছি। তানভীনের জমানো টাকা দিয়ে কিছু সামগ্রী ও নগদ সহায়তা দিয়েছি। ছেলেকে হারানোর কষ্ট থাকলেও দেশের জন্য প্রাণ দেয়াতে গর্বিত বলেও জানান তিনি।

প্রস্তাবনা

পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান হারানো পিতা-মাতাকে সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। শহীদ তানভীনের মাকে মাসিক অথবা বাৎসরিক সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে। বাবার জন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিলে উপকার হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: জাহিদুজ্জামান তানভীন
Name: JAHIDUZZAMAN TANVIN
পিতা: মোঃ সামসুজ্জামান
মাতা: বিলকিস জামান
Date of Birth: 13 Oct 1998
ID NO: 5115103201

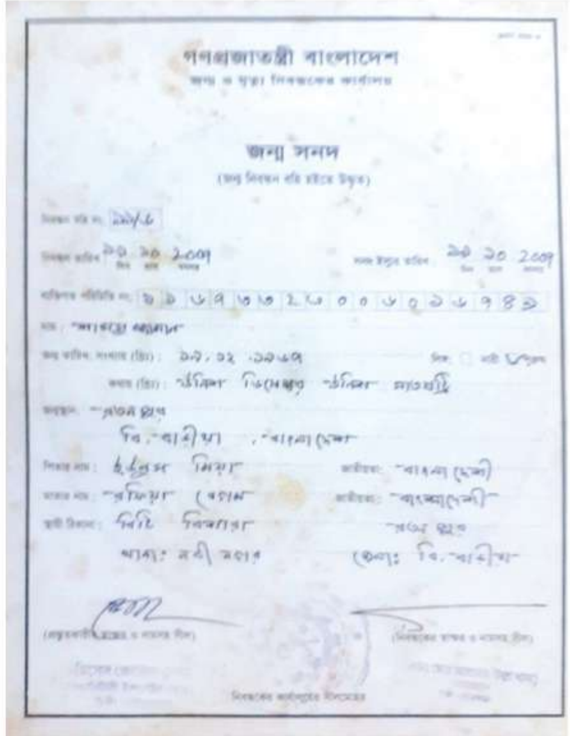

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

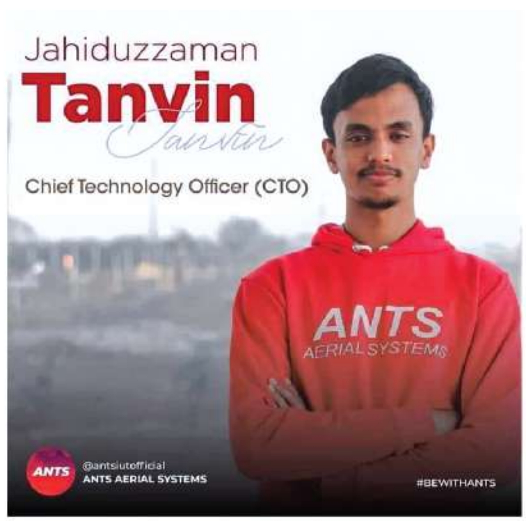

একনজরে ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: জাহিদুজ্জামান তানভীন
জন্মতারিখ	: ১৩/১০/১৯৯৮
পিতার নাম	: মো: সামসুজ্জামান (৫২) চাকুরীজীবী
মায়ের নাম	: বিলকিস জামান (৪০) পেশা: গৃহিণী
বোন	: জেসিকা জামান
পারিবারিক সদস্য	: ২ জন
পরিবারের মাসিক আয়	: ৫০ হাজার টাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভিটি-বিশারা, ইউনিয়ন: রতনপুর, থানা: নবীনগর
জেলা	: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: সাইদ মহল, এলাকা: আজমপুর কাঁচা বাজার
ঘটনার স্থান	: আজমপুর
আঘাতকারীর	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বা যুব লীগের সন্ত্রাসীবাহিনীতে
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৮ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫ টা, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে

"কে জানত এটা তার শেষ নামাজ"

শহীদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ০৮৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০৮৩

শহীদ পরিচিতি

মো. রফিকুল ইসলাম এর জন্ম ২৪-১২-১৯৭৩ সালে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার সাতকাছিমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত আব্দুল জব্বার সিকদার ও মাতা হাফিজা বেগম পরিবারের তিন ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম। পিতা আব্দুল জব্বার ছিলেন দিন মজুর। কাজ করতেন দর্জির। এই দর্জি পরিবারের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে চারজন। এই দিনমজুর পরিবারেই বেড়ে ওঠেন শহীদ রফিকুল ইসলাম। তিনি পরিবারের প্রথম সন্তান। দেশবিখ্যাত ঢাকা কলেজ থেকে তিনি মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

ছোটবেলা থেকেই বিনয়ী ছিলেন রফিকুল ইসলাম। মানুষ হিসেবে ছিলেন পরোপকারী। যথেষ্ট মার্জিত স্বভাব ছিল তার। ছাত্র হিসেবেও ছিলেন মেধাবী। পড়াশোনার পাশাপাশি দক্ষ কম্পিউটার প্রশিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন নিজেকে। এই স্বপ্নবাজ রফিকুল ইসলাম ঢাকায় আসেন ৩০ বছর আগে। ওয়ারি থানাধীন গোপীবাগ এলাকার মমতাজ ভিলার ৮৯/১২র দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটা ফ্লাটে তিনি ভাড়া থাকতেন। রফিকুল ইসলাম পরিবারের সদস্য সংখ্যা দুইজন। স্ত্রী গৃহিণী এবং ছেলে রায়হান ইসলাম তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় আলিম ২য় বর্ষে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী। শহীদের পিতা আব্দুল জব্বারের দুই সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান বাবার পেশা অর্থাৎ দর্জি পেশা বেছে নেন। তৃতীয় সন্তান বেছে নেন কীটনাশক ব্যবসা। আর একমাত্র মেয়ে বিবাহিতা।

আল্লাহর ডাকে শহীদ রফিক যেভাবে সাড়া দিলেন

২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ৭ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর ২০২১ সালে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে সংগঠন জন্ম নেয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ৪ জুলাই সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিষয়ে কোনো শুনানি না করে আপিল বিভাগ নট টুডে বলে আদেশ দেন। পরের দিন আন্দোলনকারীরা সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন ছাত্র ধর্মঘট পালন ও সারাদেশে বাংলা ব্লকেডের ডাক দেয়।

১৩ জুলাই সকল গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রাষ্টপতির কাছে স্মারকলিপি দেয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং পরের দিন জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে সরকারি চাকরির সকল গ্রেডে যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম বেধে দেয়া হয়। ১৫ তারিখ বিক্ষোভ কর্মসূচির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজু ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়ালে কোটা আন্দোলনকারীদের উপর ছাত্রলীগ ও ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্টের দলের দোসররা ছাত্রদের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়। এতে আন্দোলনে অবস্থানরত শিক্ষার্থী যারা ছিলেন অনেকেই আহত হয়ে ঢাকা

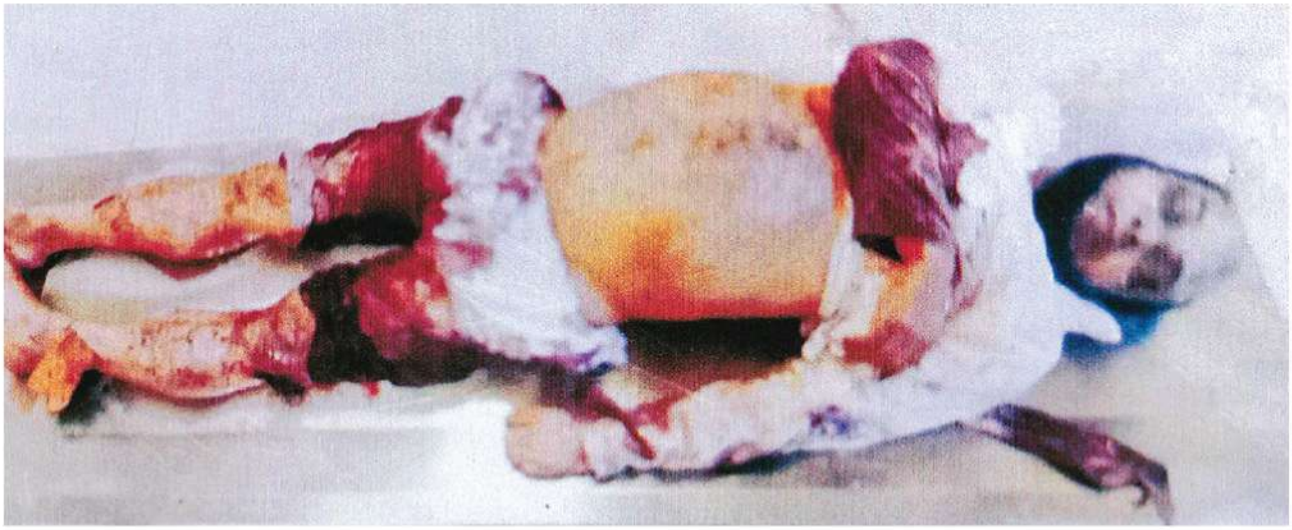

২০২৪ সালের ৫ জুন বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন। ৬ জুন ২৪ হাইকোর্টের রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা। পরবর্তীতে ৯ জুন হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করলে চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়ে দেন।

সেই দিনই কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পহেলা জুলাই মেডিকেল কলেজ ও পিজিতে ভর্তি হয়। হাসপাতালেও ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা আহতদের ওপর আবার হামলা চালায়।

১৬ জুলাই দিনভর ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ চলে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ আশেপাশের কলেজ স্কুল বন্ধের ঘোষণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়। ছয় জেলায় বিজিবি মোতায়ন করা হয়। সারাদেশে ৬ জন নিহত হয়। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে ফ্যাসিস্ট দোসর পুলিশ হত্যা করে। ১৭ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের দিনের নিহতদের স্মরণে গায়েবানা জানাজা চলাকালে পুলিশ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। পরের দিন সারাদেশে অবরোধ কর্মসূচি এবং সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। একযোগে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯ জুলাই কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা। সেইদিন রাজধানীতে ব্যাপক সংঘর্ষ হামলা ভাঙচুর গুলি অগ্নিসংযোগ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। গোপীবাগ এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল।

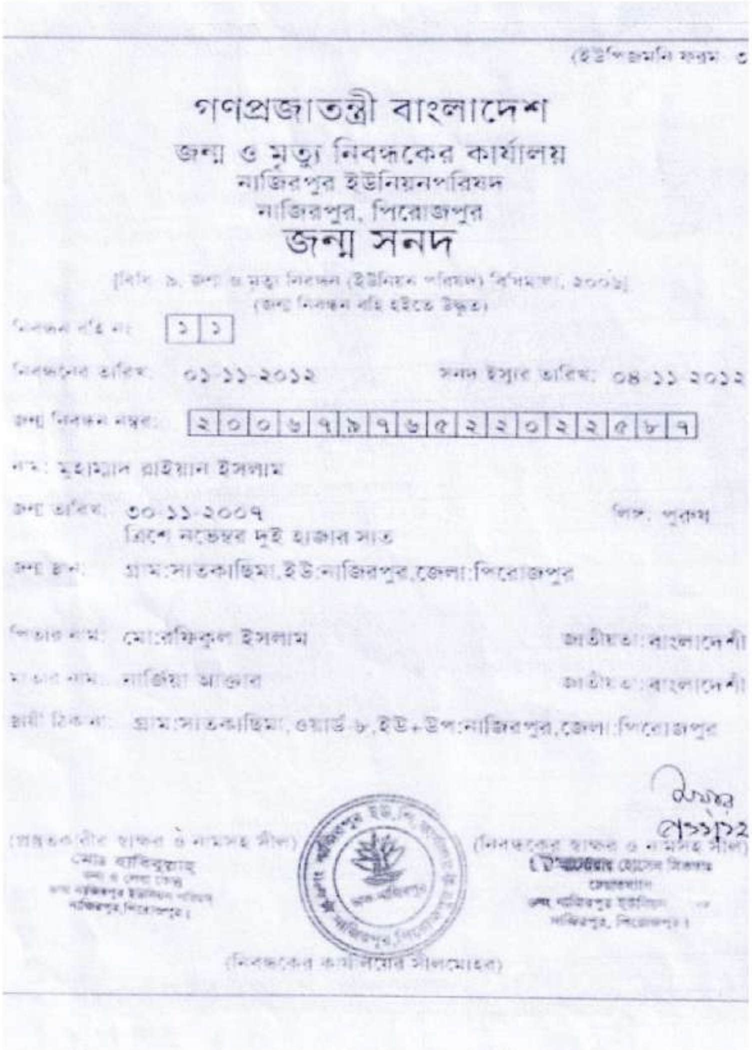

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
নাজিরপুর ইউনিয়নপরিষদ
নাজিরপুর, পিরোজপুর
জন্ম সনদ

নিবন্ধনের তারিখ: ০১-১১-২০১২ সনদ ইস্যুর তারিখ: ০৪-১১-২০১২

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৬৭৯৭৬৫২২০২২৫৮৭

নাম: মুহাম্মদ রাইয়ান ইসলাম

জন্ম তারিখ: ৩০-১১-২০০৭ লিঙ্গ: পুরুষ
ত্রিশে নভেম্বর দুই হাজার সাত

জন্ম স্থান: গ্রাম:সাতকাছিমা,ইউ:নাজিরপুর,জেলা:পিরোজপুর

পিতার নাম: মো:রফিকুল ইসলাম জাতীয়তা:বাংলাদেশী

মাতার নাম: নাজিয়া আক্তার জাতীয়তা:বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম:সাতকাছিমা, ওয়ার্ড-৬, ইউ+উপ:নাজিরপুর,জেলা:পিরোজপুর

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শহীদ রফিকুল ইসলাম একজন নিয়মিত মুসল্লী হিসেবে এবং মুত্তাকী হওয়ায় ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রতিদিনের মতো সেদিনও গোপীবাগ এলাকার এলাহী মসজিদে এশার নামাজ পড়তে নিজ বাসা থেকে যান। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কে জানতো এটাই তার জীবনের শেষ নামাজ হয়ে যাবে। মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুলিশ সদস্যরা শহীদ রফিকুল ইসলামকে তুলে নিয়ে যায়। গুম করেই নরপিশাচরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চার থেকে পাঁচটি গুলি চালায়। মৃত্যু নিশ্চিত হলে লাশ ফেলে পালিয়ে যায়।

অপরদিকে শহীদের পরিবার দিক বিদিক ছুটাছুটি করেও পরিবারের একমাত্র অবলম্বন শহীদ রফিকুল ইসলামকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। থানায়, হাসপাতাল, ক্লিনিক থেকে শুরু করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ পর্যন্ত বারবার ছুটে গিয়েও হতাশ হয়ে তাদের ফিরে আসতে হয়েছে। কে জানতো এমন নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের শিকার হতে হবে এই পরিবারকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে শহীদের পরিবার জানতে পারে ২৪ জুলাই ২৬ টি লাশ আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের রায়েরবাজার মোহাম্মদপুর কবরস্থানে বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়। চিরতরে এভাবেই নিভে যায় একটি ফুটন্ত গোলাপ। একটি পরিবারের কর্ণধার।

শহীদ সম্পর্কের নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর মন্তব্য

শহীদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এর বন্ধু গালিব টেলিকম সেন্টারের কর্ণধার এর ভাষ্যমতে শহীদ রফিকুল ইসলামের সাথে ২৫ বছরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। শহীদ রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একজন সক্রিয় রোকন প্রার্থী ছিলেন। তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। নিয়মিত কুরআন পড়তেন। হাদিসের চর্চা করতেন। নিয়মিত মসজিদে জামাআতে নামাজ আদায় করতেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সবসময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে এলাকার কারো কোনো শত্রুতা নেই। রাজনৈতিকভাবে তাকে আওয়ামী লীগের লোকজন প্রতিপক্ষ বলে মনে করত। তিনি তার বন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন এবং সরকারের কাছে এই সহায়তা ও অসচ্ছল পরিবারের সহায়তা দাবি করেন। মো: খোরশেদ আলম (শহীদের বন্ধু)

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: রফিকুল ইসলাম
জন্মতারিখ	: ২৪-১২-১৯৭৩ সালের পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার সাতকাছিমা গ্রাম
স্ত্রী	: গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ২ জন
পরিবারের মাসিক আয়	: ২০ হাজার টাকা
ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা	: এক ছেলে
১) ছেলে	: রায়হান ইসলাম। তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা আলিম দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত
পেশা	: দক্ষ কম্পিউটার প্রশিক্ষক
স্থায়ী ঠিকানা	: পিরোজপুর জেলার, নাজিরপুর থানার সাতকাছিমা ইউনিয়নের, সাতকাছিমা গ্রামের বাসিন্দা
বর্তমান ঠিকান	: ৮৯/১২, মমতাজ ভিলা, গোপীবাগ এলাকা, ওয়ারী থানা, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: গোপীবাগ ভূতের বাড়ি রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন এলাহী মসজিদের সামনে
আঘাতকারী	: পুলিশ ও ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের দ্বারা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৯ টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ১২:১০ মিনিট
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: রায়েরবাজার কবরস্থান, মোহাম্মদপুর

"শহীদ সাকিল সংগ্রামের এক অনন্য নাম"

শহীদ মোঃ সাকিল

ক্রমিক : ০৮৪

আইডি : ঢাকা সিটি ০৮৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ সাকিল, তাঁর জন্ম হয়েছিল ২২ জানুয়ারি, ২০০২ সালে ভোলা জেলার চন্দ্রপ্রসাদ উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নের সর্দারবাড়ী নামক গ্রামে। বাবা ছিলেন কৃষক এবং মা ছিলেন গৃহিণী। অল্প বয়সেই বাবা হারা হন সাকিল, বর্তমানে মায়ের বয়স ৭০ বছর। চার ভাইবোনসহ (দুই ভাই এবং দুইবোন) পাঁচ সদস্যের পরিবারে আর্থিক দুরবস্থা তাদের ছিল চিরকালের সঙ্গী। কিন্তু সাকিলের মনের মধ্যে ছিল এক অদম্য ইচ্ছা–সমাজের জন্য কিছু করা। তাই ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী হন তিনি।

সাকিলের শৈশব থেকে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সঙ্কট ছিল অব্যাহত। পরিবারের আর্থিক সঙ্কটের কারণে মাত্র ১১ বছর বয়সে ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি। ঢাকার পল্লবী উপজেলার মিরপুর ১২ তে তিনি ছোট একটি বাসায় উঠলেন, যেখানে মাসিক ভাড়া ছিল মাত্র ৫ হাজার টাকা। গ্রামে টিনের একটা কুটির থাকলেও সেখানে বসবাস করার জন্য আয় রোজগারের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বয়সেই তাকে ঢাকায় পাড়ি জমাতে হয় মা এবং ভাইকে নিয়ে। জীবিকার জন্য টিউশনি এবং ইলেক্ট্রিক্যাল কাজও তাকে করতে হয়েছিল। তার ছোট ভাইও ঢাকা শহরে একটি কারখানায় কাজ করত। তাদের দুজনের আয়ে কোনোরকমে সংসার চলত।

এমন অবস্থায়ও সাকিল পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েননি। ঢাকার ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভে (ইউডা) ভর্তি হন। শিক্ষা ছিল তাঁর কাছে স্বপ্নের পথে প্রথম পদক্ষেপ। সে সময়ে ছাত্ররাজনীতিতে প্রবেশ করেন। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য হয়ে ওঠেন এবং আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেন।

কিন্তু জীবনে তার অনেক কিছুই অপুর্ণ থেকে গেল সন্ত্রাসী সরকারের গুন্ডা বাহিনী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ছোড়া বুলেটের আঘাতে। ৪ আগস্ট, ২০২৪ একটি ঘটনাই সাকিলের জীবনের সবকিছু বদলে দেয়। মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বরে যখন ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকে তখন সাধারণ ছাত্রজনতা দিশেহারা হয়ে পরে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালানো হয়। এর মধ্যে একটা বুলেট ফুটো করে দেয় বীর সাকিলের বুক। রক্তে রঞ্জিত হয় তার শরীর। চিকিৎসার জন্য প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে, কিন্তু ভাগ্য তার সহায় ছিল না। হাসপাতালে কোনো ডাক্তার ছিল না। এদিকে অসুস্থতায় কাতরাতে থাকে সাকিল। এমতাবস্থায় তাকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেয়া হয় কিন্তু সেখানেও ভাগ্য সহায় হয়নি সাকিলের। পরবর্তীতে তাকে নেয়া হয় কুর্মিটোলা নিউরো সাইন্স হাসপাতালে। অবশেষে ৭ আগস্ট, বিকাল ৩টায় তিনি তার জীবনকে বিদায় জানান।

সাকিলের মৃত্যু সবার হৃদয়ে শোকের ছায়া ফেলেছিল। তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে শিক্ষক ও সহপাঠীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। এরপর শহীদ মিনারসহ বিভিন্ন স্থানে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে, ৮ আগস্ট ভেলুমিয়ায় তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

সাকিলের জীবন ছিল সংগ্রামের, কিন্তু তিনি ছিলেন একটি স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করা এক তরুণ। তাঁর অবদান এবং সংগ্রাম আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়।

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, BIRTH AND DEATH REGISTRATION
LOCAL GOVERNMENT DIVISION

Back to Previous Page (/)

BIRTH REGISTRATION RECORD VERIFICATION

REGISTRATION DATE	REGISTRATION OFFICE	ISSUANCE DATE
12 JANUARY 2013	DHANIA UNION PARISHAD	12 JANUARY 2013
DATE OF BIRTH	BIRTH REGISTRATION NUMBER	SEX
25 JANUARY 2002	20020911836101839	MALE

নিবন্ধিত ব্যক্তির নাম	মো: সাকিল	REGISTERED PERSON NAME	
জন্মস্থান	ধনিয়া	PLACE OF BIRTH	
মাতার নাম	বিবি আয়শা	MOTHER'S NAME	
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	MOTHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI
পিতার নাম	সিদ্দিক	FATHER'S NAME	
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	FATHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI

NB:This record is retrived from Birth and Death Registration Database . Location of the Register office : DHANIA, BHOLA SADAR, BHOLA. everify.bdris.gov.bd (https://everify.bdris.gov.bd/) is the official website to verify the record

Back to Previous Page (/)

© 2024 - Developed and maintained by Office of the Registrar General, Birth and Death Registration

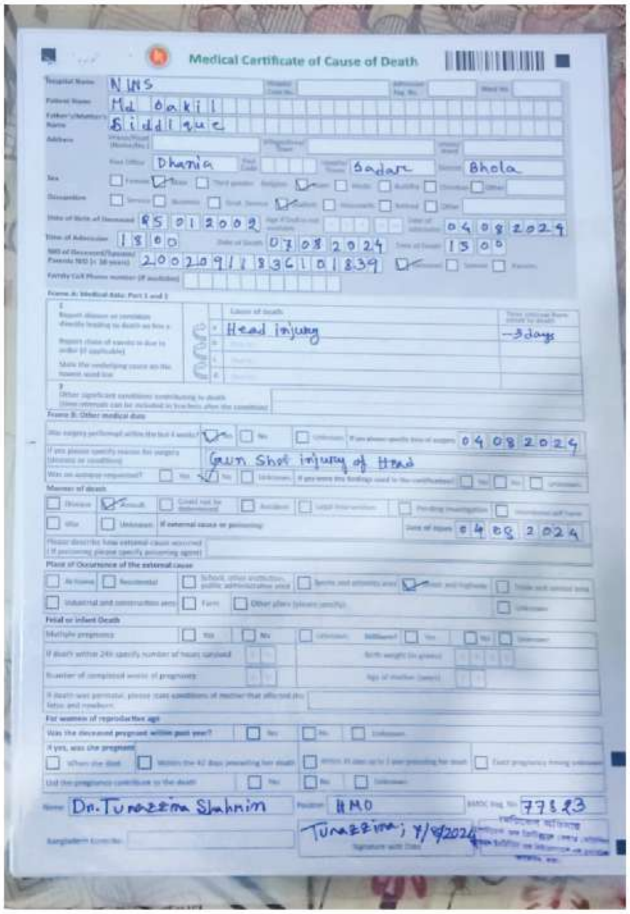

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: NINS
Patient Name: Md Sakil
Father's Name: Siddique
Dhania — Sadar — Bhola
Date of Birth: 25 01 2002
Date of Admission: 04 08 2024
Time of Admission: 18 00
Date of Death: 07 08 2024 — Time of Death: 15 00
NID/Birth Reg. No.: 20020911836101839
Cause of death: Head injury — 3 days
Gun Shot injury of Head
Date of surgery: 04 08 2024
Date of injury: 04 08 2024
Name: Dr. Tunazzina Shahrin — HMO — 77323
Tunazzina; 7/8/2024

একনজরে ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: সাকিল
পিতার নাম	: সিদ্দিক
মাতার নাম	: বিবি আয়েশা (৭০)
পেশা	: ছাত্র, প্রতিষ্ঠান : ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, অনার্স ২য় বর্ষ
পরিবারের সদস্য	: ৫ জন, (১) বড় দুই বোন বিবাহিত, ছোট ভাই পঞ্জাবি কারখানার সাধারণ শ্রমিক
পরিবারের মাসিক আয়	: ১০,০০০ টাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-সর্দারবাড়ী, ইউনিয়ন ভেলুমিয়া, উপজেলা-চন্দ্রপ্রসাদ জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা-২/এ, লেন-১/বি, ব্লক ডি মিরপুর ১২, থানা পল্লবী, জেলা ঢাকা
আঘাতকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগের গুলিতে
মৃত্যু তারিখ	: ৭ আগস্ট নিউরো সাইন্স হাসপাতালে বিকাল ৩ টায়
করব	: ভোলার ভেলুমিয়ায় কবরস্থ করা হয়

“অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই শহীদ হয়ে গেলেন”

শহীদ শাহরিয়ার হোসেন রোকন

ক্রমিক : ০৮৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০৮৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাহরিয়ার হোসেন রোকন একটি নাম একটি ইতিহাস। তিনি ২০০১ সালে ঢাকার মোহাম্মদপুরের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা জনাব মনির হোসেন একজন দিনমজুর। তার মা মোসা: রাবেয়া বেগম ছোট-খাট একটি চাকরি করেন। পিতা-মাতার বড় সন্তান শহীদ শাহরিয়ার। দরিদ্রতার কারনে অল্প বয়সেই পড়াশোনা ছেড়ে ডেলিভারি বয়ের চাকরি নেন। তাদের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। তাই তাদের ভাড়া বাসায় থাকতে হয়। শহীদ রোকন বেতন পেতেন তার অর্ধেক বাসা ভাড়া দিতে চলে যেত। বাকি টাকা দিয়ে কোনমতে ডাল-ভাত খেয়ে পরিবারের সাথে কোনোরকমে দিন পার করতেন শহীদ শাহরিয়ার হোসেন। পরিবারে তাঁর আরও ২ টা ভাই আছে। ছোট ভাই তামজিদুল ইসলাম কাঠমিস্ত্রীর কাজ শিখছেন আরেক ছোট ভাই চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

জুলাই বিপ্লবের আন্দোলনে জীবন দিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান শহীদ শাহরিয়ার হোসেন রোকন। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে তোলা থাকবে তাঁর নাম।

তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনড়। সততা ও ন্যায়ের প্রশ্নে কখনো আপোষ করেননি। দরিদ্রতার কারনে ডেলিভারির বয়ের কাজ করেন কিন্তু কখনো কোন অন্যায়ের কাজের সাথে জড়িত হননি। সততাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রতিবেশীর কাছে ছিলেন আদর্শের প্রতীক। কারও সাথে কখনো কোন কটু কথা বলেননি। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। কারও বিপদ আপদ দেখলে দৌড়ে যেতেন।

যেভাবে তিনি শাহাদাতের মালা গলায় পড়লেন

২০০৮ সালে এক প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামীলীগ। দলের প্রধান হিসেবে সরকার হন শেখ হাসিনা। ক্ষমতায় এসেই শুরু করেন নানান অরাজকতা। বিডিআর বিদ্রোহের মাধ্যমে পিলখানা ট্র্যাজেডি ঘটান। যেখানে নিহত হয় ৫৭ জন চৌকস সেনা অফিসারসহ অসংখ্য সেনা ও বিডিআর সদস্য।

২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামি ১৩ দফার দাবীতে একত্রিত হয়। তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি করে পাখির মত হত্যা করে অসংখ্য হেফাজত কর্মীকে। ঘটনা ধামাচাপা দিতে রাতের আধারে লাশ গুম করে ফেলে।

এরপর নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর আওয়ামী সরকারের সহচর ছাত্রলীগের ক্যাডাররা সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালিয়েছিল। সরকারের ছত্রছায়ায় ছাত্রলীগ দিনে দিনে বেপরোয় হয়ে ওঠে।

স্বৈরাচার শেখ হাসিনার কাছে মানুষ খুন করা ছিল ছেলে-খেলা। বিরোধী দলকে দমন করতে গুম-খুন, হত্যা, গ্রেফতার, দমন-নিপীড়ন চালায়। আয়না ঘরে বন্দী করে রেখে অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়।

শুধু তাই নয় ব্যাংক লুট, অর্থ পাচার, দুর্নীতি, ঘোষ, চাঁদাবজি,সন্ত্রাসী ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে। সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থের যোগান দিতে জনগণের উপর মাত্রাতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ করে। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবনকে দু:র্বীসহ করে তুলে। নিম্ন আয়ের মানুষ পরিবারের ব্যয় বহন করতে না পেরে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে গলা চেপে ধরে। জনগণের বাকস্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে সমালোচনার সকল পথ বন্ধ করে দেয়।

ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। পরপর দুইটি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে। প্রতিটি সেক্টরে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথার মাধ্যমে মেধাবীদের অবমূল্যায়ন করা হয়। দলীয় কর্মীদের অবৈধভাবে সরকারের বিভিন্ন কর্মে নিয়োগ প্রদান করে।

ছাত্রজনতা এসব অনাচার ও বৈষম্য মেনে নিতে পারেনি। ২০১৮ সালে ছাত্র-জনতা কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। সেখানেও ছাত্রলীগ হামলা চালায়। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার নির্বাহী আদেশে কোটা প্রথা বাতিল করার কথা বললেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাইতো ২০২৪ এ এসে আবারো আন্দোলন শুরু করে ছাত্র জনতা। জনগণের মনে দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ এই আন্দোলনে এসে ফেটে পড়ে। ছাত্রদের সাথে সাধারণ মানুষও যুক্ত হয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে। অবিরাম আন্দোলন চলতে থাকে। ১৩ জুলাই ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে শাহবাগে আসে। সেখানে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। ছাত্র-জনতা পুলিশের বেরিকেড ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে। ১৪ তারিখ রাতে

এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতা কে রাজাকারের বাচ্চা বলে গালি দেয়। মুহূর্তেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ছাত্রজনতা "তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার" বলে স্লোগান দিতে থাকে।

পরদিন ১৫ তারিখ ছাত্র-জনতা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান নেয়। অপরদিকে ছাত্রলীগ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের উস্কানি পেয়ে লাঠিসোঁটা, রামদা, চাপাতি, হকিষ্টিক স্ট্যাম্প, লোহার রড ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ছাত্ররা যখন সমাবেশ করছিল তখন হঠাৎ করেই তারা ছাত্রজনতার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ৭১'র ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে ঢাকার ঘুমন্ত মানুষের উপর হামলা চালিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে ছাত্রলীগও ছাত্রজনতার উপর হামলা চালায়। বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে আহত করে। তাদের হাত থেকে নিরীহ বোনরাও রক্ষা পায় না। অনেকের মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। অনেকের হাত-পা ভেঙে দেয়। তবুও তারা থেমে থাকেনি। তারা মেয়েদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করে না। শত শত শিক্ষার্থী আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়। ছাত্রলীগ হাসপাতালে গিয়েও ভর্তিরত আহত শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতন চালায়। ছাত্রলীগের ভয়ে পালিয়েও নির্যাতিতদের রক্ষা মেলেনি।

১৫ তারিখ সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ১৬ তারিখ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল হয়। এই দিনে শহীদ আবু সাইদ বুক পেতে দেয় ঘাতকের বুলেটের সামনে। পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আবু সাইদের শরীর। আবু সাইদের মৃত্যু পুরো দেশকে কাঁদিয়েছিল। ১৮ তারিখ ছাত্র-জনতা কমপ্লিট শাট ডাউন ঘোষণা করে। সেদিন রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ঢাকা শহর। ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ছাত্র-জনতাকে লক্ষ করে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট, গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। গ্রেনেডের শব্দে কেঁপে ওঠে ঢাকা শহর। শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। তাদেরকে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিহত হয় আরও অনেকে।

সারাদেশে সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। চিরুনি অভিযান চালিয়ে ঢাকার বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে নিরপরাধ ছাত্রদের ধরে এনে অমানবিক নির্যাতন চালায় পুলিশ। এসব দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষের বিবেক কেঁদে উঠে। কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে না। সবাই যার যার জায়গা থেকে আন্দোলনে যুক্ত হয়। কেউ পানি দিয়ে, খাবার দিয়ে কেউ আবার আশ্রয় দিয়ে ছাত্রদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

১৯ জুলাই সকাল ১০ টায় শহীদ শাহরিয়ার হোসেন বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। সকাল থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। স্বৈরাচারীরের পুলিশ বাহিনী সাজোয়াজান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে আন্দোলন প্রতিহত করতে মরিয়া হয়ে উঠে। সকালের পর থেকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর ধানমণ্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকা। সকাল থেকে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয় একটানা বিকেল তিনটা পর্যন্ত চলে এই সংঘর্ষ।

আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড় পুলিশ। ছাত্র-জনতা ইট পাটকেল ছুড়ে পুলিশকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী অতর্কিত গুলি চালালে সেখানে ছাত্র জনতা টিকে থাকতে পারে না। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। একের পর এক সাধারণ শিক্ষার্থী গুলি বিদ্ধ হয়ে রাস্তায় মুখ থোবড়ে পড়ে। অনেকে সেন্সলেস হয়ে যায়। আহত হয় শতাধিক। মুহূর্তের মধ্যেই মোহাম্মদপুর এলাকা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহীদ শাহরিয়ার হোসেন গুলিবিদ্ধ মানুষকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর কাজ শুরু করে দেয়। পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলির মধ্যে টিকা সম্ভব ছিল না। তিনি যখন উদ্ধার কাজে ব্যস্ত ঠিক তখনি অনেকগুলা ছোররা গুলি এসে তার শরীরে বিদ্ধ হয়। যে মানুষটি এতক্ষণ অন্যদের উদ্ধার করতে ব্যস্ত ছিল সেই মানুষটিই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। ছাত্ররা তাকে উদ্ধার করে মমতাজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তাররা কিছু করতে পারলেন না। তারপর তাঁকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই আনুমানিক দুপুর ১২ টার দিকে তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায় নেমে আসে। কান্নায় ফেটে পড়ে তার দরদী মা। তাঁর বাবা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন,আর ফিরে আইব না আমার ছেলে।

দাফন: বিকাল ৪ টার দিকে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। তাকে রায়ের বাজার কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

সন্তানকে হারিয়ে পিতা মাতা দুজনেই পাগলপ্রায়। মায়ের অনুভূতি প্রকাশ করার মত না।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ শাহরিয়ার হোসেন রোকনেরা ৩ ভাই। তার বাবা দিনমজুর এবং মা ছোট-খাট একটা চাকরি করেন। ছোট ভাই তামজিদুল ইসলাম ও সানজিদ। তামজিদুল ইসলাম কাঠমিস্ত্রীর কাজ শিখছেন এবং সানজিদ ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে। তাদের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। তাই ভাড়া বাসায় থাকতে হয়। অনেক টাকা ভাড়া বাবদ চলে যেত। শহীদ শাহরিয়ারের আয় দিয়েই মুলত সংসার চলত। তার মৃত্যুতে পরিবার এক সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়েছেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শাহরিয়ার হোসেন রোকন
পেশা	: ডেলিভারি বয়
জন্ম তারিখ	: ২৭/০১/২০০১
জন্ম স্থান	: মোহাম্মদপুর, ঢাকা
পিতা	: মো: মনির হোসেন
মাতা	: রাবেয়া বেগম
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪ সকাল ১১:৩০
স্থান	: ময়ুর ভিলা সড়ক, মোহাম্মদপুর সড়ক
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে যাওয়ার পথে
দাফন	: রায়ের বাজার, ঢাকা

১৪ মাসের শিশু ছেলেকে রেখেই
শহীদ হলেন বাবা

শহীদ মোহাম্মদ সুজন
ক্রমিক : ০৮৬
আইডি : ঢাকা সিটি ০৮৬

শহীদ পরিচিতি

অত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে উঠে আসা তরুণ বীর সন্তান মো: সুজন। তিনি ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার অন্তর্গত গ্রাম সিপাহীবাড়িতে ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই সুজন ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে এবং পরিবারের প্রতি প্রতিশ্রুতবদ্ধ একজন নাগরিক। শহীদ মো: সুজন তার শৈশব কাটিয়েছেন গ্রামেই। সেখানেই তিনি স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরিবারের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি স্কুল জীবন শেষ করতে পারেনি। শহীদ মো: সুজন পারিবারিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদে ১৮ বছর বয়সেই ঢাকায় পাড়ি জমান। শহীদ সুজনের বয়োবৃদ্ধ পিতা সিরাজুল ইসলাম। শহীদ সুজনের মাতা রেনু বেগমও বয়োবৃদ্ধ।

পিতা-মাতা এখনো পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন। পিতা-মাতা, স্ত্রী, ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব শহীদ সুজনের কাঁধে এসে পরে। শহীদ সুজনের ১৪ মাসের ছেলে সন্তান রয়েছে। শহীদ সুজন জীবিকার তাগিদে পাঁচ বছর আগে ঢাকায় এসে দিনমজুরের কাজ করেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারন ট্রাকের সহকারী। তার এই অতি সামান্য আয় থেকেই স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতাকে নিয়ে মোহাম্মদপুর বেড়িবাধের পাশে ছোট্ট একটি ভাড়া ঘরে বসবাস করতেন। শহীদ সুজন পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য একমাত্র এই কাজটিই করতেন। ছাত্রজীবনে শহীদ সুজন ছিলেন একজন মেধাবী, পরিশ্রমী ও মনোযোগী ছাত্র। যা তার শিক্ষকদের মধ্য থেকেই জানা যায়। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবে স্বৈরাচার সরকার কর্তৃক নিহতদের মধ্যে শহীদ সুজন একজন। শহীদ সুজনের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্যই নয়, পুরো এলাকায় এক গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৪ মাসের ছেলে মোঃ শুভকে ইয়াতিম বানিয়েছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা।

ঘটনা সংক্রান্ত বর্ণনা

২০২৪ সালে জুলাই মাসে শুরু হয় কোটা সংস্কারের প্রতিবাদে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ৫৬ পার্সেন্ট অযৌক্তিক কোটাকে সংস্কার করার দাবিতে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে থাকে। ১৪ তারিখে অবৈধ হাসিনা ছাত্রছাত্রীদেরকে রাজাকার বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তখন আন্দোলনের মাত্রা আরো বেগবান হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেল তিনটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশেপাশের শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে জমা হয়। ১৫ তারিখে খুনি ওবায়দুল কাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ছাত্রলীগকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে ছাত্রদেরকে দমন করার জন্য বলা হয়। পরবর্তীতে ছাত্ররা প্রতিবাদ সমাবেশ নিয়ে বের হলে, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ও টোকাই বাহিনী ভারী অস্ত্র নিয়ে ছাত্রদের উপরে আক্রমণ করে। ছাত্রদের পাশাপাশি অসংখ্য ছাত্রীদের কেউ প্রচন্ড পরিমাণে আঘাত করা হয়।

এরপর পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে সরকার। হল থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতায় বের করে দেন শিক্ষার্থীদের। সারাদেশে বন্ধ করে দেন ক্যাম্পাস সমূহ। ১৬ তারিখে হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ লীগ শহীদ আবু সাঈদ সহ ৬ জনকে শহীদ করে। এরপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী, যুবলীগের জঙ্গি বাহিনী, পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীরাও নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। তারা এই অপকর্ম গোপন করার জন্য দেশব্যাপী ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়। তাদের এই জঘন্য অপকর্মের জন্য আস্তে আস্তে ছাত্রদের সাথে যুক্ত হতে থাকেন অভিভাবক, আইনজীবী, সাংবাদিক ও সাধারণ জনতা। পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী মিলে শুধু সরাসরি সামনে থেকেই নয় বরং তারা আকাশ পথে হেলিকপ্টার এর মাধ্যমেও গুলি বর্ষন করেন।

কোলের বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ নাগরিক, সকল স্তরের জনগণ শহীদ হয়। সারা দেশব্যাপী প্রায় এক হাজার ছাত্র-জনতাকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া রাবার বুলেট, টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেডের আঘাতে হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে আহত করে। আর এই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার পক্ষেই ছিলেন শহীদ সুজন। তিনি সব সময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। তার সাহসী অবস্থানের জন্য সবার কাছে সম্মানিত ছিলেন। ২০২৪ এর ২০ শে জুলাই রাত আটটা ত্রিশ মিনিটে সুজন তার কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। মোহাম্মদপুরে বেরিবাধের কাছাকাছি পৌঁছানোর সময় বিক্ষোভ চলছিল। ছাত্র-জনতা কে লক্ষ্য করে পুলিশ মুহুর্মুহু গুলি চালায়। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে একটি গুলি তার পাঁজরের এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সুজন। তার সঙ্গী আন্দোলনকারীরা দ্রুত তাকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে যান এবং চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ও করণীয়: শহীদ সুজন ছিলেন একজন সাধারন ট্রাকের সহকারি। তিনি সেখান থেকে স্বল্প টাকাও উপার্জন করতেন। তার এই টাকা দিয়ে স্ত্রী একটি সন্তানও পিতা-মাতাকে নিয়ে ভালোভাবেই বসবাস করছিলেন। তাদের গ্রামের বাড়িতে কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি থাকলেও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সামান্য আয়ের মধ্যেই পরিবারকে নিয়ে টিকে থাকতে হয়। একমাত্র কর্মকর্তার শাহাদাতের কারণে তাদের পরিবারে নেমে আসে দুঃখ কষ্ট। বর্তমানে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের পরিবার পরিচালনা করতে।

ছেলের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা যেতে পারে।
পরিবারের জন্য মাসিক সাহায্য প্রকল্প চালু করা যেতে পারে।
এছাড়াও সময়ের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতে সহায়তা করা যেতে পারে।

শহীদ সম্পর্কে নিকট প্রতিবেশীর বক্তব্য

শহীদ সুজনের জীবন ছিল সংগ্রাম আর সাদাসিধে আচরণের প্রতিচ্ছবি। তার প্রতিবেশী বলেন সে অনেক ভালো মানুষ ছিল। তার কোন বদ নেশা ছিল না। সব সময় মানুষের সাথে ভালোভাবে মিশতেন। তার চাওয়া ছিল শুধুমাত্র পরিবারের জন্য কিছু করার।
-মোহাম্মদ শফি, প্রতিবেশী

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Sachra Union Parishad
Burhanuddin, Bhola
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 28/06/2024
Birth Registration Number 20000912176119799
Date of Issuance 28/06/2024

Date of Birth : 01/01/2000 Sex : Female
In Word : First of January Two Thousand

নাম	: মোঃ সুজন	Name	: Md Sujan
মাতা	: রানু	Mother	: Ranu
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ সিরাজল ইসলাম	Father	: Md Sarajr Islam
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: ভোলা, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Bhola, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: সিপাই বাড়ি গ্রামঃ সাচরা পোষ্টঃ দরুন বাজার, সাচরা, বোরহানউদ্দীন, ভোলা	Permanent Address	: Sipap Bari Vill: Sacra Post: Darun Bazar, Sachra, Burhanuddin, Bhola

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md. Siam Mrida
Promoter
17 No. Sachra Union Parishad
Burhanuddin, Bhola.

Seal & Signature
Registrar
Md. Mohebullah Mrida
Chairman
17 No Sachra Union Parishad
Burhanuddin, Bhola.

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: শহীদ মো: সুজন
জন্মতারিখ	: ০১/০১/২০২০
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: সেরাজুল ইসলাম, ৭০ বছর, বৃদ্ধ
মায়ের নাম ও পেশা:	: রেনু বেগম, ৬০ বছর, বৃদ্ধ
পারিবারিক সদস্য	: ৪ জন (পিতা, মাতা, স্ত্রী, ছেলে)
ছেলে মেয়ে	: একজন ছেলে, মো: শুভ, বয়স: ১৪ মাস
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সিপাহী বাড়ি, ইউনিয়ন: দারুন বাজার, থানা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: ৭নং হাউজিং, এলাকা: ৭ নং মসজিদ হাউজিং বেড়িবাধ থানা: মোহাম্মদপুর, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: বেড়িবাধ
আঘাতকারী	: মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: মোহাম্মদপুর বেড়িবাধের কাছাকাছি
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: স্পট ডেথ
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: ভোলা

শহীদ মো: হোসেন

ক্রমিক : ০৮৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০৮৭

শহীদ পরিচিতি

মো: হোসেন, ১০ মে ২০০০ সালে ভোলা জেলার একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা, মো: জাফর, একজন দিনমজুর এবং মা, রিনা একজন দিনমজুর কিন্তু অসুস্থ থাকার কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন তিনি। পরিবারের তিনটি সন্তানের মধ্যে মোঃ হোসেন ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী, মাসে ২০ হাজার টাকা উপার্জন করে তাঁদের বোঝা কমানোর চেষ্টা করতেন।

অভাবের কারণে গ্রামে থাকতে না পেরে ২৫ বছর আগে সপরিবারে ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুরের উপজেলার স্বপ্নধারা হাউজিং এর বাছিলা রোডে বসবাস শুরু করে। অর্থের অভাবে ঢাকায় আসলেও অর্থাভাব পিছু ছাড়েনি তাদের পরিবারের। অভাবের তাড়ণায় হোসেনের মা বৃদ্ধ বয়সেও দিনমজুরের কাজ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু হোসেনের মাও ছিল অসুস্থতায় জর্জরিত। হোসেনের ছোট ভাই প্রতিবন্ধী এবং মা অসুস্থ হওয়ায় পরিবারের আর্থিক চাপ বেড়ে যায়। তাঁরা ৪ লক্ষ টাকার ঋণে জর্জরিত ছিলেন, যা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনকে আরো কঠিন করে তুলেছিল।

৫ জুলাই থেকে গড়ে ওঠা কোটা বিরোধী আন্দোলন যখন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে রুপ নেয় তখন সকল ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেয় এই খুনি আওয়ামী সরকার। এমনকি বিজিবিকে রাস্তায় নামানো হয়। কিন্তু সাহসী ছাত্রজনতা যখন হাসিনার পালিত পুলিশ এবং বিজিবিকে উপেক্ষা করে আন্দোলন করতে থাকে তখন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং কারফিউ জারি করতে বাধ্য হয় আওয়ামী সন্ত্রাসী সরকার। এতে আরও বিপাকে পরে হোসেন। স্ত্রী, পাঁচ বছর বয়সী দুই কন্যা সন্তান, অসুস্থ মা এবং প্রতিবন্ধী ভাই সহ পাঁচ সদস্যের পরিবার নিয়ে তাকে আরও বিপাকে পড়তে হয়। যাদের ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা তাদের আর ঘরে বসে থাকার কথা ভাবলে চলেনা। এই ভেবে আবারও ১৮ জুলাই কারফিউর মধ্যেই ট্রাক নিয়ে বের হন শহীদ হোসেন। নিজের জীবনের জিম্মাদারি দেয় রবের কাছে কিন্তু কে জানত তার ভাগ্য তার সাথে এতো নির্মম পরিহাস করবে। কিন্তু এটি তো ভাগ্যের পরিহাস ছিলনা। এটা ছিল স্বৈরাচার হাসিনার পরিহাস। সে তার পেটোয়া, নির্যাতক পুলিশবাহিনীকে মানুষ মারার খোলা হুকুম দিয়েছিল। যার নির্মম ফল ভোগ করে হোসেন।

শহীদ হোসেন দিনের বেলা গাড়ি বের করতে না পেরে ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে গাড়ি বের করে। রাত ৩টার সময় কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে মো: হোসেনের মাথা এবং হাত গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় স্বৈরাচারের পুলিশ বাহিনি। রাস্তাতেই প্রাণ হারান হোসেন। প্রতিবেশীরা ঘটনাটি দেখলেও সাহায্য করার মত কেউ এগিয়ে আসার সাহসিকতা তারা দেখাতে পারেনি।

হোসেনের বাড়ির গেটে যখন তার লাশ নিয়ে আসা হয় তখন বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে তার মা এবং স্ত্রী। ঘুম ঘুম চোখে ধীরে ধীরে উঠে আসে পাঁচ বছর বয়সী তাঁর দুই মেয়ে লিমা ও সিমা। চোখের কোণে জড়ো হতে থাকে অশ্রুকণা এবং একসময় তা বৃষ্টির মত ঝরঝর করে পড়তে শুরু করে। তাদের হৃদয় ভাঙা কান্নায় সেদিন যেন কাঁদতে শুরু করে রাতে চড়ে বেড়ানো পাখি, রাস্তার পাহারাদার কুকুর ও ঝিঝি পোকা সহ সকল নিশাচর। তার পরিবারের জন্য এই রাত একটি ভয়াবহ রাত ছিল। মোঃ হোসেনের স্ত্রী ও তিনটি সন্তান, বিশেষ করে পাঁচ বছরের দুই কন্যা, লিমা ও সিমা, বাবার মৃত্যুর শোক সহ্য করতে পারছিলনা।

১৯ জুলাই সকাল ১১টায় মোহাম্মদপুর স্থানীয় মসজিদে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং একইদিন বাদ এশা তার দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ভোলায় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। সকলেই শোকাবহ পরিবেশে তাঁর বিদায় জানান।

মোঃ হোসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারে এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করতে শুরু করে। তাদের এখন নির্ভর করতে হচ্ছে মাসিক এবং বাৎসরিক অনুদানের উপর। শিশুদের লেখাপড়ার খরচ মেটানোর জন্যও সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

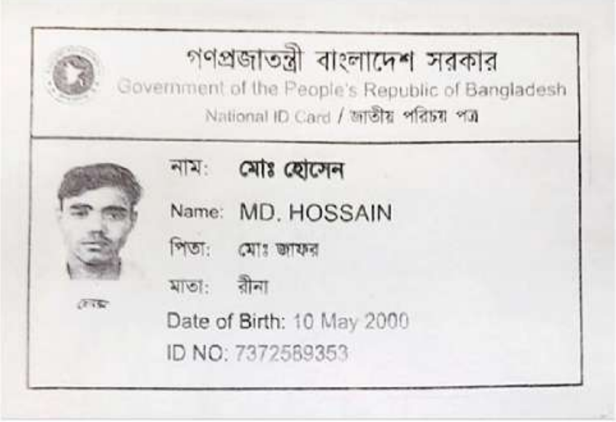
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ হোসেন
Name: MD. HOSSAIN
পিতা: মোঃ জাফর
মাতা: রীনা
Date of Birth: 10 May 2000
ID NO: 7372589353

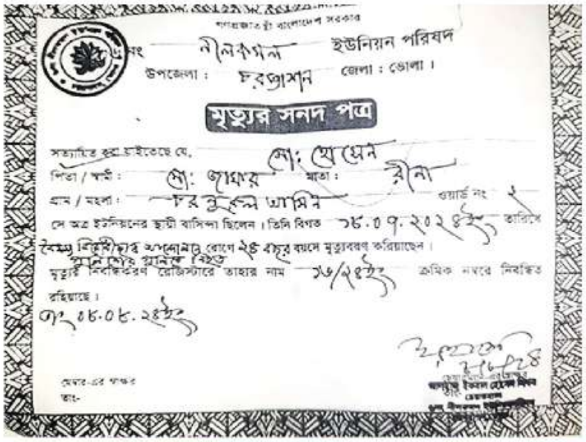

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং নীলকমল ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা : চরফ্যাশন জেলা : ভোলা।

মৃত্যুর সনদ পত্র

সত্যায়িত করা যাইতেছে যে, মো: হোসেন

পিতা / স্বামী : মো: জাফর মাতা : রীনা

গ্রাম / মহল্লা : চর কুকরি আমিন ওয়ার্ড নং : ২

সে অত্র ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বিগত ১৮.০৭.২০২৪ইং তারিখে

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিতে নিহত ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

মৃত্যু নিবন্ধিকরণ রেজিস্টারে তাহার নাম ১৬/২৪ইং ক্রমিক নম্বরে লিখিত রহিয়াছে।

তাং ০৪.০৮.২৪ইং

মেম্বার-এর স্বাক্ষর

তাং-

চেয়ারম্যান

ব্যাক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: হোসেন
পিতার নাম	: (মৃত) মো: জাফর
মাতার নাম	: রিনা
পরিবারের সদস্য	: ৫ জন
পেশা	: ট্রাক ড্রাইভার
মাসিক আয় ছিল	: ২০,০০০ টাকা
বর্তমান আয়	: নেই
স্থায়ী ও বতর্মনা ঠিকানা	: স্বপ্নধারা হাউজিং ইউনিয়নের বাছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

"অতি আদরের সন্তান কে কেড়ে নিলেন খুনিরা"

শহীদ মোহাম্মদ সবুজ

ক্রমিক : ০৮৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০৮৮

পরিচিতি

স্বৈরাচারী সরকার শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলনে যে সকল বীরেরা জীবন দিয়েছে তাদের মধ্যে শহীদ মো: সবুজ অন্যতম। জনাব মোহাম্মদ সবুজ দরিদ্র পরিবারের আদরের সন্তান। তিনি ভোলা জেলার লালমোহন গ্রামে ১৫ জুলাই ২০০৩ ইং জন্মগ্রহণ করেন। শহীদের পিতা জনাব কাউসার আহমেদ পেশায় একজন কৃষক। তার মাতা বিবি হাজেরা পেশায় গৃহিণী। মোট ছয় ভাই বোনের ছোট ছেলে তিনি। তার অমায়িক ব্যবহার যে কাউকেই আকৃষ্ট করতে বাধ্য। শহীদ সবুজ সিএনজি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ছেলে সবুজের জীবিকা নির্বাহের জন্য যখন কোন কর্ম ছিল না তখন পিতা ঋণ করে সিএনজি কিনে দেন। তিনি এই সিএনজি থেকে উপার্জনের টাকা দিয়েই সংসার চালাতেন এবং পিতা-মাতার সংসারের খরচও বহন করতেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বর্ণনা

হাইকোর্ট ২০১৮ সালে চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে। ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ পরিপত্র বাতিল করে রায় দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে আন্দোলনের সূচনা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে এবং বিভিন্ন ছুটি থাকার কারণে ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে। শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে লাগাতার আন্দোলন করতে থাকে। ১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে এবং ২৪ ঘন্টার আল্টিমেটাম প্রদান করে। এরপরেও কোন সমাধান হয় না।

১৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী বাহিনী, ভাড়া করা টোকাই লীগ শিক্ষার্থীদের উপরে নির্বিচারে হামলা চালায়। নারী শিক্ষার্থীদের উপরেও চালানো হয় নির্যাতন। এদিকে শহীদ আবু সাঈদকে ১৬ তারিখে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। যা সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে। যার ফলে দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে সারাদেশেই শিক্ষার্থীদের উপরে চরম নির্যাতন করা হয়। তাদের উপরে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, বুলেট নিক্ষেপ করা হয়। শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে নিজেদের স্থান দখল করে রাখে। পরবর্তীতে পুলিশ ও ছাত্র লীগের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের ক্যাম্পাস ও হল সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অবরোধে সারা দেশ অচল হয়ে যায়। সরকার মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার, নির্যাতন, গুম এবং সরাসরি গুলি চালাতে থাকে। কারফিউ এর মধ্যেই চলতে থাকে সারাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। দিনের পর দিন আহত এবং নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলতে থাকে। চার তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৮ শত শিক্ষার্থীকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে পঙ্গু বানিয়ে দেয়।

স্বৈরাচারী সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী, জঙ্গি ছাত্রলীগ-যুবলীগ এবং অন্যান্য পালিত বাহিনী ছাত্রদের উপরে সরাসরি এবং আকাশ থেকে হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে গুলি বর্ষণ করে। শিক্ষার্থীরা অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রদান করে। ৪ আগস্ট 'মার্চ ঢাকা কর্মসূচি' দেওয়া হয়। যার একমাত্র দফা হল অবৈধ স্বৈরাচারী হাসিনার পদত্যাগ। সারা দেশ থেকে দেশের কঠিন পরিস্থিতিতেও ছাত্রজনতা ছুটে আসে ঢাকায়। ৫ আগস্ট রাজপথে নেমে পড়ে লক্ষ কোটি ছাত্র-জনতা। ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

শহীদ সবুজ আগস্টের ৪ তারিখে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে মোহাম্মদপুর ছাত্রদের রাস্তায় নামতে দেখে তিনিও রাজপথে নেমে আসে। বিকেল চারটার দিকে বিজিবি কর্তৃক একটি গুলি এসে সবুজের চোখে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথে সবুজ দৌড়ে বাড়ির পাশে আসেন। এক পরিচিত সিএনজি চালক তাকে রিকশায় করে সিকদার মেডিকেলে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করা হয়। ঢাকা মেডিকেলের এসডিও বিভাগে ভর্তি করা হয় তাকে। ঢাকা মেডিকেলে তিন ঘন্টা লাইভ সাপোর্টে থাকার পর হঠাৎ নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। এ অবস্থায় এক পর্যায়ে তার মৃত্যু ঘটে। জনাব কাউসার আহমেদের প্রিয় সন্তান সবুজ এভাবেই শাহাদাত বরণ করেন। তার পরিবারে নেমে আসে শোকের বন্যা।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

'আমরা ৫ ভাই, সবুজ সবার ছোট ছিল। সবার আদরের ছিল। করো সাথে বেয়াদবি করত না সে অনেক ভালো ছিলো'-বড় ভাই মুনির হোসেন (৩৪)

'আমার ৫ ছেলে, সে সবার ছোট। আমি তাকে ১৭ মাস আগে বিয়ে করাইছি। একটা গরু বিক্রি করে বিয়ে করাইছি। ছেলে কামাই রুজি কিছুই ছিলো না। কোস্ট সমিতি থেকে ৭০ হাজার টাকার কিস্তি ও জমি কট লইয়া ২,০০,০০০ টাকা দিয়ে সিএনজি কিনে নেয়। পুতে আর পুতের বউ মোহাম্মদপুরে ভালো করে থাকতো। আল্লাহর কি মহিমা আমার পুতে সব কিছু রেখে এই আন্দোলনে

শরিক হইলে বিজিবির গুলিতে আমার পুত শহিদ হইলো। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন। দেশ সম্মানিত হইছে। আল্লাহ আমার এক পুত নিছে, বাংলাদেশের শত মায়ের বুক খালি হইছে আমার কোনো দুঃখ নাই' -বাবা কাউসার আহমেদ (৬৫)

'আমার ছোট ছেলে সবচেয়ে বেশি আদরের ছিলো। বড়গুলো অভাব দেখেছে, ছোট ছেলে কোন অভাব দেখে নাই। আমি ওরে সব হাজু দিয়ে বড় করেছি। আগে মারা যাওয়ার কথা বড় ছেলের। কিন্তু ছোট ছেলে আগে মারা গেছে। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন' -মা বিবি হাজেরা (৫৫)

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও কিছু করনীয়

শহীদের পিতা জনাব কাওসার আহমেদ একজন কৃষক। বয়সের ভারে সংসার চালানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন মাত্র ১৭ মাস পূর্বে। সবুজের বাবা তাকে কর্ম করার জন্য কিনেও দিয়েছিলেন একটি সিএনজি। যা দিয়ে তার পরিবার কষ্ট হলেও ভালোভাবেই দিন পার হচ্ছিল। তিনি তার সিএনজি থেকে প্রাপ্ত আয় পরিবারের ভরণপোষণ এবং পিতা-মাতাকে মাসিক কিছু হাত খরচ দিতেন। শহীদের পিতা-মাতা যে টিনের ঘরে থাকেন সেখানে কোন ভাবে বাস করাটাও কঠিন। জীর্ণশীর্ণ বাড়িতে পরিবারের সবাই একত্রে বসবাস করে। শহীদের কোন সন্তান না থাকলেও রয়েছেন তার স্ত্রী। জনাব সবুজ শহীদ হওয়ার পরে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তার পরিবার, পিতা-মাতা ও স্ত্রী।

কতিপয় করণীয়

শহীদ এর পিতা মাতার জন্য মাসিক সহযোগিতা প্রদান করা।

থাকার জন্য ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

তার স্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভালো কোন পরামর্শ এবং সেটি বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করা।

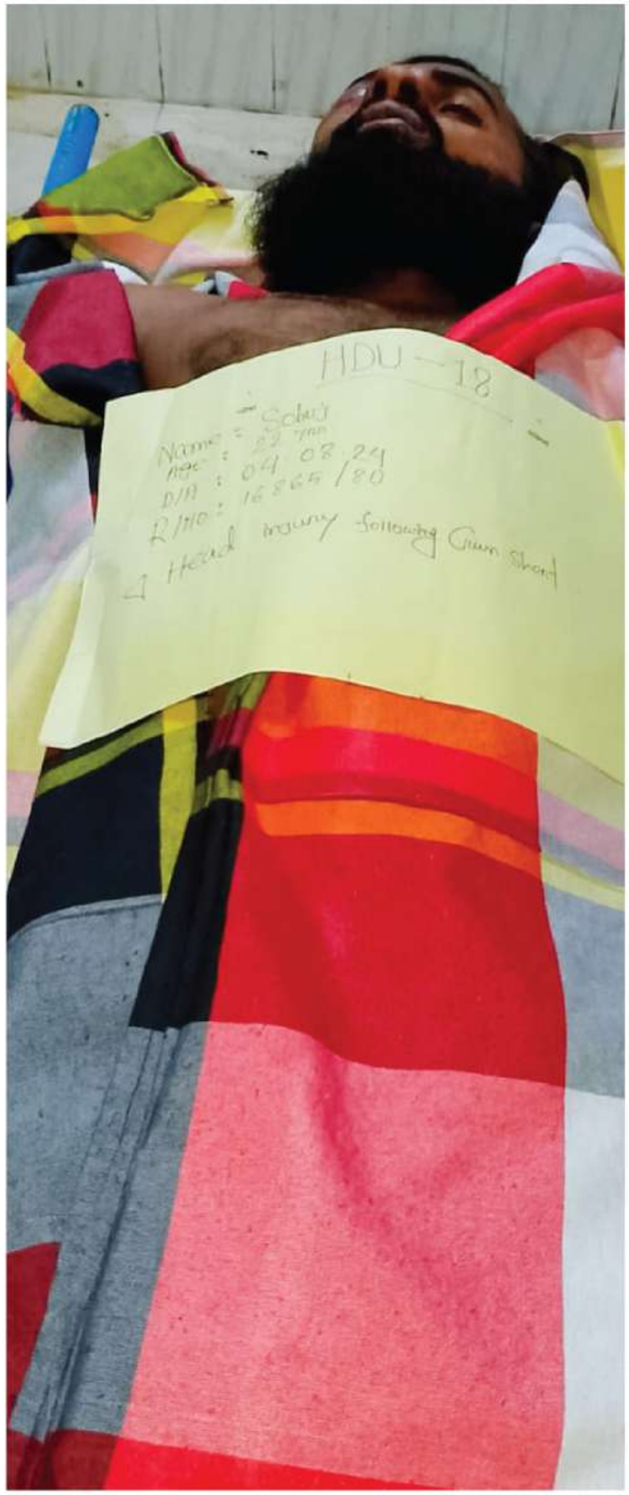

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: শহীদ মো: সবুজ
জন্মতারিখ	: ১৫/০৭/২০০৩
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: কাউসার আহমেদ, ৬৫ বছর, কৃষক
মায়ের নাম, পেশা	: বিবি হাজেরা, ৫৫ বছর, গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৮ জন
ছেলে মেয়ে	: নাই
ভাই বোন সংখ্যা	: ৬
	১. মোহাম্মদ হাফেজ মুন্সী, বয়স: ৪০, পেশা: সিএনজি ড্রাইভার
	২. মো: মনির হোসেন মুন্সী, বয়স: ৩৪, পেশা: পাইভেট কার ড্রাইভার
	৩. নূর হোসেন, বয়স : ৩০, পেশা: কাঁচামালের ব্যবসায়ী
	৪. শহীদ মুহাম্মদ সবুজ
	৫. সীমা, বয়স : ২৪, বিবাহিতা
	৬. আমেনা, বয়স : ২২, বিবাহিতা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কচুয়াখালী, ইউনিয়ন: চর উমেদ, থানা: লালমোহন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: মোহাম্মদপুর বসিলা রোড ময়ুর ভিলা এলাকায়
আঘাতকারী	: বিজিবি
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৪:০০ টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪ রাত ১১:০০টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: ভোলা জেলার নিজ গ্রামে।

শহীদ আক্তার হোসেন

ক্রমিক : ০৮৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০৮৯

হোসেন ও তার দুর্বিষহ পরিবার

প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বেড়ে ওঠা দরিদ্র পরিবারের সন্তান শহীদ মো: আকতার হোসেন। তিনি নিজ জেলা ভোলায় ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। পিতা মোহাম্মদ বজলুর রহমান এবং মাতা পারুলের অতি আদরের সন্তান পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকলেও পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। নিজে পড়াশুনা করার স্বপ্ন পূরণ করতে না পারলেও তার ছেলে এবং মেয়ের স্বপ্ন পূরণে তিনি কখনো পিছিয়ে ছিলেন না। তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে ইতোমধ্যে তাদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছেন। খেটে খাওয়া পরিশ্রমী রিকশাচালক আক্তার ছিলেন অত্যন্ত চরিত্র ও নিষ্ঠাবান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও মিশুক প্রকৃতির ছেলে। তার সাথে ছিল প্রতিবেশী ও স্বজনদের মানবিক সম্পর্ক। সর্বদা খোঁজখবর রাখতেন। রিকশা চালিয়ে উপার্জনের অর্থ দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়েছে তার। সেজন্য তিনি ঢাকায় তার স্ত্রী আকলিমাকে সঙ্গে নিয়ে এক রুমের একটি ছোট্ট রুমে ভাড়া থাকতেন। তার স্ত্রী মাঝে মধ্যেই অন্যের বাসায় গৃহস্থলির কাজ করে স্বামীকে সহযোগিতা করতেন।

শহীদ সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ২০১৪ সালের জুলাই মাস ব্যাপী এই আন্দোলন চলতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করলেও এক পর্যায়ে ছাত্র জনতা ও অভিভাবক সমাজ রাস্তায় নেমে পরে।

১৮ জুলাই রোজ বৃহস্পতিবারে শিক্ষার্থীরা সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি দেন। এদিকে ঢাকাসহ সারাদেশ অচল হয়ে পরে। সরকারি বাহিনী ছাত্র জনতার উপরে নির্মমভাবে নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। সরকার মানবতা বিরোধী অপরাধকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়।

১৯ জুলাই রোজ শুক্রবার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা কমপ্লিট শাটডাউন অর্থাৎ সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচিকে ঘিরে রাজধানীসহ সারাদেশে আওয়ামী পুলিশ বাহিনী ও সরকারের মদদপুষ্ট আওয়ামী লীগ যুবলীগের সন্ত্রাসীরা ছাত্র জনতার উপরে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ইতোমধ্যে সারাদেশে অসংখ্য ছাত্র নিহত হন এবং আহত হন শত শত। আক্তার হোসেন অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বেলা বারোটার সময় ছাত্র জনতার সাথে যুক্ত হন। তিনি বেড়িবাধ তিন রাস্তার মোড়ে অবস্থান নেন। সেসময় পুলিশ ও যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী সাধারণ ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে টিয়ারসেল, রাবার বুলেট ও গুলি ছুড়ছিল।

২টা ৩০ মিনিটের সময় চারপাশ থেকে পুলিশ ও যুবলীগের হামলায় আকতার হোসেন আটক হন। পুলিশ শুরুতে তাকে লাঠিপেটা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে এক ঘাতক পুলিশ কাছে এসে তার বুকে ঠাস ঠাস করে গুলি করতে থাকে। যার ফলে আক্তার হোসেন রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই কালো রাস্তাটি যেন রক্তিম হয়ে গেল। সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী এতটাই ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে কেউ তাকে উদ্ধার করতে সাহস করেনি। পরবর্তীতে নিথর দেহকে রেখে পুলিশ চলে গেলে সাধারণ জনতা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই তিনি মারা যান। পুলিশ বাহিনীর এই নিষ্ঠুরতা তার পিতা-মাতা, স্ত্রী ও স্বজনদের গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।

নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

'আক্তার হোসেন ভদ্র ও মিশুক ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিল। সব সময় আমাদের খোঁজখবর নিতেন। আমাকে খালা বলে ডাকতেন।' -জহুরা (৩৫), প্রতিবেশী,ঢাকা।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শহীদ আখতার হোসেন রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাতেন। ঢাকার মধ্যে হাওয়ায় তিনি মাসিক প্রায় বিশ হাজার টাকা উপার্জন করতেন। আক্তার হোসেনের স্ত্রীও গৃহস্থলীর কাজের মাধ্যমে তার স্বামীকে সহযোগিতা করতেন। শহীদ আক্তারের স্ত্রী আকলিমার পক্ষে তার দুটি সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়েছে।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: শহীদ আক্তার হোসেন
জন্মতারিখ	: ০১-০৮-১৯৮৯
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: মো বজলুর রহমান, ৬০, কৃষক
মায়ের নাম	: মৃত পারুল
পারিবারিক সদস্য	: চার জন
ছেলে মেয়ে	: ১ ছেলে ১ মেয়ে
১. নাম:লামিয়া,বয়স	: ১৩, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: হাফিজিয়া মাদ্রাসা
২. নাম: শাহাদাত, বয়স	: ৭, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: প্রাথমিক বিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পং গাইসা, ইউনিয়ন: গজাইরা, থানা: লালমোহন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: সোনা মিয়ার টেক, এলাকা: চাঁদ উদ্যান, থানা: মোহাম্মদপুর, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: বেরি বাধ তিন রাস্তার মোড
আঘাতকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই দুপুর ২: ৩০ মিনিট
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, দুপুর ২ টা ৩০ মিনিট বেরিবাধ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: ভোলা নিজ গ্রামে

“আমি শহীদ হয়ে যাব দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করব”

শহীদ মো: সাজিদুর রহমান ওমর

ক্রমিক : ০৯০

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯০

পরিচিতি

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বিজয়নগরের তেতৈয়া গ্রাম। যার নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য দেখে যে কেউ মুগ্ধ হয়। সবুজের চাদরে মুড়ানো অপরুপ গ্রামটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত। শহীদ মো: সাজিদুর রহমান ওমর ২০০৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি প্রত্যন্ত এই গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জনয়িতা জনাব শাহজাহান আলী পেশায় একজন পত্রিকা ব্যবসায়ী এবং মমতাময়ী মা পারভিন আক্তার গৃহকর্ত্রী। ছেলেবেলা থেকে পরিবারের অভাব-অনটন দেখে বড় হয় সাজিদ। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্য তিনি ছিলেন সবার ছোট। তখন থেকে পণ করেন বড় হলে পরিবারের আর্থিক সহায়ক হিসেবে মুখ্য ভুমিকা রাখবেন।

একপর্যায়ে সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য নিজের বসত ভিটা ছেড়ে রাজধানী শহরে আসেন শহীদের বাবা-মা। সাজিদকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ভর্তি করা হয় ডেমরা, জামেয়া আরাবিয়া আনোয়ারুর রহমানিয়া হাফেজি মাদরাসায়। অতঃপর কৃতিত্বের সাথে পবিত্র কোরআন মুখস্ত সম্পন্ন করেন তিনি। পরবর্তীতে মাদরাসা প্রাঙ্গণে হাজার-হাজার মানুষের উপস্থিতিতে শহীদ সাজিদুর রহমান ওমরকে পাগড়ী প্রদান করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ।

লেখাপড়ায় যিনি ছিলেন অদম্য তাঁকে থামানোর সাধ্য কার। যে কারনে আবারও নব উদ্যমে ডেমরা, সুন্না টেংরা দাখিল মাদরাসায় ভর্তি হন সাজিদ। লেখাপড়ায় ভাল থাকায় দ্রুত গুরুজনদের নজরে আসেন তিনি। একে একে দুই বোন মাহবুবা (২৭) ও মাহফুজা (২৫) আক্তারের বিয়ে সম্পন্ন হয়। দুটো মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান করতে ঋণে জর্জারিত হয়ে পড়েন জনাব শাহজাহান ওরফে সাজিদের পিতা। পরিবারে আর্থিক সংকুলান করতে না পেরে দুই ছেলে সাজিদ ও সিরাজের একসঙ্গে লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাঁকে। যেন দুশ্চিন্তায় ফেটে পড়েন তিনি।

-আব্বু তুমি টেনশন করো না, ভাইয়ার লেখাপড়ার টাকা আমি দেব।"

কর্মজীবন

সাজিদ তখন অষ্টম শ্রেণীর সামান্য একজন ছাত্র। পরিবারের অভাব আঁচ করতে পেরে অপার সম্ভাবনা দূরে ঠেলে সিদ্ধান্ত নেন ফ্রিল্যান্সিং শিখবেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখার পর জানতে পারলেন এই মুহূর্তে কোর্স ফি দেয়া পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা অবিচল থাকায় পুরনো বই কিনে পড়া শুরু করেন তিনি। বই পড়ে জানতে পারেন যে অনলাইন মিডিয়ায় ফ্রিল্যান্সিং কোর্সের ক্লাসসমূহ ফ্রি পাওয়া যায়। তবে ক্লাস করতে মেগাবাইটের প্রয়োজন হবে। সর্বপ্রথম বাবার মোবাইল নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ওয়াই-ফাই সংযোগ করেন। এরপর ইউটিউব দেখে নিজের প্রচেষ্টায় ফ্রিল্যান্সিং কোর্সের আদ্যপান্ত সম্পন্ন করে ফেলেন তিনি। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সাজিদের। ধীরে ধীরে আইটি বিষয়ে পারদর্শি হয়ে ওঠেন তিনি।

ফাইবার, আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়মিত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মিটিং করে অর্ডার পেতে থাকেন। ধীরে ধীরে বাবার সকল ঋণ পরিশোধ করেন। বড় ভাইয়ের কলেজের অ্যাডমিশন ফি দিয়ে বাবাকে বলেন-আব্বু তুমি টেনশন করো না, ভাইয়ার লেখাপড়ার টাকা আমি দেব"। জনাব শাহজাহান আলীর দুঃখ ঘুচতে থাকে। কিছুদিন পর পরিবারে আরও সুসংবাদ আসে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরির সুযোগ আসে সাজিদুর রহমান ওমরের।

-সবার আগে আম্মু খাবে।"

নতুন চাকরি

২০২১ সাল। সারাদেশে মহামারির কারণে এ সময় প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ হারিয়েছিল বহু মানুষ। উৎপাদন কমেছিল কৃষি ও শিল্প খাতে, সেবা খাতে বহু প্রতিষ্ঠান আয় হারিয়ে দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে সাজিদুর রহমান ওমরের যোগ্যতা দেখে চাকরিতে যোগদান করতে অনুরোধ জানায় 'নিউ ড্রিম অনলাইন' নামের একটি ব্রডব্যান্ড কোম্পানি। প্রথম মাসের বেতন হাতে পেয়ে মিষ্টি কিনে আনে সাজিদ। তাঁর বড় ভাই সিরাজ সবার আগে মিষ্টি খেতে প্যাকেট হাতে নেয়। কিন্তু সাজিদ জানায়- ভাইয়া, সবার আগে আম্মু খাবে। অতঃপর তাঁর উপার্জনে পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ হতে শুরু করে। মাত্র অল্প কয়েকদিনে ম্যানেজার পদে পদন্নতি লাভ করে শহীদ সাজিদুর রহমান ওমর।

-নিয়মিত চলে তাঁদের যাতায়াত।"

আন্দোলনে যোগদান

২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট মাসে সারাদেশে গনহত্যা চালায় খুনি হাসিনা সরকার। ছাত্ররা বিভিন্ন চাকরীর বৈষম্য কোটা নিয়ে প্রশ্ন

তোলে। পরবর্তীতে তাঁরা দফায় দফায় কয়েকবার সোচ্চার সভা ও মানব বন্ধন করে। তৎকালিন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী একটানা ১৬ বছর ক্ষমতায় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে কোটা বৃদ্ধি করে। যার প্রেক্ষিতে অনলাইন মিডিয়ায় নেটিজনদের কাছে চরম নিন্দিত শেখ হাসিনার সরকার। এমতাবস্থায় দলমত নির্বিশেষে সাধারণ ছাত্ররা বিক্ষিপ্ত হয়ে সারাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয়।

সে আন্দোলন প্রতিহত করতে খুনি হাসিনা তাঁর দলীয় ক্যাডার ও পালিত ঘাতক পুলিশ বাহিনী দিয়ে সারাদেশে অসংখ্য ছাত্রদেরকে হত্যা, গুম, গ্রেফতার, মামলা করে নির্যাতন চালায়। আন্দোলন সমন্বয়কদেরকে ডিবি প্রধান হারুনের নেতৃত্বে একদল সাদা পোশাক পরিহিত সন্ত্রাসী বাহিনী তুলে নিয়ে যায়। কয়েকশ ছাত্রকে গুম, হত্যা, নির্যাতন করার পরও আন্দোলন প্রতিহত করতে পারে না হাসিনা সরকার। ছাত্র জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলন ধীরেধীরে দীর্ঘায়িত হয়। সাজিদুর রহমান ওমর সে আন্দোলনে বন্ধুদেরকে নিয়ে শামিল হন। এভাবে কয়েকদিন নিয়মিত চলে তাঁদের যাতায়ত।

"বন্ধু সামনে না যাওয়া ভাল।"

যেভাবে তিনি শহীদ হন

সেদিন ছিল ২১ জলাই, ২০২৪। যোহরের নামাজ শেষ করে যাত্রাবাড়ির সাইনবোর্ড এলাকায় আন্দোলনে শামিল হন সাজিদ। চারিদিকে পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন তিনি। সাজিদের বাল্যবন্ধু হিমেল তাঁকে সামনে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু সাজিদ বারবার বলতে থাকে "আমি শহীদ হয়ে যাব।"

দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করব। একথা বলতে বলতে ঘাতক পুলিশের একটি গুলি সাজিদের মাথায় এসে আঘাত হানে। মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায় তাঁর বন্ধুরা। অবস্থার অবনতি ঘটলে তিন দিন আইসিইউতে ভর্তি থাকে সাজিদ। এবং সেখানেই গত ২৪ জুলাই, বুধবার দুপুর ১২:৪০-এ মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চিরদিনের জন্য বিদায় নেয় শহীদ সাজিদুর রহমান ওমর।

"শহীদের স্বপ্নে যে বিভোর, তাঁর আবার কিসের দুঃখ।"

অতঃপর শহীদ সাজিদের লাশ তাঁর নিজ গ্রাম তেতৈয়া, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছায়। চারিদিকে উৎসুক জনতা এই মহাবীরের লাশ দেখতে ভিড় জমায়। একনজর দেখতে দূরদূরান্ত থেকে লোক ছুটে আসে। জানাজায় যেন মানুষের ঢল নামে। গ্রাম জুড়ে চলে শোকের মাতম। সর্বশেষ পত্তন গ্রাম কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হয় শহীদ সাজিদুর রহমান ওমর।

"আজ সবকিছু যেন থেমে গিয়েছে"

পরিবারের আর্থিক দীনতা

সাজিদের বাবার পৈত্রিক কোন আবাদি জমি নেই। তবে স্বল্প পরিমাণে বসতী জমি রয়েছে। যেখান থেকে কোন ভাড়া আসে না। তাঁর চাচারা বর্তমানে সেখানে বসবাস করেন। তাই এখনই ভাগাভাগি করা সম্ভব নয়। সাজিদের বিদায়ে পরিবারটির অর্থনৈতিক অবস্থা যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে। সাজিদ মারা যাওয়ায় পরিবারে অবস্থা চরম শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তাঁর বড় ভাই এখনো ছাত্র। তিনি বোরহান উদ্দিন কলেজে অনার্স তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। তাঁর লেখাপড়ার খরচও সাজিদ চালাতেন। আজ সবকিছু যেন থেমে গিয়েছে। শহীদের মা বাত ও কোমর ব্যথায় জর্জারিত, বাবার হার্টে ব্লক। আর্থিক সংকটে তাঁরা চিকিৎসা করতে পারছেন না। কারণ- একমাত্র শহীদ সাজিদের উপার্জনে তাঁদের চিকিৎসা খরচ চলত।

"দেখা হলে সবার আগে সালাম দিয়ে কথা বলত"

প্রতিবেশীর অভিমত

আলহাজ্ব সৈয়দ রোকনউদ্দীন জানায় আমি তাঁর প্রতিবেশী। শহীদ সাজিদুর রহমান ওমর অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিল। দেখা হলে সবার আগে সালাম দিয়ে কথা বলত। কিছুদিন আগে আমি বাড়ি করেছি। আমার অবর্তমানে বাড়ির দেখাশোনা ও প্রয়োজনীয় মালামাল কিনতে সাহায্য করেছে সে।নিয়মিত তাঁকে ফজরের নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করতে দেখেছি। তাঁর আখলাক ছিল চমৎকার। চলাফেরায় কখনও দুর্ব্যবহার করতে দেখিনি। মহান আল্লাহ তাঁর জন্য যেন জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান ফয়সালা করেন। (আমিন)

"সাজিদের মা প্রতিনিয়ত বাতাসে সন্তানের গন্ধ অনুভব করেন। যেন একটু পর কলিংবেল বাজবে, অপেক্ষা করেন। রোজ কল্পনা করেন তাঁর সাজিদ বাইরে থেকে আসবে, আর চিৎকার করে মা বলে ডাকবে। চোখের কোণে জল গড়িয়ে পড়ে। এভাবেই কাটতে থাকে দিনের পর দিন।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোহাম্মদ সাজিদুর রহমান ওমর
Name: MOHD SAJIDUR RAHMAN OMOR
পিতা: মোঃ শাহজাহান
মাতা: মোছাঃ পারভীন আক্তার
Date of Birth: 03 Feb 2003
ID NO: 9586408065

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: সাজিদুর রহমান ওমর
পেশা	: আইটি ম্যানেজার, কোম্পানি: নিউ ড্রিম অনলাইন (বেসরকারি)
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০২ মার্চ, ২০০৩, ২১ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ২১ জুলাই, ২০২৪, বিকাল: ২.৩০ মিনিট
শাহাদাতের তারিখ	: ২৪ জুলাই ২০২৪, দুপুর ১২.৪০
স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: পত্তন গ্রাম কবরস্থান, তেতৈয়া, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: তেতৈয়া, বিজয়নগর, উপজেলা: বিজয়নগর থানা: বিজয় নগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পিতা	: মো: শাহজাহান (পত্রিকা ব্যবসায়ী)
মাতা	: মোসা: পারভীন আক্তার (গৃহিণী)
বাড়ী ঘর ও সম্পদের অবস্থা	: পৈত্রিক কোনো আবাদি জমি নেই, তবে স্বল্প পরিমাণে বসতী জমি রয়েছে

ভাই-বোনের বিবরণ

১. সিরাজুল ইসলাম, বয়স: ২৩, পেশা: ছাত্র, প্রতিষ্ঠান: বোরহান উদ্দীন কলেজ, শ্রেণী: ৩য় বর্ষ, সম্পর্ক: ভাই
২. মোসা: মাহাবুবা আক্তার, বয়স: ২৭, (বিবাহিতা) সম্পর্ক: বোন
৩) মাহফুজা আক্তার, বয়স: ২৭, (বিবাহিতা) সম্পর্ক: বোন

তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৮-০৮-২০২৪

“শহীদ জাহিদ হাসান ফুলের সাথেই যার মিতালী”

শহীদ মোঃ জাহিদ হোসান

ক্রমিক : ০৯১

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯১

পরিচিতি

১৮ বছরের একটি দুরন্ত কিশোর। তার এই বয়সটাই হচ্ছে দুরন্তপনার। তাকে দেখতে পাওয়ার কথা ছিল খেলার মাঠে, বন্ধু মহলের আড্ডায় কিংবা মোবাইল স্ক্রীনে বুঁদ হয়ে ভিডিও গেমস খেলতে। তবে জীবন সবার জন্য আনন্দময় নয়। বৈষম্য আর দুর্নীতির করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত মানুষের জীবন। গুটিকয়েক মানুষের জীবনের মান উন্নত হলেও তার ছোঁয়া লাগেনি সবার দ্বারে। তাই ১৮ বছর বয়সেই জাহিদকে সংসারের হাল ধরতে হয়। শহীদ মোঃ জাহিদ হাসান ছিল ফুলের দোকানের একজন কর্মচারি।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তাকেই টানতে হতো সংসারের ঘানি। ফুলের সাথেই ছিল তার বসবাস। রঙ বেরঙের ফুলের সাথে তার ছিল গভীর মিতালী। গ্রাহকদের পরিচয় করিয়ে দিতেন ফুলের সাথে। হাতে তুলে দিতেন ফুলের মালা, ফুলের বুকেট। কিন্তু ঘাতক আওয়ামী সরকারের ক্ষমতা লিপ্সার কাছে আকালেই ঝরে যেতে এই ফুলের মতো জাহিদ হাসানকে। শহীদ মোঃ জাহিদ হাসান (১৮) এর জন্ম ২০০৬ সালের জুন মাসের ৯ তারিখে রাজধানীর ঢাকা শহরে। পিতা জাহাঙ্গীর আলম (৪৬) ছিলেন বাসের টিকেট চেকার। কিন্তু কাজের অভাবে বেকারত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন তিনি। মা মোছাঃ রাহেলা বেগম (৪০) একজন গৃহিণী। বড়ভাই রাহাত (২৩) তিতুমীর কলেজে অনার্স অধ্যয়নরত। ছোটবোন মেশতা জাহান নুর ৩য় শ্রেণির ছাত্রী। অভাব অনটনের সংসারে মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মত ছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ঋণের ভার।

যেভাবে শহীদ হয় :

শুরুতে আন্দোলন সভা-সমাবেশের মধ্যে স্থির থাকলেও ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের পরোক্ষভাবে "রাজাকারের নাতি-পুতি" হিসেবে অভিহিত করেন, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ব্যঙ্গ করে

"তুমি কে? আমি কে?
রাজাকার, রাজাকার;
কে বলেছে? কে বলেছে?
স্বৈরাচার, স্বৈরাচার"
"চাইতে গেলাম অধিকার;
হয়ে গেলাম রাজাকার" স্লোগান দেয়।

১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মত পুরো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ জুলাই পর্যন্ত ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অনান্য সংগঠন, বিজিবি, পুলিশ দিয়ে দমন পীড়ন চলিয়ে এবং ইন্টারনেট বন্ধ করেও আন্দোলন থামাতে কার্যত ব্যর্থ হলে সরকার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করে এবং মাঠে সেনাবাহিনী নামায়।

১৯ জুলাই শুক্রবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘিরে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে উত্তরা, মিরপুর, রামপুরা, বাড্ডা, মহাখালী, বাসাবো, ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও, যাত্রাবাড়ী, বাসাবোসহ বিভিন্ন এলাকায়। মহাখালীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শহীদ হন জাহিদ হাসান, একজন মেধাবী ছাত্র এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মাত্র ১৮ বছর বয়সী এই তরুণের মৃত্যু তার পরিবারকে নিঃস্ব করে দেয় এবং জাতির বিবেককে নাড়া দেয়। জাহিদ হাসান একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন, যারা ঢাকায় প্রায় ১৫ বছর ধরে বসবাস করে আসছেন।

সেদিন বিকেল ৫টার দিকে মহাখালীতে চলমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বাধে। জাহিদ আন্দোলনের প্রথম সারিতে থেকে ন্যায়ের দাবি তুলেছিলেন, কিন্তু আন্দোলনের উত্তেজনার মুহূর্তে পুলিশ তাকে মাথায় গুলি করে। তিনি রাস্তায় পড়ে যান এবং পুলিশ ও ছাত্রলীগের সদস্যরা তাকে পায়ে পায়ে লাথি মারতে থাকে। যখন তারা নিশ্চিত হয় যে, জাহিদ আর বেঁচে নেই, তখন তারা তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আন্দোলনকারীরা তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে কাছাকাছি আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানকার ডাক্তাররা জানিয়ে দেন যে, হাসপাতালে আনার মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। পরে তেজগাঁও শিল্প এলাকা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কবরস্থানে তার জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

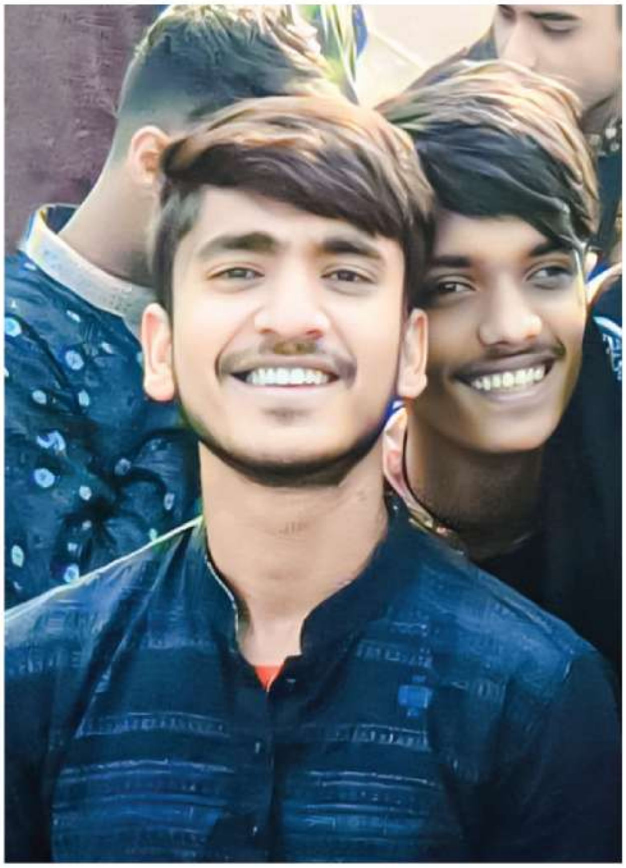

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ জাহিদ হোসেন
Name: MD. JAHID HOSSAN
পিতা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মাতা: মোসাঃ রাহেলা বেগম
Date of Birth: 09 Jun 2006
ID NO: 1522844396

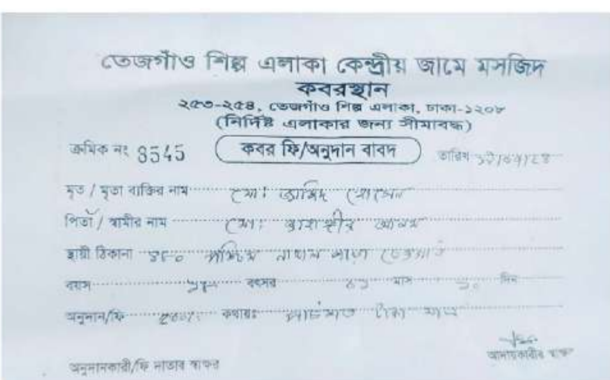

তেজগাঁও শিল্প এলাকা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ
কবরস্থান
২৫৩-২৫৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
(নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সীমাবদ্ধ)

ক্রমিক নং ৪545 | কবর ফি/অনুদান বাবদ | তারিখ [illegible]

মৃত / মৃতা ব্যক্তির নাম: মো: জাহিদ হোসেন
পিতা / স্বামীর নাম: মো: জাহাঙ্গীর আলম
স্থায়ী ঠিকানা: [illegible]
বয়স: [illegible] বৎসর [illegible] মাস [illegible] দিন
অনুদান/ফি: [illegible] কথায়: [illegible]

অনুদানকারী/ফি দাতার স্বাক্ষর
আদায়কারীর স্বাক্ষর

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: জাহিদ হোসান (১৮)
পেশা	: ফুলের দোকানের কর্মচারি
মাসিক আয়	: ২৫০০০ টাকা
পিতার নাম	: মো: জাহাঙ্গীর আলম (৪৬)
পেশা	: বেকার
মাতার নাম	: মোসা: রাহেলা বেগম (৪০)
পেশা	: গৃহিণী
পারিবারিক ঋণ	: ৩.৫ লক্ষ টাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও টিএসও-১২১৫, তেজগাঁও, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও টিএসও-১২১৫, তেজগাঁও, ঢাকা
বড় ভাই	: রাহাত(২৩)
পেশা	: শিক্ষার্থী, সরকারী তিতুমীর কলেজ
বোন	: মেশতা জাহান নুর (৮)
পেশা	: শিক্ষার্থী, ৩য় শ্রেণি
যেভাবে সহযোগিতা করা যায়	: ১) ঋণ পরিশোধ ২) পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ ৩) বাবা/বড়ভাই এর চাকরির ব্যবস্থা

মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি শহীদ জাকির হোসেন

শহীদ মো: জাকির হোসেন

ক্রমিক : ০৯২

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯২

পরিচিতি

জুলাই আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এই সর্বাত্মক আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ছিল অগ্রগামী ভূমিকায়। মালিক পক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছিল একটা জীবন মরণ সিদ্ধান্ত। এই আন্দোলন যে যার জায়গা থেকে উচ্চকিত করে প্রতিবাদের বজ্র ধ্বনি। শ্রমে ঘামে অর্থ উপার্জন করা মেহনতি মানুষেরা আওয়ামী দুঃশাসনে ছিল সমানভাবেই নিষ্পেষিত। তাদের মানবিক মর্যাদাটুকু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

অথচ একাত্তরের ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথতলা গ্রামে যে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পঠিত হয়, তাতে 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সার্বভৌম জনগণের প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার প্রকাশ করা হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললেও কখনোই তারা সেটা ধারণ করেনি। চেতনার ধোঁয়া তুলে তারা শোষণ করে গেছে। অন্যায়ভাবে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের হত্যা, জেল, জুলুম, হুলিয়া, ভয় ভীতি দেখিয়ে একটি মাফিয়া স্টেট গড়ে তোলে। যারপরনাই শ্রমিক শ্রেণিও ছিল আওয়ামী রেজিমের প্রতি ক্ষুব্ধ।

এমন একজন বিক্ষুব্ধ শহীদ ছিলেন শহীদ মোঃ জাকির হোসেন (২৯)। বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার কবাই গ্রামে ১৯৯৫ সালের ২ তারিখের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ ইউসুফ শিকদার একজন দিন মজুর। মাতা মাসুমা বেগম একজন গৃহিণী। বিয়ের পর বাবার সাথে মনোমালিন্য হলে সস্ত্রীক ঢাকায় এসে এমব্রয়ডারীর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তার এতিম দুই সন্তান বড়জন জাবেদ মাত্র ৪ বছর বয়সে এবং ছোট ছেলে আবদুলের বয়স ৭ মাস।

যেভাবে শহীদ হয়:

শহীদ জাকির হোসেন আদাবরের একজন সচেতন যুবক ছিলেন, যিনি সবসময় বৈষম্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা পোষণ করতেন। ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তার ভাবনা ছিল স্পষ্ট। বৈষম্যের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেখানে তিনি অন্যতম অগ্রভাগের সৈনিক ছিলেন। ৫ আগস্টের সেই আন্দোলনের দিন, জাকির তার মতাদর্শ এবং আদর্শিক অবস্থান নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। আদাবর থানা এলাকার সামনে হাজারো ছাত্র ও যুবকের সাথে তিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন।

সেদিন দুপুর থেকে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বিকেল গড়ানোর সাথে সাথে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে চায়, কিন্তু আন্দোলনকারীরা তাদের দাবি নিয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছিল। এই সময় পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। জাকির গুলিবিদ্ধ হন এবং সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আন্দোলনকারীরা জাকিরকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, তার জীবন আর রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জাকিরের লাশের সাথে আরও কিছু অজ্ঞাত লাশ ছিল, ফলে তা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে কিছুটা সময় লাগে। পরদিন, ৬ আগস্ট তার মরদেহ তার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায় এবং সেখানে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। জাকিরের এই মর্মান্তিক মৃত্যু তার পরিবারের জন্য বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে। তার মৃত্যুতে স্ত্রী ও দুই সন্তান এখন অসহায়। পরিবারটি ঢাকায় থাকলেও, নিয়মিত আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের জীবন কাটানো আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি তার পিতামাতার কাছেও আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন সেই সাহায্য আর নেই, ফলে পুরো পরিবারটাই সংকটে পড়েছে। শহীদ জাকিরের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যুব সমাজের জন্যও একটি বড় ধাক্কা।

তার গ্রামের বাড়িতে পাকা বাড়ি রয়েছে, কিন্তু পারিবারিক টানাপোড়েনের কারণে তিনি ঢাকায় স্ত্রী এবং দুই সন্তান নিয়ে বাস করতেন। শহীদের পিতা তার বিবাহিত স্ত্রীকে মেনে না নেওয়ায়, জাকির পরিবারসহ ঢাকায় বসবাস করতে বাধ্য হন। ঢাকায় থাকলেও, তিনি তার পিতামাতার প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন এবং প্রতি মাসে তাদের ২০০০ থেকে ৩০০০ টাকা পাঠাতেন। তার এই অকাল মৃত্যুতে পরিবারটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

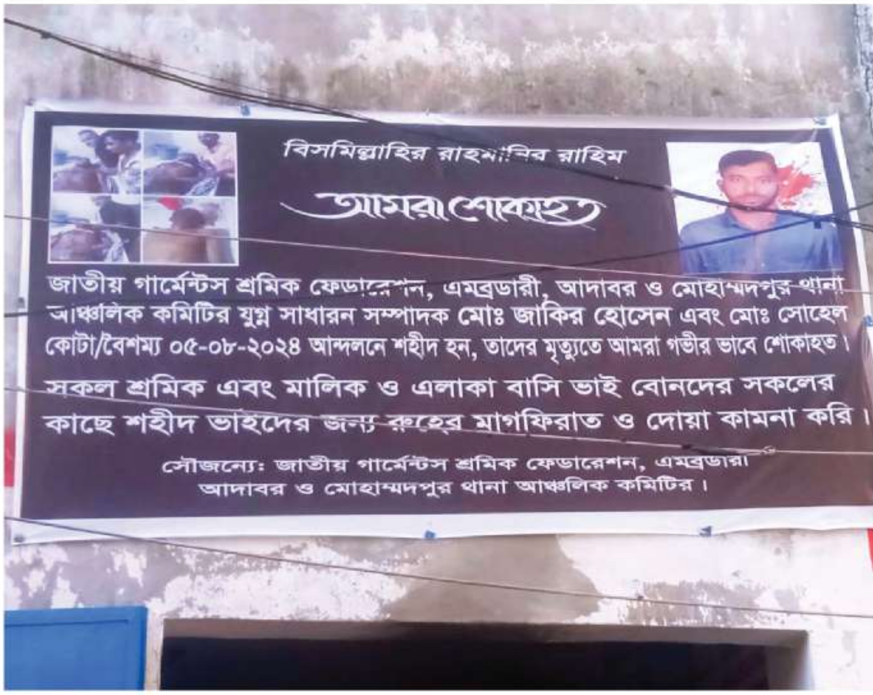

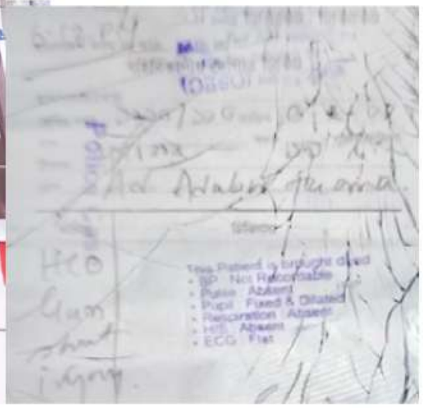

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: জাকির হোসেন (২৯)
শহীদের পেশা	: এমব্রয়ডারী শ্রমিক
পিতার নাম	: মো: ইউসুফ শিকদার (৬০)
পিতার পেশা	: দিনমজুর
মাতার নাম	: মাসুমা বেগম (৫০)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৪ জন
স্থায়ী ঠিকানা	: কবাই, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
	১ম সন্তান : মো: জাবেদ (০৪)
	২য় সন্তান : আবদুল (৭ মাস)

যেভাবে সহযোগিতা করা যায়

১) পরিবারের ভরণপোষণ

২) সন্তানদের পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ

৩) স্ত্রীর কর্মসংস্থান/ বিবাহ

“এই পানি লাগবে... পানি”

শাহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ

ক্রমিক : ০৯৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯৩

পরিচিতি

উত্তরায় গত ১৮ জুলাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। বাংলা একাডেমি 'আধুনিক বাংলা অভিধান বলছে মুগ্ধ একটি বিশেষণ যার মানে মোহগ্রস্ত, বশীভূত মন্ত্রমুগ্ধ, বিহ্বল, বিভোর গুণমুগ্ধ, মূঢ়। জানি না মুগ্ধর মা-বাবা বা আত্মীয়স্বজন যারা এমন নামকরণ করেছিলেন, তারা কি আসলেই জানতেন একদিন এই ছেলে বড় হয়ে পুরো দেশের মানুষের পাশাপাশি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের একই সুতোয় বাঁধবে। সবাইকে তার গুণে মুগ্ধ করবে। আমরা সবাই তার আচরণ ও কাজকর্ম মোহাবিষ্ট হয়ে দেখব। মুগ্ধ আমাদের সামনে থেকে সরে গেলেও আমরা বিভোর হয়ে থাকব তার স্মৃতিচারণায়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে ছেলেসন্তানের নাম বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়। আমরা নিশ্চিত, এখনকার প্রজন্মের একটা বিশাল অংশের ছেলেসন্তানের নাম রাখা হবে মুগ্ধ। ভবিষ্যতে কেউ যদি আমাকে তার সন্তানের নামকরণ করতে বলে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে আমি তার নাম দেব মুগ্ধ। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বহুল প্রচলিত–বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়। আমাদের মুগ্ধ নামে এবং ফলে দুভাবেই নিজেকে পরিচিতি দিয়ে গেছে। এখন আমরা মুগ্ধ নাম শুনলেই বুঝতে পারি কার কথা বলা হচ্ছে।

আশুরা ইসলামে একটি স্মরণীয় দিন। এদিন কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। 'কারবালা' ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রান্তর। কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম বিয়োগান্ত ঘটনা। কুফার সুপ্রাচীন নদী ফোরাতের কূলে কারবালার প্রান্তরে যখন হোসাইন (রা.)-এর কাফেলা অবস্থান করছিল, তখন তাদের পানির একমাত্র উৎস ছিল নদীটি। এই নদী থেকে পানি সংগ্রহ করতে গেলে দুগ্ধপোষ্য শিশু আলী আসগর এক ফোঁটা পানির জন্য সিমারের বাহিনীর তীরের আঘাতে শহীদ হন। সেদিন ফোরাতকূলে যে 'পানি পানি' বলে মাতম উঠেছিল, তা অবর্ণনীয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটা পর্যায়ে ছাত্ররা ১৭ জুলাই রাতে ১৮ জুলাইয়ের জন্য 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির ঘোষণা করে। তখন ঢাকা শহরের পাশাপাশি পুরো দেশ যেন কারবালার প্রান্তরে রূপ নেয়। এদিন নিরস্ত্র ছাত্রদেরকে প্রতিহত করতে সরকারি পেটোয়া বাহিনী এবং পুলিশের পাশাপাশি মাঠে নামানো হয় বিজিবি। তখন সারা দেশ রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিপরীতে ছাত্রদের একমাত্র সম্বল ছিল নিজেদের প্রাণ। তাই তারা বুকে বুক বেঁধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। তখন মুগ্ধ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আন্দোলনকারীদের জন্য নিয়ে আসে পানি। মুগ্ধ পানির কেস হাতে চিৎকার করছে আর বলছে, পানি লাগবে পানি। কাঁদানে গ্যাসের কারণে তাঁর চোখ খুলে রাখতে সমস্যা হচ্ছে।

গেঞ্জির হাতা দিয়ে চোখ মুছে সেটাকে খোলা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটা ভিডিও। এতে মুগ্ধকে দেখা যায়। আরও জানা যায়, এই ভিডিও ধারনের পনেরো মিনিট পর তিনি গুলিবিদ্ধ হন। কিছু সময় পর তিনি মারা যান। এই ভিডিও দেখে কাঁদেনি এমন মানুষ বিরল। মুগ্ধের ভিডিওটি দেখার মতো। কী উদ্যম নিয়ে ছেলেটা চিৎকার করে যাচ্ছে। মুখের অভিব্যক্তিতে কী দৃঢ়তা। পরনের টিশার্টটা পানিতে ভিজে গেছে। পায়ে বাসায় ব্যবহৃত স্যান্ডেল প্রমাণ দিচ্ছে মুগ্ধ কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই রাস্তায় তার ভাইবোনদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল নিজের অন্তরের তাগিদে।

মুগ্ধ শহীদ হওয়ার পর ১৩ আগস্ট সিএনএন একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম, 'বিক্ষোভকারীদের হাতে পানির বোতল তুলে দিচ্ছিলেন এই ছাত্র, কয়েক মিনিট পরই তিনি মারা যান'। সেখানে বলা হয়েছে, মুগ্ধর পুরো নাম মীর মাহফুজুর রহমান। তাঁর যমজ ভাই স্নিগ্ধ–মীর মাহবুবুর রহমান। রাজধানী ঢাকায় দুপুরের উত্তাপে বিশ্রাম নেওয়ার সময় একটি বুলেট তাঁর কপালে বিদ্ধ হয়েছিল। বন্ধু ও বিক্ষোভকারীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। শহীদ মুগ্ধের ভাই স্নিগ্ধ জানান, 'আমি শুধু তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আর আমি কেঁদেছিলাম।'

মুগ্ধ গণিতে স্নাতক ছিলেন। এরপর ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর (এমবিএ) শ্রেণিতে পড়ছিলেন, আর তাঁর যমজ স্নিগ্ধ আইনে স্নাতক। এই দুই যমজ ইতালিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। মোটরবাইকে ইউরোপ ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা ছিল তাঁদের। ভ্রমণের জন্য টাকা জমাতেন তাঁরা। দুই ভাই অনলাইন ফ্রিল্যান্সার হাব ফাইবারে সোশ্যাল মিডিয়া বিপণনের কাজ করতেন।

স্নিগ্ধ বলেন, 'সে শুধু আমার ভাই ছিল না, আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল। আমার শরীরের একটি অঙ্গ ছিল। আমরা একসঙ্গে সবকিছু করতাম।' তাঁদের বড় ভাই দীপ্ত, যাঁর পুরো নাম মীর মাহমুদুর রহমান। দুই ভাই মুগ্ধের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্রটি রেখে দিয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় এটি তাঁর গলায় ছিল। মুগ্ধের বিচ্ছুরিত রক্ত সেই অন্ধকার সময়ে দিনের প্রতীক হিসেবে পরিচয়পত্রটিতে শুকিয়ে গিয়েছিল। পরিচয়পত্রের ফিতাটি তাঁর ভাইয়েরা রেখে দিয়েছেন। এখন, প্রতিবাদ আন্দোলনে মুগ্ধ যে প্রভাব ফেলেছেন, তার থেকে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করছেন দুই ভাই দীপ্ত ও স্নিগ্ধ। স্নিগ্ধ বলেন, 'তার (মুগ্ধ) কারণে মানুষ প্রতিবাদ করার শক্তি পেয়েছে। সে সব সময় বলত, "আমি আমার মা-বাবাকে একদিন গর্বিত করব।"

এরপর আমরা আমাদের কথায়, কাজে, পড়ায়, লেখায় যতবারই মুগ্ধ শব্দটা ব্যবহার করব, ততবারই আমাদের সামনে ভেসে উঠবে মুগ্ধর মুখটা। আমরা ততবারই মুগ্ধ হব মুগ্ধর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে। আরও কত তাজা প্রাণ যে অকালে শহীদ হয়েছে, তাদের সবার পরিচয় জানা যায়নি। আসলে যারা শহীদ হন, তারা তো নিজেদের জীবন পরের তরে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যই মৃত্যুর সামনে বুক পেতে দেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হলো বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থী দের একটি সংগঠন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং এটি কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। ২০২৪ সালের ১ জুলাই সংগঠনটি সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টির পরপরই আন্দোলন সফল করার জন্য ৮ জুলাই সংগঠনটি ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি ঘোষণা করে যার মধ্যে ২৩ জন সমন্বয়ক ও ৪২ জন সহ- সমন্বয়ক ছিলেন। ক্রমান্বয়ে আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পর ৩ আগস্ট সংগঠনটি দেশে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক দল

গঠন করে যার মধ্যে ১৪৯ জনে সমন্বয়ক ও ১০৯ জন সহ সমন্বয়ক ছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাধিক সমন্বয়ককে এই সংগঠনের নেতৃত্বে দেখা গেছে। যাদের হাত ধরে চলমান আন্দোলন ক্ষোভে ফেটে ওঠে। ২০২৪ এর জুন মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্ট বাতিলকৃত কোটা পুনরায় বহাল করে। যার ফলে পুনরায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীন ভূখন্ডের প্রতিটি গ্রাম,থানা, জেলা ও এমনকি বিভাগীয় পর্যায়েও।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকার শাহবাগে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের স্লোগান ছিল 'কোটা না মেধা? মেধা! মেধা! 'ভেঙ্গে ফেল কোটার ঐ শিকল' -এই ধরনের বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হতে থাকে পুরো ঢাকা শহর। শুরুতে আন্দোলন সভা সমাবেশের মধ্যে স্থির থাকলেও ১৪ জুলাই ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের কটাক্ষ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে রাজাকারের নাতি-পুতি অভিহিত করেন। স্বৈরশাসক হাসিনার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রজনতা ব্যঙ্গ করে তুমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার এবং চাইতে গেলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার- স্লোগান দেয়।

এর পরেরদিন ১৫ জুলাই আওয়ামীলীগ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনেন। একই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকি স্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়। একই সাথে পুলিশও লাঠি, রাবার বুলেট দিয়ে হামলা করে। প্রতিবাদে নিরীহ নিরস্ত্র আন্দোলনকারীরাও তাদের দিকে ইটের টুকরা ছুঁড়ে ও উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে।

এসব হামলায় ১৬ জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মত পুরো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ জুলাই পর্যন্ত সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও মানুষ খেকো আওয়ামীলীগের অনান্য তাবেদার সংগঠন, সশস্ত্র ঘাতক বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ দিয়ে এবং ইন্টারনেট বন্ধ করেও আন্দোলন থামাতে কার্যত ব্যর্থ হলে স্বৈরাচারী সরকার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করে এবং মাঠে নামায় সেনাবাহিনী।

এইসব ঘটনায় প্রায় ২১ হাজার শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারী আহত হওয়ার পাশাপাশি ৬৭৩ জনের অধিক নিহত হন এবং পুলিশ ৫০০ মামলা দায়ের করে ১১,০০০-এর অধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে ২১ জুলাই বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করে ও সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। ২২ জুলাই এই বিষয়ে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে।

শহীদ পরিচিত ও নিকট আত্নীয় এবং বন্ধুদের অনুভূতি মৃত্যুর ১৫ মিনিট আগেও ছাত্রদের ডেকে ডেকে পানি দিচ্ছিলেন মুগ্ধ।

গত ১৮ জুলাই রাজধানীর উত্তরায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান মুগ্ধ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। ভালো খেলোয়াড়, গায়ক, সংগঠক হিসেবে গত চার বছর ধরে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন ক্যাম্পাসে। গণিতে স্নাতক শেষ করে গত মার্চে ঢাকায় যান। এমবিএতে ভর্তি হন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে। মৃত্যুর মাত্র ১৫ মিনিট আগে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সড়কে ছোটাছুটি করছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে হাতে পানি ভর্তি বাক্স ও বিস্কুট নিয়ে ছুটছেন মুগ্ধ। ছাত্রদের ডেকে ডেকে বলছেন, 'পানি লাগবে কারও, পানি?' ভিডিওতে দেখা গেল, অনেকেই তার কাছ থেকে পানি পান করছেন। কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁজাল ধোঁয়ায় বেশ কয়েকবার চোখ মুছতে দেখা গেল মুগ্ধকে।

ঐদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুগ্ধর সঙ্গে থাকা এক বন্ধু বলেন, "কারও বিপদ দেখলে সব সময় ছুটে যেতেন মুগ্ধ। উত্তরায় ছাত্রদের ওপর হামলা হচ্ছে শুনে অন্য বন্ধুদের নিয়ে ছুটে যান তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ঐদিন অনেককেই হাসপাতালে নিয়ে গেছি আমি ও মুগ্ধ। বিকাল ৬ টার দিকে ছাত্রদের মাঝে

পানি ও বিস্কুট দিয়ে সড়ক ডিভাইডারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ রাজউক কমার্শিয়ালের সামনে থেকে পুলিশ গুলি করতে করতে এগিয়ে এলে সবার সঙ্গে আমরাও দৌড় দিই। হঠাৎ দেখি গুলি লাগায় সড়কে পড়ে গেছে মুগ্ধ। তার কপালে গুলি লেগে ডান কানের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।"

মুগ্ধর গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। জন্ম ১৯৯৮ সালে উত্তরায়। দাফন হয়েছে এখানেই। উত্তরার ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি স্কুলে প্রাথমিক এবং উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। ২০১৯ সালে ভর্তি হন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ফুটবল খেলোয়াড়, গায়ক, গিটারিস্ট ও সংগঠক হিসেবে সুনাম ছিল তার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান শিক্ষা সমাপনী-২০২৩-এর কনভেনর ছিলেন। ছিলেন স্কাউট গ্রুপের ইউনিট লিডার। ছোটবেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব মুগ্ধ।

তিনি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কাউট গ্রুপের একজন রোভার স্কাউট এবং ইউনিট লিডার ছিলেন। ২০১৯ সালে বনানী অগ্নিকাণ্ডের সময় উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ ও সাহসী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে 'ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন 'ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলেন।

তিন ভাইয়ের মধ্যে মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ ছিলেন যমজ। বড় ভাই মীর মাহমুদুর রহমান দীপ্ত বলেন, পরিবারের সবার আদরের ছিল মুগ্ধ। ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত সে। এমবিএর পাশাপাশি দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য IELTS করছিল। কিন্তু সব কিছু এভাবে শেষ হয়ে যাবে, কে জানতো!

তিনি আরও বলেন, আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে মায়ের সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতো মুগ্ধ। সবসময় মাকে দেখেশুনে রাখতো। ফ্রিল্যান্সিং করে নিজের খরচ চালাত। মা এখনও কাঁদছেন। বাবা চুপচাপ হয়ে গেছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শেখ আবদুস সামাদ বলেন, অসাধারণ ছেলে ছিল মুগ্ধ। কারও সঙ্গে কখনও গোলমাল, বেয়াদবি করতে শুনিনি। ক্লাসে ওকে বকা দিলে এমনভাবে হেসে দিত, পরে ওকে আর কিছু বলতে পারতাম না। ক্যাম্পাসে মুগ্ধর জুনিয়র মুহিব্বুল্লাহ বলেন, যে কোনো আয়োজনে সামনের সারিতে থাকতেন মুগ্ধ ভাই। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আগে আন্দোলনে আমরা সক্রিয় ছিলাম।

ফেসবুকে প্রোফাইল ছবির ক্যাপশনে মুগ্ধ যা লিখেছিলেন, তার বাংলা অনেকটা এমন–জীবন অর্থবহ হোক, দীর্ঘ নয়। সত্যিই এক অর্থবহ জীবনযাপন করে গেলেন মুগ্ধ।

স্নিগ্ধকে ফেলে গেলেন মুগ্ধ-চলমান আন্দোলনের শুরুর দিকে মুগ্ধর পরিবার ছুটি কাটাতে যায় কক্সবাজারে। কিন্তু, মুগ্ধ ও তার যমজ ভাই স্নিগ্ধ থেকে যান ঢাকাতেই।

মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ একসঙ্গেই স্কুলে গিয়েছেন। তাদের বন্ধুও ছিল অভিন্ন। মুগ্ধর মৃত্যুর পর থেকেই ট্রমায় আছেন স্নিগ্ধ। দ্য ডেইলি স্টার থেকে কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্লিজ, আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন।'

তাদের বড় ভাই দীপ্ত বলেন, 'স্নিগ্ধ একেবারেই নিস্তেজ হয়ে গেছে।' পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নিগ্ধই প্রথম দেখেছিলেন মুগ্ধর মরদেহ।

দীপ্ত বলেন, 'স্নিগ্ধর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি স্মৃতি মুগ্ধর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সে শুধু ভাই হারায়নি, হারিয়েছে নিজের জীবনের একটা অংশ।'

দীপ্ত জানান, ১৮ জুলাই সকালে পরিবার নিয়ে কক্সবাজারে যান তারা। 'আমার মা কখনো সৈকত দেখেননি। গত বছর মুগ্ধ বাবা-মাকে প্রথমবারের মতো সুন্দরবনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই, এবার আমি বাবা-মাকে কক্সবাজারে নিয়ে যাই,' বলেন তিনি। কিন্তু তাদের সঙ্গী হননি মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ। দীপ্ত জানান, তারা দুটি কারণে যেতে চাননি। একটি হচ্ছে, ২০ জুলাই বন্ধুদের সঙ্গে টাঙ্গুয়ার হাওরে যাওয়ার পরিকল্পনা এবং অপরটি, কোটা সংস্কার

আন্দোলনে অংশ নেওয়া। ১৮ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মুগ্ধর মৃত্যুর খবর পান দীপ্ত। সেদিনই ঢাকায় ফেরার চেষ্টা করলেও ফ্লাইট না থাকায় পারেননি।

চলমান অস্থিরতার মাঝে সড়কপথে সময় বেশি লাগায় ১৯ জুলাই সকালের ফ্লাইটে ঢাকায় ফেরেন তারা। দীপ্ত আরও বলছিলেন, 'মুগ্ধর মৃত্যুর খবর কীভাবে যে মাকে বলব বুঝতে পারছিলাম না। মা হার্টের রোগী। এটা নিয়েও চিন্তা ছিল।' প্রথমে তিনি মা-বাবাকে জানান, মুগ্ধ সামান্য আহত হয়েছেন। পরে জানান তিনি হাসপাতালে আছেন কিন্তু অবস্থা সংকটাপন্ন। মুগ্ধর মৃত্যুর খবর জানার পর ভেঙে পড়েন তাদের মা। এখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হননি। দীপ্ত বলেন, 'আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে মুগ্ধ মায়ের সবচেয়ে কাছের ছিল। তার মৃত্যুতে মায়ের পৃথিবীটাই যেন উজাড় হয়ে গেছে।'

মৃত্যুর সময় পাশে ছিলেন যে বন্ধু, মুগ্ধ যখন গুলিবিদ্ধ হন, তখন পাশে ছিলেন তার বন্ধু জাকিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'বুলেট মুগ্ধর কপালে লেগে মাথার ডান দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। আমাদের চোখের সামনে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে।' 'মুগ্ধ সবাইকে পানি খাওয়াচ্ছিল। আমাদের কারো কাছে কোনো ধরনের অস্ত্র বা লাঠিসোটাও ছিল না। তারপরও ওরা আমার বন্ধুকে এভাবে গুলি করে মারলো? এই দৃশ্য আমি কীভাবে ভুলব?', -বলেন জাকিরুল।

ঘটনা সংক্রান্ত বর্ণনা

একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী যে কারণে শহীদ হলেন- কথায় আছে এদেশের দিনমজুর, কৃষক,জেলে এমনকি সিএনজি চালক গণমানুষের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী। রাজপথের বহু ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষীও তারা। আর তাদেরই অন্যতম একজন ছিলেন শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। দেশ যখন রসাতলের অতল গহ্বরের দিকে ধাবমান; রাষ্ট্র যখন অদক্ষ, অসৎ, দুর্নীতিবাজ, লুটেরা চালক দ্বারা নেক্কারজনকভাবে চালিত; বাজার যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির অত্যাচারে জর্জরিত; জাতি যখন অভিশপ্ত স্বৈরাচারের নির্মম নৈরাজ্যে আক্রান্ত; ক্ষতবিক্ষত, এদেশের আপামর জনতা তখন নিজ নিজ জায়গায় প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত, ব্যথিত এবং প্রচন্ডভাবে হতাশায় নিমজ্জিত।

এই হতাশা থেকে আশার আলো নিয়ে; পরাধীনতা থেকে মুক্তির ডাক নিয়ে; বৈষম্যতা থেকে অধিকারের বার্তা নিয়ে জাতির সামনে এসে প্রথমেই শান্ত-শিষ্টভাবে সরকারের কাছে নিজেদের দাবি তুলে ধরলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সাধারণ শিক্ষার্থী। তাদের দাবি, মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হোক। সরকার ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিবেচনা করা হোক। ছাত্রদের এই হক কথা; ন্যায্য দাবিকেও হেয় প্রতিপন্ন করলো নাটকবাজ খ্যাত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার।

২০১৮ সালেও এই দাবি নিয়ে রাজপথে নেমেছিল সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তখনো চোর-ডাকাতের এই সরকার থামিয়ে দিয়েছিলো শিক্ষার্থীদের। এক সাগর কষ্ট বুকে নিয়ে তারা ফিরে গিয়েছিল রাজপথ থেকে। আসলেই কি তাই? না। সেটা ছিলো মূলত উদ্যোম গতিতে ফেরার জন্য কিছুটা পিছু হটা। তাইতো ২০১৮ সালের কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনই নাম পরিবর্তন করে ২০২৪ সালে ফিরে এসেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়ে। এবারো তারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের দাবি পেশ করেছে। অথচ স্বৈরাচার সরকারের নানাবিধ টিটকারি, হঠকারিতা আর নির্লজ্জ হাস্যরসিকতা এই স্বাভাবিক দাবীকে এক বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ নিতে বাধ্য করছে যেন। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, মিডিয়ায় বিবৃতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখনী এবং সরকারের সাথে আলোচনার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু না; খুনি সরকার শিক্ষার্থীদের এমন প্রচেষ্টাকেও কোনরকম গায়ে-ই মাখলো না। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলো তাদের। তারা শিক্ষার্থীদের সুশৃংখল মানববন্ধনে করলো লাঠিচার্জ! শান্তিপূর্ণ সমাবেশে মারলো টিয়ারসেল, রাবার বুলেট! শোকের মিছিলে করলো গুলি! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে-হোস্টেলে, বাসা - বাড়িতে গিয়ে শুরু করলো তল্লাশির নামে নৈরাজ্য! মধ্যরাতে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘুম, খুন, হত্যা! পথে-ঘাটে হামলা-মামলা গণগ্রেপ্তার! শিক্ষার্থীদের হাতে পরানো হলো হাতকড়া! কোমরে বাঁধলো রশি! পায়ে পরালো ডান্ডাবেড়ি! প্রকাশ্যে ঘোষণা করে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার বাহিনীর পাশাপাশি রাজপথে নামালো পেটোয়া গুন্ডা চরিত্রহীন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, ঘাতক যুবলীগ ও আওয়ামীলীগ।

এই দেশ আমার বাবার দেশ। এটা আমাদের ফিরে পাওয়া জমিদারি। তোরা সব রাজাকারের নাতিপুতি। এমনই ছিল যেন খুনি সরকারের মনোভাব। যার কারণেই কোটা বিরোধী বা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হয়ে যায় দেশের সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা

রাজপথে নেমে আসে । তাদের সোজা কথা, দাবি আদায় না করে তারা ঘরে ফিরবে না। শুরু হলো পরীক্ষা বয়কট, ক্লাস বয়কট আর অবৈধ সরকারের সাথে অসহযোগিতা।

একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রের হত্যাকারী সরকার দেশব্যাপী সাধারণ শিক্ষার্থীদের এরকম গণজাগরণ দেখেও কেবলমাত্র নিজেদের অহমিকা, একঘেয়েমিতা আর ক্ষমতার বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্যই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে দিল। যেভাবে পারছে সেভাবেই তারা ছাত্র হত্যা করতে লাগলো। পিটিয়ে, কুপিয়ে, জখম করে, গুলি করে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে লাগলো ছাত্রত্বের আজীবন কলঙ্ক গুন্ডা ছাত্রলীগ। শুধু তাই নয়, দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে রাজপথে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, ক্যাম্পাসে অমানবিক নির্যাতনে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে হত্যা করে আবার সেই লাশের উপরই নৃত্য করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠতেও কোনরকম দ্বিধা করে না তারা।

শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ছিলেন একজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তিনি একজন মুক্তপেশাজীবী বা ফ্রিল্যান্সার হিসেবেও কাজ করতেন। আন্দোলনের সময় খাবার পানি এবং বিস্কুট বিতরণ করতে গিয়ে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। মুগ্ধর মৃত্যু গোটা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে।" ভাই পানি লাগবে কারও, পানি" মুগ্ধের এ কথাটি এখনো সারা বাংলাদেশকে কাঁদায়।

তিনি ১৮ জুলাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন। তার অবস্থান ছিল উত্তরা আজমপুর রাজউক কমার্শিয়াল মার্কেটের পাশে। হাতে ছিল পানি ও বিস্কুট। বন্ধু জাকিরুল জানায়, মুগ্ধ সবাইকে পানি খাওয়াচ্ছিল। আমাদের কাছে কোন অস্ত্র ছিলোনা। ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল। কিন্তু পুলিশের টিয়ারশেল ও গুলি অব্যাহত ছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে মুগ্ধর কপালে গুলি লাগে। গুলিটি ডানপাশের কানদিয়ে বের হয়ে যায়। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে যখন লুটিয়ে পড়ছিলেন তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। মুগ্ধ'র রক্তে যখন রাস্তা ভেসে যাচ্ছিল, তখন আমরা বহু সংগ্রাম করেও সাথে সাথে তাকে

হাসপাতালে নিতে পারিনি। অসংখ্য পুলিশ অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছিলো। কিছুক্ষণ পর রিকশায় করে মুগ্ধকে নিকটস্থ ক্রিসেন্ট হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার মৃত্যুর খবর যখন পাওয়া যায় ঐ মুহূর্তে তার পরিবার কক্সবাজারে অবস্থান করছিলেন। পরদিন জানাজা শেষে তার লাশ ব্রাক্ষনবাড়িয়া নিজ জেলায় দাফন করা হয়।

প্রস্তাবনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ডিসিপ্লিনের বিভাগ ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর স্মরণে উত্থাপিত প্রস্তাবনা সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে পূরণের জন্য জোর দাবি রইল।

১৮ জুলাই শহীদ মীর মুগ্ধ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও যথাযথ মর্যাদায় পালন করা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে রাষ্ট্রের কাছে শহীদ মীর মুগ্ধ হত্যার বিচার চেয়ে আবেদন এবং ঐ আন্দোলনে সব শহীদের স্মরণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে জুলাই গণহত্যা নামে একটি স্মৃতি কর্নার

* মুগ্ধর স্মৃতির উদ্দেশ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক আবাসিক হল, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে "মুগ্ধ পানি সরবরাহ কর্নার" করা। পাশাপাশি দেশের প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে "পানি লাগবে পানি"–এই স্লোগান লিখে মুগ্ধ কর্নার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

মুগ্ধর এই মুগ্ধতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। 'মুগ্ধ-আবু সাঈদরা নিজেদের জীবন দিয়ে দেশকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। মুগ্ধদের আত্মত্যাগ দেশকে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে। এখন তাদের স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নতুন স্বাধীনতার পর যেভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, দেশ সংস্কার এবং বন্যার পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে।'

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ
পেশা	: ছাত্র
জন্ম	: ০৯-০৯-১৯৯৮
জন্মস্থান	: উত্তরা, ঢাকা
পেশাগত পরিচয় কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি)
পিতা	: মীর মোস্তাফিজুর রহমান
মাতা	: শাহানা চৌধুরী
ঠিকানা	: ৩৫/৯ ডি, ৫ নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, হাউজ বিল্ডিং
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: রাত ৮.৩০মিনিট, ১৯ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৮টা ৩০ মিনিট বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাউজবিল্ডিং, উত্তরা, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: কামার পাড়া, ঢাকা

শহীদ নাসিব হাসান রিয়ান

ক্রমিক : ০৯৪
আইডি : ঢাকা সিটি ০৯৪

প্রারম্ভিক কথা

নাসিব হাসান রিয়ানসহ বাংলাদেশের সকল শহীদরা দেশপ্রেম, দান ও গৌরবের এক অক্ষয় উৎস এবং অগ্রগতি, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের জ্বালানী এবং তাদের সুগন্ধিময় জীবন আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের সাহস যোগাবে এবং আমাদের ঠেলে দেবে স্বপ্নপূরণের দিকে। মহামান্য শহীদদের পরিবার, পিতা ও মাতা যারা তাদের সন্তানদের মধ্যে দেশপ্রেম ও আনুগত্যের অর্থ জাগিয়েছেন এবং যারা সাহসের সাথে তাদের বিচ্ছেদের সাথে ধৈর্য ধরেছিলেন, ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রাথমিক পরিচিত

নাসিব হাসান রিয়ান ঢাকার স্থানীয় এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ঢাকার শেরে বাংলা নগরের বিসমিল্লাহ ইউনিয়নের কৃষি মন্ত্রণালয়ের চাকরিজীবী গোলাম রাজ্জাক ও গৃহিণী সামী আক্তার দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাসিব হাসান রিয়ান। ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জন্ম নিয়ে আবার ২০২৪ সালে ৫ আগস্ট নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মৃত্যুবরণ করেন। মাঝখানে দীর্ঘ ১৭ বছর স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যায় অবিশ্বাস আর দুর্নীতির দুর্গন্ধযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে সময় কাটিয়ে গেলেন। স্বপ্ন ছিল দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বড় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে দেশের সুনাম অর্জন করবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা উন্নত করবেন। এজন্য খুব মনোযোগ সহকারে তিনি লেখাপড়া করতেন।

রাজধানীর স্বনামধন্য 'কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কলেজের একাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্র ছিলেন শহীদ রিয়ান। এর আগে ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসিতে পাস করেন। তিন ভাইয়ের মধ্য রিয়ান ছিল সকলের মধ্যে মনি। তিনি তার সুন্দর ব্যবহার দিয়ে সকলের মন জয় করেছিলেন। সুন্দর পবিত্র আত্মা বেশি দিন এই পৃথিবীতে থাকতে পারলো না। কারণ সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কোটায় চাকরি পাওয়া পেটোয়া পুলিশ বাহিনী রিয়ানকে সহ্য করতে পারল না। স্বাধীনতার স্বাদ রিয়ান যেন গ্রহণ করতে না পারে এইজন্য তাকে তিনটি বুলেটের আঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়।

শাহাদাতের ঘটনা

আজ সোমবার। বাঙালি জাতির স্মরণীয় একটি দিন। টানা ১৫ বছর পর পরাজয় হলো ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের। কোটা আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসা প্রধানমন্ত্রী ও দুর্নীতিতে ভয়াবহ ইতিহাস সৃষ্টিকারী আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। এ আনন্দে সারাদেশের মিষ্টির দোকান গুলো ফাঁকা হয়ে গেল। রাস্তায় নামতে শুরু করলো মানুষ বিজয় উল্লাস উদযাপনের জন্য। নাসিব হোসেন রিয়ান ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। যেহেতু কিছুদিন আগে তার বন্ধু স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যেয়ে শহীদ হয়েছে, সেহেতু স্বৈরাচারের পতন তার জন্য বড় একটি আনন্দের বিষয়। রিয়ান বাবা-মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও ছাত্র-জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিত। ১৮ জুলাই তার বন্ধু ফারহান ফাইয়াজ আন্দোলনে নিহত হলে সে জানায়, ন্যায্য দাবী চাইতে গিয়ে আমার ভাইয়েরা মরে যাচ্ছে, আমি কিছুতেই ঘরে বসে থাকতে পারিনা।

৫ আগস্ট স্বৈরাচারী সরকারের পতনের খবর পেয়ে ছাত্র-জনতার সাথে নাসিব হাসান রিয়ান বিজয় মিছিল সহকারে শ্যামলীর খিলজি রোড হয়ে রিং রোডে ঢুকছিল। এসময় সেখানে স্বৈরাচারী সরকারের একদল ঘাতক পুলিশকে দেখে নাসিব হাসান বুঝতে পারে এরা তো এখনো আত্মসমর্পণ করেনি। এই পুলিশগুলো তো প্রকৃতপক্ষে পুলিশ না এরা পুলিশ নামে সরকারি সন্ত্রাসী। অবাক হয় এখনো কেন এরা ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে!

নাসিব হাসান রিয়ান সবসময়ই শহীদ আবু সাঈদের কথা স্মরণ করত, যে কিভাবে এতো সাহসিকতার সাথে পুলিশের সামনে আবু সাঈদ ভাই বুক পেতে দিলেন। নাসিব হাসান রিয়ান জীবনের সমস্ত ভয়ভীতি দূর করে বাতিলের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে, তার দুই হাত প্রসারিত করে পুলিশকে বলেছিল, গুলি করবি? কর! আমি বাতিলকে ভয় করিনা। আমি তোমাদের বুলেটকে কেন ভয় করব ? আমি তো ভয় করি একমাত্র আল্লাহকে। তোমরা গুলি কর! দেখি তোমাদের বন্দুকের মধ্যে কতগুলি আছে। ঘাতক পুলিশও বুঝি এরই অপেক্ষায় ছিল। রিয়ানের কথা শোনামাত্রই তারা ৩টি গুলি করে। প্রথম বুলেট বুকে লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয় বুলেট কানের নিচে দিয়ে ঢুকে গলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তৃতীয় বুলেট বুকে-কাধে লেগে মাংস ছিড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা দেন। এভাবেই দেশের দুশমন, পুলিশ নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী মেতে উঠে এক হিংস্র খুনের নেশায়। মানুষ যে হিংস্র পশুর থেকেও ভয়ংকর হতে পারে তা প্রমাণ করলো এই পুলিশ বাহিনী। আচ্ছা ওদের কি বিবেক নেই? সত্য মিথ্যা পার্থক্য করার কোন জ্ঞান কি সৃষ্টিকর্তা তাদের দেয়নি? তাদের ঘরেও তো রিয়ানের মত সন্তান আছে। বিন্দু পরিমান দয়ামায় থাকলেও তো গুলি চালানো

সম্ভব না। তাহলে ওরা কারা? ওদের পরিচয় কি? মানুষ নাকি অন্য কিছু? ১৯৮৯ সালের তিয়ানানমেন স্কোয়ার বিক্ষোভ ও গণহত্যাকেও হার মানায়। বাংলাদেশের এই শিক্ষার্থী গণহত্যা। আমেরিকার ইসরাইলের মতো নিষ্ঠুর আর কারো তো এ ধরনের গণহত্যা কখনো চালায় নি। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এটাতেই প্রমাণ করলো যে সে ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত শিক্ষার্থী গণহত্যাকারী।

বড় ভাইয়ের অনুভূতি

রিয়ান নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী, একই সাথে সাহসী এবং স্নেহশীল ছিল । তার কথায় গুরুতর এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রকাশ পেতো তার যা বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে। সেই প্রফুল্ল মুখ কেউ ভুলতে পারবেনা যা তাকে পরিচিত এবং সকলের মধ্যে প্রিয় করে তুলেছে। সে তার ভাইদের সাথে তার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলো। তাকে কোন কাজ দিলে সেই কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের সঠিকভাবে ব্যবহার করার প্রতি সে আগ্রহী ছিলো এবং কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতো ।

রিয়ানের শখ ছিল

সে ভালো একজন ক্রিকেটার হবে
এদেশে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে
সকল মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে হবে।

তার এক বন্ধুর অনুভূতি

আমাদের মাঝে নাসিব হাসান রিয়ান ছিল সবার প্রিয়। তার অমায়িক ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করত। লেখাপড়াতে সে খুব ভালো ছিল। ক্রিকেট খেলা তার খুব প্রিয় ছিল। আমাদের ক্লাসের অনেকেই তার মত হতে চাই।

রিয়ান সম্পর্কে তার পিতার বক্তব্য

বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই সে নিজেকে ইসলামের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে এবং সে সর্বদা ঠাণ্ডা, ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও নামাজের শুরুতে মসজিদে যেতো এবং নামাজের পর পড়তে বসতো। সে তার আচরণে সৎ ছিলো, তার সর্বদা অশ্রুসিক্ত চোখ তার ভাল সততাকে নির্দেশ করে এবং তার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। সে সর্বদা পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতো। তিনি তার পিতাকে সম্মান করতেন এবং মায়ের প্রতিও ভীষণভাবে মমতাময়ী ছিলেন। ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

শহীদ রিয়ান তার উচ্চ আধ্যাত্মিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতেন। তার রুকু ও সিজদা দীর্ঘায়িত করতেন। শুক্রবারে অজু করে এবং নিয়মিতভাবে অজু করে তিনি একজন ইবাদতগুজারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তারা মধ্যরাতে নামজে উঠতেন। গোপনে সদকা করতেন। নিয়মিত তার বন্ধু ফারহানকে সাথে যিনি ১৮ জুলাই শহীদ হন) নিয়ে নিয়মিত গরীব দুঃখী মানুষকে খাবার বিতরণ করতেন। শহীদ রিয়ান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে খুব ভালোবাসতেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

নাসিব হাসান রিয়ানের বাবা কৃষি মন্ত্রনালয়ে চাকুরী করেন। তার মাসিক আয় ৩২ হাজার টাকা। তিনি রাজধানী শ্যমলীতে নিজস্ব ফ্ল্যাটে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। নাসিবের বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছোট ভাই ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে। নাসিব হাসানের বাবার ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ আছে।

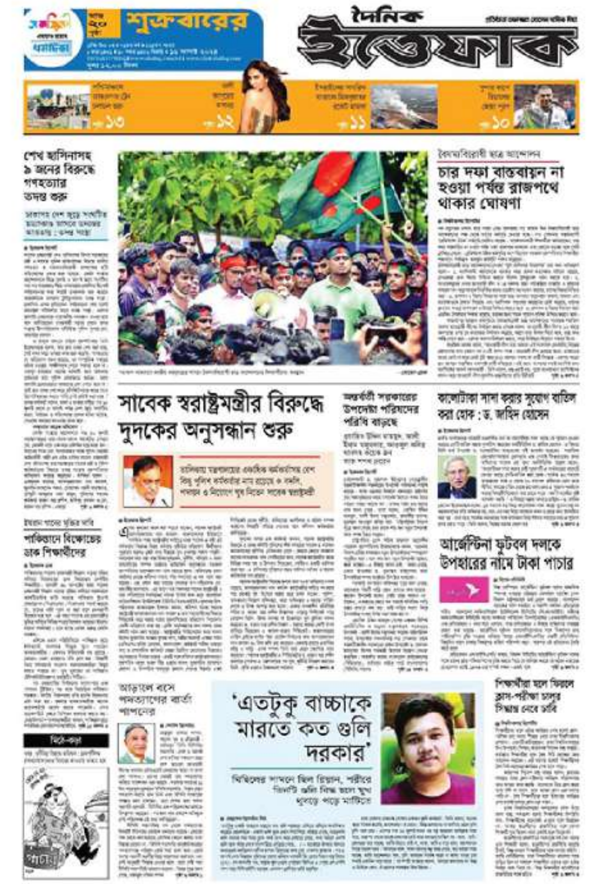
দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবারের

শেখ হাসিনাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে গণহত্যার তদন্ত শুরু

চার দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের পরিধি বাড়ছে

কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করা হোক : ড. জাহিদ হোসেন

পাকিস্তানে বিক্ষোভের ডাক শিক্ষার্থীদের

আর্জেন্টিনা ফুটবল দলকে উপহারের নামে টাকা পাচার

আড়ালে বসে পদত্যাগের বার্তা পাঠানোর

'এতটুকু বাচ্চাকে মারতে কত গুলি দরকার'

মিছিলের সামনে ছিল রিয়ান, শরীরে তিনটি গুলি নিয়ে জলে মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে

শিক্ষার্থীরা হলে ফিরলে ক্লাস-পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেবে ঢাবি

দৈনিক
বাংলাদেশের চিত্র
সত্য প্রকাশে আপোষহীন

Medical Certificate of Cause of Death

DMCH
N A S I B H A S A N R I Y A N
MD. GOLAM RAZZAK
GORIMOHAL
RAJANPUR
KALIGANJ
SATKHIRA
13 09 2007
05 08 2024
02 50 PM
05 08 2024
05 00 PM
BROUGHT DEAD
GUN SHOT INJURY
DR. MD. SHAGTICK LOHANI
EMO
104780

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

শহীদের পূর্ণ নাম	: নাসিব হাসান রিয়ান
জন্ম তারিখ	: ১৩-০৯-২০০৭
জন্মস্থান	: ঢাকা
পেশা/পদবী	: ছাত্র বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কলেজ, একাদশ শ্রেণি
পিতার নাম	: গোলাম রাজ্জাক, চাকুরীজিবী, কৃষিমন্ত্রণালয়/৫২
মায়ের নাম	: সামী আক্তার, গৃহিনী, ৪৫
স্থায়ী ঠিকানা	: ফ্ল্যাট বাসা/মহল্লা : ট-এ/১, ২৭/৩, রোড-৩
ইউনিয়ন	: বিসমিল্লাহ টাওয়ার
থানা	: শেরেবাংলা নগর
জেলা	: ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: ফ্ল্যাট-এ/১, ২৭/৩, রোড: ৩, বিসমিল্লাহ টাওয়ার শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
লেখাপড়া	: বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কলেজ, একাদশ শ্রেণি
পিতার নাম	: গোলাম রাজ্জাক, চাকুরীজীবী, কৃষিমন্ত্রণালয়/৫২
মায়ের নাম	: সামী আক্তার, গৃহিনী, ৪৫ ১. বড় ভাই : নিহাশ হাসান রাফিন (২০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স প্রথম বর্ষ ২. ছোট ভাই : নাবিল হাসান রাফসান (১২) ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ধানমন্ডি
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: শ্যামলী লিঙ্ক রোড
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকেল ৫ টায়
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনী
জানাজা	: শ্যামলী জামে মসজিদে গোসল শেষে ১ম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় কেরানিগঞ্জে ২য় জানাজা শেষে নানার পাশে তাকে দাফন করা হয়
দাফন	: কেরানিগঞ্জ কবরস্থান, ঢাকা

শহীদ মারুফ হোসেন

ক্রমিক : ০৯৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯৫

প্রারম্ভিক কথা

শহীদ মারুফ হাসান। বরিশাল জেলার ভাষানচর ইউনিয়নের কাজিরহাট থানার হেসাম উদ্দিন গ্রামে ২০০৫ সালের ৭ ডিসেম্বর পিতা মো: ইদ্রিস আলী এবং মাতা মরিয়াম বেগমের অভাবের সংসারে এক টুকরো সুখের প্রদীপ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিন পুত্র সন্তানের মাঝে প্রথম সন্তান শহীদ মারুফ ছিলেন বাবা-মায়ের চোখের মণি।

শহীদের শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে বরিশালের গ্রামের বাড়িতেই। পড়াশোনাও বরিশালেই। বরিশালের একতা ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে আসেন ঢাকায় উদ্দেশ্য ছিল ফুচকা বিক্রেতা বাবার ব্যবসার কাজে সহায়তা করা।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

২০১৮ সালের চৌঠা অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাতিলকৃত কোটা সংস্কার পদ্ধতি সংক্রান্ত ও পরিপত্রকে ২০২৪ সালের ৫ই জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করলে, সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সব ধরনের সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটাভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে সূচনা লাভ করে কোটা সংস্কার আন্দোলন। শিক্ষার্থীদের এই যৌক্তিক দাবিকে বিবেচনায় না নিয়ে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের এমপি মন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং কটুক্তি করতে থাকে যা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

সরকারি মন্ত্রী-এমপি এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের এসব অমূলক দম্ভোক্তি এবং কটুক্তি হাসিনার পেট পেটুয়া বাহিনীতে পরিণত হওয়া সরকারি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী- পুলিশ এবং র‍্যাপ কে নিরস্ত্র আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করতে প্ররোচিত করে। পুলিশ এবং র‍্যাবের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের লাঠিয়াল বাহিনী ও দেশে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্র নিরীহ ছাত্রদের উপর হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শত শত ছাত্রকে মারাত্মকভাবে আহত ও জখম করে।

এরই মাঝে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী, রক্ত পিপাসু খুনি হাসিনা আন্দোলনরত সাধারন শিক্ষার্থীদের "রাজাকারের নাতিপুতি" বলে মন্তব্য করলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী এর প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্বরে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভ তরঙ্গের ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অন্যায়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবৈধ এবং অন্যায় ঘোষণাকে অনুসরণ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ ঘোষণা করে স্বৈরাচারের কপদলেহী প্রশাসন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বন্ধ হয়ে গেলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে অগ্রগামী ছিল ঢাকার বাড্ডায় অবস্থিত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরেই শহীদ মারুফ হাসান তার ফুচকা বিক্রেতা পিতাকে সহায়তা করতেন ব্যবসার কাজে।

শাহাদাতের অমিয় সুধা পান

১৬ জুলাই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পেটোয়া পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করলে দারুন শিক্ষার্থীদের সমর্থনে দেশের সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের পরিমাণ যেমন বাড়তে থাকে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে আন্দোলন কমানোর নামে সরকারি পেটুয়া বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের তান্ডব। সাধারণ ছাত্র জনতার উপর সরকারের এই অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে পারেনি টগবগে তরুণ যুবক শহীদ মারুফ হাসান। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন আন্দোলনরত ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে।

জুলাই মাসের অন্যান্য দিনের মতো ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার পবিত্র জুমার দিনও শহীদ মারুফ হাসান সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে সারাদিন আন্দোলনের মাঠে ছিলেন। দিনভর চলতে থাকে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার সাথে সরকারি পেটোয়া বাহিনী এবং আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ।

আনুমানিক সন্ধ্যা ছয়টা। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর ন্যাক্কারজনকভাবে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় স্বৈরাচারীর সহযোগী পুলিশ বাহিনী। পিশাচের বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয় শহীদ মারুফ হাসানের বুক। নির্মম পরিহাসের বিষয় হল ১৯ জুলাই বুলেট বিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করলেও শহীদের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি দুইদিন পর্যন্ত। ঘটনার দুই দিন পর অনেক খোঁজাখুঁজি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাওয়া যায় শহীদ মারুফ হাসানের লাশ। একুশে জুলাই বাড্ডায় জানাজা শেষে দাফন করা হয় স্থানীয় কবরস্থানে।

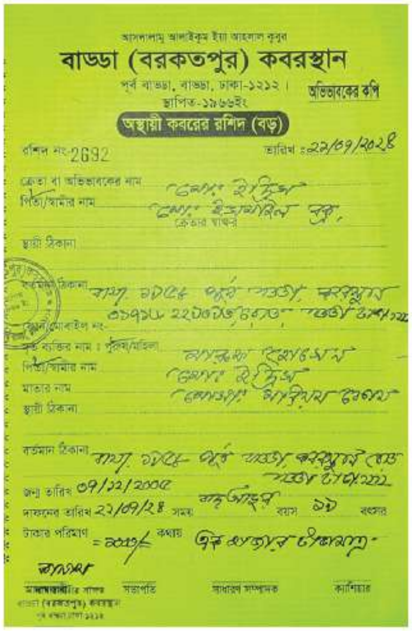
আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর
বাড্ডা (বরকতপুর) কবরস্থান
পূর্ব বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। অভিভাবকের কপি
স্থাপিত-১৯৬৬ইং
অস্থায়ী কবরের রশিদ (বড়)
রশিদ নং-2692 তারিখ : 22/07/2024
ক্রেতা বা অভিভাবকের নাম
পিতা/স্বামীর নাম
স্থায়ী ঠিকানা
বর্তমান ঠিকানা
মৃত ব্যক্তির নাম : পুরুষ/মহিলা
পিতা/স্বামীর নাম
মাতার নাম
স্থায়ী ঠিকানা
বর্তমান ঠিকানা
জন্ম তারিখ 07/12/2005
দাফনের তারিখ 22/07/24 সময় বয়স ১৯ বৎসর
টাকার পরিমাণ কথায়
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ক্যাশিয়ার

Medical Certificate of Cause of Death
DMCH
MARUF
MD. IDRIS
Middle Badda
Badda
Dhaka
Brought dead - Cause of death will be ascertained after post mortem
H/O gun shot injury

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মারুফ হোসেন
Name: MARUF HOSSAIN
পিতা: মোঃ ইদ্রিস
মাতা: মোসাঃ মরিয়ম
Date of Birth: 07 Dec 2005
ID NO: 4677783526

অপেশাদার ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স
Non-Professional E-Driving License
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
People's Republic of Bangladesh
নাম / Name
MARUF HOSSAIN
জন্ম তারিখ / Date of Birth
07-DEC-2005
রক্তের গ্রুপ / Blood Group
B(+)VE
পিতা / স্বামী / Father / Husband
MD EDRIS
প্রদান / নবায়ন / Issue / Renewal
14-JUL-2024
মেয়াদ / Validity
13-JUL-2034
রেফারেন্স নং / Ref. No.
DM124171NP129
প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ / Issuing Authority
DHAKA METRO-1, BRTA
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যয়ণ পত্র
নং 1034

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মারুফ হোসেন
পিতা	: মোহাম্মদ ইদ্রিস
বয়স	: ৪৪
পেশা	: ব্যবসা
মাতা	: মরিয়ম বেগম
বয়স	: ৩৮
পেশা	: গৃহিণী
ভাই-বোন	: তিন ভাই
শহীদের অবস্থান	: সবার বড়
ঠিকানা	: গ্রাম : হেসাম উদ্দিন, ইউনিয়ন : ভাষানচর, থানা : কাজিরহাট, জেলা : বরিশাল
শহীদ হওয়ার স্থান	: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, বাড্ডা, ঢাকা।
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯/০৭/২০২৪
আঘাতের ধরন	: বুকে পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়ে
পরামর্শ	: ১. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পিতাকে ব্যবসার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দেওয়া
	: ২. ছোট দুইজন ভাইয়ের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা
নিউজ লিংক	: https://www.dhakapost.com/country/302648

শহীদ মো: সুমন সিকদার

ক্রমিক : ০৯৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯৬

শহীদ পরিচিতি

বাংলার ইতিহাসে একবিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া বৈষম্যবিরোধী গণ-ছাত্র আন্দোলনে লড়াকু সৈনিকের ন্যায় প্রতিবাদ মুখরিত হয়ে স্বৈরশাসক হাসিনার পেটোয়া বাহিনী ঘাতক পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণকারী দিনমজুর, সৎ, পরিশ্রমী শহীদ মো: সুমন সিকদার ১ মার্চ ১৯৯৩ সালে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কবাই ইউনিয়নে অসহায় ও দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন দিনমজুর ও শ্রমিক, কখনো একজন নির্বিকার ফেরিওয়ালা। যার দরুন অভাব অনটন সবসময় পিছুটান হয়ে জোঁকের মত লেগে থাকতো। পরিবারের মুখে দুমুঠো আহার তুলে দেওয়ার জন্য দিনমজুরের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় ভোক্তাদের নিকট চাহিদা মোতাবেক পণ্য সামগ্রী বিক্রি করে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

৬২ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তার লাভ করা গণঅভ্যুত্থানে দিনমজুর শহীদ মো: সুমন সিকদার এমন একজন মানুষ যিনি এই বসুন্ধরার চাকচিক্যময় ও লোভনীয় সামগ্রী উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লবের সময় নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে শহীদের সারিতে স্বাক্ষর রেখে আগামী প্রজন্মের তরুণ, যুবক ও খেটে খাওয়া মানব সমাজের জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে গেছেন। ইতোমধ্যেই বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহ যেমন-আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, কানাডা ছাড়াও জাতিসংঘ ছাত্র জনতার এই আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

অভাব-অনটনে জর্জরিত দিনমজুর শহীদ মোঃ সুমন সিকদারের হৃদয়ে ছিল সবসময় সাদামাটা জীবন গঠনের স্বপ্ন। সবকিছুর উর্ধ্বে তিনি প্রাধান্য দিতেন সততা, ন্যায়পরায়ণতা, হালাল উপার্জন আর বৈষম্যবিরোধী মানসিকতা। তারই প্রেক্ষিতে নিজ গ্রাম বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কবাই ইউনিয়নের মায়াজাল ত্যাগ করে পড়তে ও লিখতে না জানা ব্যক্তিটি পরিবারের সদস্যের অর্থের যোগান দিতে গিয়ে ঢাকায় পাড়ি জমান। শহীদ মোঃ সুমন সিকদার কর্মজীবনে ছিলেন সৎ এবং পরিশ্রমী।

৫ আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে শাহাদাত বরণকারীগণের মধ্যে শহীদ মো: সুমন সিকদার ছিলেন এমন একজন মানুষ যার

ইতিবাচক গুণাবলি আগামী প্রজন্মের জন্য প্রেরণার আঁধার হয়ে থাকবে। শহীদ মো: সুমন সিকদার আগামী প্রজন্মের সামনে তাদের জীবন-মশাল তুলে ধরার মানসে রচনা করছেন শাহাদাতের তামান্না। তাঁর হৃদয়ছোঁয়া শহীদী তামান্না বিশ্ব পরিমন্ডলে তরুণদের নিকট রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত হয়ে বৈষম্যবিরোধী কার্যকর্মে উদীয়মান তারুণ্যের অন্তরে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে।

পরিবারের একমাত্র অভিভাবক শহীদ মো. সুমন সিকদার ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে মেঝো। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও মানব দরদী প্রকৃতির লোক। তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারে বেড়ে ওঠা অন্যান্য সদস্যরা হলেন সোহাগ সিকদার। যার বয়স ছিল ৩৪ বছর। এছাড়াও অন্য সদস্য হলেন শামীম সিকদার। যার বয়স ছিল ২২ বছর এবং অন্য সদস্য যিনি তিনি হলেন শহীদ মো: সুমন সিকদারের একমাত্র কর্ণধার ও নিষ্পাপ শিশু আলিফ সিকদার। যার বয়স মাত্র ২২ মাস।

সুমন সিকদার মাত্র ৮ম শ্রেণির গন্ডি পেরিয়ে জীবিকা নির্বাহের খোঁজে পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পড়ালেখার স্বপ্ন ছেড়ে ঢাকা বাড্ডায় পাড়ি দেন। পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে অর্থ রোজগারের জন্য দিনমজুর হিসেবে কাজ করে পরিবারের হাল ধরার প্রয়াস করেন। দীর্ঘ ৩-৪ বছর তিনি ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। ঢাকায় অবস্থিত বাড্ডায় এক ভাড়া বাসায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কোনরকমে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি পরিবারের নিকট ছিলেন বটবৃক্ষ।

দেশে বৈষম্যবিরোধী গণ ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার পর দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরশাসক ও ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা কতৃক কণ্ঠরোধ, আইনের অপব্যবহার, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, বিচারবহির্ভূত হত্যা, বিচারকার্যে অস্বচ্ছতা তথা সর্বোপরি সবকিছুর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষেরা যখন প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন তখনই শহীদ মোঃ সুমন সিকদারের হৃদয় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নাম না জানা অনেকের মতো শহীদ সুমনও সামান্য শুকনো খাবার, তরল জাতীয় পানি ইত্যাদি দ্বারা সেবা প্রধানের মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এমন সময় অবৈধ ফ্যাসিস্ট ও খুনি হাসিনার স্বৈরশাসকের পথভ্রষ্ট পথচলায় পরিচালিত ঘাতক পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলিতে আন্দোলনরত বাড্ডায় ফুজি টাওয়ারের সামনে প্রগতি সরণির মোড়ে শহীদ মো: সুমন সিকদার শাহাদাত বরণ করেন। যা ছিল খুবই মর্মান্তিক। পরিবারে স্ত্রী ও ২২ মাসের শিশু কন্যা সন্তানকে রেখেই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে।

সামগ্রিক ঘটনার বর্ণনা

৫ আগষ্ট ২০২৪ সোমবার দুপুর ১২.০০ টার দিকে ঢাকা বাড্ডায় ভাড়ারত বাসা থেকে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শহীদ সুমন বেরিয়ে যান। ঐ মুহুর্তে ঢাকা শহরের সকল অলিতে-গলিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা গণআন্দোলন অব্যহত রেখেছিল। রাস্তায় আন্দোলনরত ছাত্রদের দেখে তিনি তাদের পাশে অবস্থান নেন। নানাভাবে সহযোগিতার চেষ্টা করেন। ঠিক তখনই শহীদ মো: সুমন সিকদার স্বৈরশাসকের পেটোয়া বাহিনী কতৃক ঘাতক পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত ডাক্তারগণ তাকে মৃত ঘোষণা দেন।

প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পতিত হয়ে নদী ভাঙনের কারণে একমাত্র কৃষি নির্ভর জমিজমা হারিয়ে শহরে পাড়ি জমানো দিনমজুর শহীদ মো: সুমন সিকদারের পরিবার যখন সমাজের বিদ্যমান বৈষম্য, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়ে একদমই বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল, ঠিক এমন সময় তার মৃত্যু সংবাদ পুরো পরিবারের জন্য বিপর্যয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। একজন দিনমজুরের এই করুণ পরিণতি সমাজের অসাম্য ও বৈষম্যকে আরও প্রকটভাবে প্রকাশ করে।

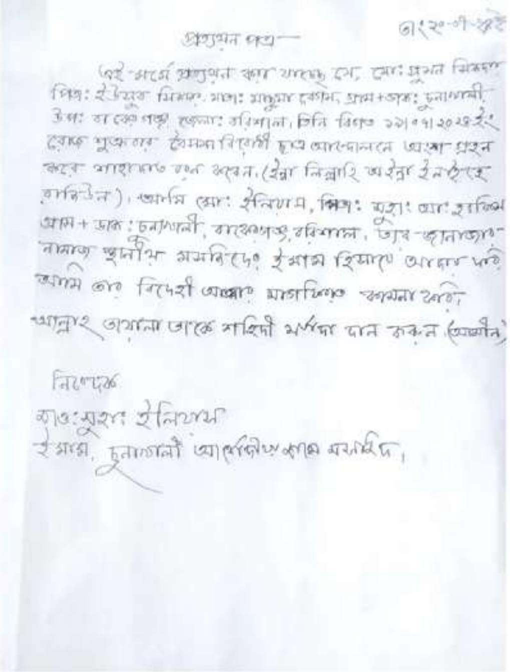

তাং২০-৭-২৪ইং

প্রত্যয়ন পত্র—

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ সুমন সিকদার পিতা: ইউসুফ সিকদার, মাতা: মাসুমা বেগম, গ্রাম+ডাক: চুনাখালী, উপজেলা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। তিনি বিগত ১৯।০৭।২০২৪ইং রোজ শুক্রবার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি মোঃ ইলিয়াস, পিতা: মৃত: আ: [illegible] গ্রাম+ডাক: চুনাখালী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। তার জানাজার নামাজ স্থানীয় মসজিদের ইমাম হিসাবে আদায় করি। আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ তায়ালা তাকে শহিদী মর্যাদা দান করুন (আমীন)

নিবেদক

মাওঃ মুহাঃ ইলিয়াস

ইমাম, চুনাখালী [illegible] জামে মসজিদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ সুমন সিকদার

Name: MD. SUMON SIKDER

পিতা: মোঃ ইউসুফ সিকদার

মাতা: মোসাঃ মাছুমা

Date of Birth: 01 Mar 1993

ID NO: 7806476847

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: সুমন সিকদার
জন্ম তারিখ	: ০১-০৩-১৯৯৩
পিতা	: মো: ইউসুফ সিকদার
মাতা	: মাসুমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কবাই, ইউনিয়ন: কবাই থানা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
সন্তান	: আলিফ সিকদার
পেশা	: শ্রমিক
ঘটনার স্থান	: বাড্ডায় পুঁজি টাওয়ারের সামনে প্রগতি সারণি
আহত হওয়ার সময়কাল	: দুপুর ১২.০০ টা
শাহাদাতের সময়কাল	: দুপুর ১২.০০ টা
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলির আঘাত
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ ও খুনি হাসিনা সরকারের সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম কবাইতে

শহীদ রবিউল ইসলাম

ক্রমিক : ০৯৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯৭

জন্ম-পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

স্বৈরাচারের ঐরাবত তাড়াতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়া এক শহীদি নাম রবিউল ইসলাম। মা-বাবার অন্দর আলোকিত করে এই ধরাধামে তার আগমন ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৯৯৭ সালের ১৭ অক্টোবর। তার জন্মস্থান বাংলার ভেনিস খ্যাত কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী জেলা বরিশালে। এ জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার ফোরকানিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত শাকবুনিয়া গ্রামে কৃষক পিতা আব্দুল লতিফ ফরাজী ও গৃহিণী মাতা দেলোয়ারা বেগমের ঘর উজালা করে তার আগমন ঘটে। পরিবারের দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে সেদিন রবিউলের পরিবারে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বাবা-মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ছোট্ট রবিউল হেসে-খেলে আদরে-আহ্লাদে মায়ের কোলে গ্রামের বাড়িতেই বেড়ে উঠতে থাকেন।

শহীদের নজরানা

১৯ জুলাই, ২০২৪; ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকা। সন্ধ্যার কালোছায়া নেমে এসেছে ঢাকার বুক জুড়ে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশ তখন উত্তাল কোটা সংস্কার আন্দোলনে। যাত্রাবাড়ী এলাকাও তখন ছাত্রদের আন্দোলনে আন্দোলিত। সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে। হঠাৎ ঠাস ঠাস শব্দে পুলিশের গুলি আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর। একটা বুলেট এসে তীব্র গতিতে আঘাত হানল রবিউলের দেহে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি। সময় তখন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা।

ধরাধরি করে গুলিবিদ্ধ রবিউলকে নেওয়া হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে সন্ধ্যা ৭টায় মাত্র ২৭ বছর বয়সে ইহকালের সফর সমাপ্ত করে রবিউল উড়ে গেলেন জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে অনন্ত জীবনের পথে। স্বৈরাচারের বুলেটে বুক ঝাঁঝরা হয়ে লেখা হলো আরেকটি নাম– শহীদ রবিউল ইসলাম!

শহীদ রবিউল ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত

শহীদ রবিউল ইসলাম যৌবনে পদার্পণ করে কাজের খোঁজে চলে আসেন রাজধানী ঢাকায়। ঢাকার নবাবপুরে নিয়োজিত হন ইলেকট্রনিক ব্যবসায়। এর আগে তিনি গ্রামে কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজেদের ১ একর (১০০ শতাংশ) জমিতে ধান চাষ করে পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। পাশাপাশি ঢাকার নবাবপুর এলাকায় ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ব্যবসা চালিয়ে জীবনের উন্নতি করতে চেষ্টা করছিলেন। তার ব্যবহার, কর্মনিষ্ঠা এবং অনুপম ব্যক্তিত্ব দ্বারা তার গ্রামের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সুপ্রিয় এবং সুপরিচিত।

ছাত্রজীবনে রবিউল ইসলাম বরিশালের বাকেরগঞ্জের স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা করেন। স্কুল এবং কলেজ জীবনে তিনি সর্বদা একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রবিউল রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং নিজ এলাকার মানুষের অধিকারের জন্য সবসময় সোচ্চার থেকেছেন। যদিও সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন না, তবুও সমাজের সঠিক উন্নয়নের জন্য তার মধ্যে প্রচন্ড দায়িত্ববোধ কাজ করতো। তিনি বিশ্বাস করতেন সঠিক ও সৎ রাজনীতি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

তার সেই বিশ্বাস এবং চিন্তা-চেতনা থেকে ছাত্রদের যৌক্তিক আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করতে এসেছিলেন যাত্রাবাড়ীতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মাঝে। কিন্তু যাত্রাবাড়ির সেই ভয়ানক কালো সন্ধ্যায় স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার অসুস্থ রাজনীতির শিকার হয়ে পুলিশলীগের গুলিতে তার জীবনের সবটুকু আলো দপ করে নিভে যায়।

শহীদ রবিউল ইসলামের অকাল মৃত্যুতে তার পরিবারে নেমে আসে এক সীমাহীন শোকের ছায়া। বাবা-মা, একমাত্র ভাই আর প্রিয়তমা স্ত্রী শোকে স্তব্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে বড় আঘাতটা লেগেছিল তার স্ত্রী তানিয়া বেগমের! কেননা গর্ভে ছিল তার অনাগত সন্তান, যে কিনা কিছুদিনের মধ্যেই দেখবে পৃথিবীর মুখ, জন্মদাতা পিতার মুখ! অথচ!

শহীদের পরিবারে এলো নতুন অতিথি

রবিউল ইসলাম শহীদ হওয়ার দেড় মাসের মাথায় ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী জন্ম দেন ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! মাত্র কদিন আগেই পিতাকে তার খুনি হাসিনা এই দুনিয়া থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পরপারে। এই মুহূর্তে যার বাবার আদর পাওয়ার কথা, সে পৃথিবীতে এসেছেই এতিম হয়ে! এই মুহূর্তে যে বাবার তার সন্তানের গালে চুমু দেওয়ার কথা, সেই বাবা আজ মাটির অন্ধকার ঘরে!

কন্যা সন্তানের জন্মে রবিউলের পরিবারে একদিকে যেমন খুশির ঢেউ, অন্যদিকে সেই পরিবারের সবার চোখে স্বজন হারানোর ব্যথাতুর অশ্রুজল! এ যেন এক নিষ্ঠুর বেদনানন্দ!

রবিউল ইসলামের অকাল মৃত্যুর শোকের ঢেউ আছড়ে পড়ে তার এলাকা বাকেরগঞ্জ থেকে ঢাকার নবাবপুর পর্যন্ত। এলাকাবাসী আর সহকর্মীরা একজন সৎ, পরিশ্রমী যুবকের মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়ে যায়।

রবিউলের এই সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ আমাদের শিক্ষা দেয় অন্যায়-অবিচার, সন্ত্রাস-দুর্নীতি আর স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ানোর; জালিমের মসনদ কাঁপিয়ে সমাজ ও দেশকে রক্ষা করার। রবিউলের এই আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও নিশ্চয়ই সমস্ত অপশক্তি রুখে দিতে আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পিছপা হবো না, ইনশাআল্লাহ!

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

নাম	: মো: রবিউল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৭.১০.১৯৯৭
জন্মস্থান	: বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
পেশা	: ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা
কর্মস্থল	: নবাবপুর, ঢাকা
পিতার নাম	: আব্দুল লতিফ ফরাজী (৬২)
মাতার নাম	: দিলওয়ারা বেগম (৫০)
স্ত্রীর নাম	: তানিয়া বেগম (২০)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শাকবুনিয়া, ইউনিয়ন: ফোরকানিয়া, থানা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন (বাবা, মা, ভাই, স্ত্রী ও নবজাতক কন্যা)
পরিবারের আয়ের উৎস	: ১ একর (১০০ শতাংশ) কৃষি জমি
শহীদি স্থল	: যাত্রাবাড়ী
ঘাতক	: পুলিশ
গুলিবিদ্ধের সময়	: সন্ধ্যা ৬:৩০ টা (১৯ জুলাই, ২০২৪)
শহীদ হওয়ার সময়	: সন্ধ্যা ৭ টা (১৯ জুলাই, ২০২৪)
সমাধিস্থল	: গ্রামের বাড়ি পারিবারিক গোরস্থান

শহীদের পরিবারের প্রতি সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া

২. ভাইয়ের জন্য চাকরি/ব্যবসার ব্যবস্থা করা

শহিদ মোঃ রিয়াজ

ক্রমিক : ০৯৮

অইিডি : ঢাকা সিটি ০৯৮

জন্ম-পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

মোঃ রিয়াজ একজন ছাত্র ছিলেন। কাঁচামালের ছোট একজন ব্যবসায়ী মাহামুদুল হকের দুই সংসার। প্রথম স্ত্রী শাফিয়া বেগমের ৪ সন্তানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন শহীদ রিয়াজ। ৪ ভাইদের মধ্যে রিয়াজ ছিল সবার আদরের । ২০০৩ সালের ১২ জানুয়ারি বরিশাল জেলার হিজলা থানার মোল্লার হাট ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন শহীদ রিয়াজ। মা-মোসা: শাফিয়া বেগম অনেক কষ্টে স্বামীর সহযোগিতা ছাড়াই শহীদ রিয়াজসহ আরো ৩ সন্তানকে বড় করে তুলেছেন। অত্যন্ত মেধাবী এবং কর্মঠ ছিলেন শহীদ রিয়াজ। বরিশাল জেলার ফুলাদি সরকারি কলেজের ডিগ্রী শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। শহীদ রিয়াজ লেখাপড়ার সাথে সাথে পরিবারের অর্থ যোগানের জন্য ঢাকায় ছোট ব্যবসা করতেন।

যেভাবে শহীদ হন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় অনেক মানুষ জীবন দিয়েছেন। তবে ৫ আগস্ট ২০২৪ এর স্বৈরাচার পতনের যে বিজয়; এই বিজয় অর্জনের জন্য যারা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিলেন তাদেরকে বাংলাদেশের আপামর জনতা চিরদিন স্মরণ করবে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন বা কোটা সংস্কার আন্দোলনের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন শহীদ মো: রিয়াজ তাদের মধ্যে অন্যতম।

মুলাদী সরকারি কলেজের ডিগ্রী শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্র মোঃ রিয়াজের চাওয়া ছিল এদেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। মেধার ভিত্তিতে যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকরীতে নিয়োগ পদ্ধতির সমর্থন করাই ছিল শহীদ রিয়াজের একমাত্র অপরাধ। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে রিয়াজ সবসময় সামনের সারিতে ছিলেন। আন্দোলনের ওই দিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট ২০২৪ রিয়াজসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সমাবেশে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে সিটি কলেজ থেকে সায়েন্সল্যাবে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের এই ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলানকে নস্যাত করার জন্য এবং নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকার তাদের ছাত্র সংগঠন, সহযোগী সংগঠন, ঘাতক পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবিকে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র এবং বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্রসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করতে নির্দেশ দেয়।

বিতর্কিত সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সভাপতি মোঃ মিজানের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ সমাবেশে এলোপাথাড়ি গুলি করে। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ছাত্র-জনতা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকে। অনেক ছাত্র ও সাধারণ মানুষ গুলি খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে। আহতদের চিৎকার শোনার মত অবস্থা কারো থাকেনা। গুলিবিদ্ধদের ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এরমধ্যেও কেউ কেউ আওয়ামী গুন্ডাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আহত ও নিহতদের রক্ষার চেষ্টা করতে থাকে। শহীদ রিয়াজ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

এই গুলির মধ্যেও রিয়াজ সাহসিকতার সাথে সামনের দিকে পা বাড়ায় এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের অবস্থান বজায় রাখতে উৎসাহ দিতে থাকে। রিয়াজ তাঁর বন্ধুদের বলতে থাকে "আমরা মারা যাবো তবুও আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের এই সংগ্রাম থেকে পিছু হটবোনা"। ঘাতকেরা তাকে টার্গেট করে। বেলা ১ টার সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোড়া বুলেট এসে বিদ্ধ হয় রিয়াজের মাথার বাম পাশে। তখন চারিদিকে মসজিদ থেকে যোহরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসছিলো।

রিয়াজের বন্ধুরা ঝুঁকির মধ্যে তাকে নিয়ে ঢাকা পপুলার মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করান। আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে আইসিইউতে রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষনে চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা খরচ যোগাতে তাঁর পরিবার বিভিন্ন জন থেকে ঋণ গ্রহণ করতে থাকেন। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করার এক পর্যায়ে রোগীর অবস্থা অবনতি হতে থাকে।

অবশেষে তিনি দীর্ঘ ১৪ দিন পরে ১৭ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটে শাহাদাতের অমিয় শুধা পান করে দুনিয়ার এই জীবন ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশের ছাত্রদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হারিয়ে যাওয়ায় সকল ছাত্র-জনতা শোকাহত হয়ে পড়েন। তার প্রিয় কলেজের শিক্ষার্থীরা সহ হাজারো মানুষ চোখের পানিতে কাঁদতে কাঁদতে বলে শহীদ রিয়াজের স্বপ্নকে আমরা বৃথা যেতে দেব না।

শহীদ রিয়াজের জানাজা

রিয়াজ ছিলেন সকল দলের, সকল মতের উর্ধ্বে । সবার কাছে সব দলের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক বেশি। তারপরেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সহযোগিতায় বরিশাল পার্টি অফিসে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় রাত ৮:৩০ মিনিটে। হাজার হাজার মানুষের চোখ দিয়ে সেদিন অঝোরে অশ্রু ঝরছিল । সবাই সেদিন স্বমস্বরে বলেছিল 'আমাদের প্রিয় রিয়াজ হত্যার বিচার চাই'।

মায়ের অনুভূতি

অশ্রু সিক্ত মা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেছিলেন "হে আল্লাহ, এমন ছেলের মা হতে পেরে আমি তোমার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার ছেলের শাহাদাত কবুল করে নাও। আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে তুমি দুনিয়াতে বিচার করে দাও।"

শহীদ রিয়াজ সম্পর্কে সেজো ভাইয়ের মন্তব্য

শহীদ রিয়াজের সেজো ভাই মোঃ রাসেল বলেন, 'রিয়াজ সবসময় আমার সাথে থাকতো। আমরা দুজন একসাথে খেলাধুলা করতাম একসাথে ঘুমাতাম। কিন্তু বড় হওয়ার পর রিয়াজ অভাবের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে ঢাকায় চলে যায়। ভাগ্যের কি পরিহাস! আমরা ছোটবেলা থেকে অনেক কষ্ট করে মানুষ হয়েছি। অনেক অভাব অনটনের মধ্যে বড় হয়ে এখন আল্লাহ আমাদের অভাব দূর করে অনেক ভালো রেখেছেন। আর এই সুখ স্বাচ্ছন্দ আমার ভাই রিয়াজের বেশি দিন ভোগ করতে পারলো না। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আমার ভাইকে দুনিয়ায় থাকতে দিল না। সে তো কোন অন্যায় করেনি। সে তো সত্যের পথেই ছিল। ন্যায্য অধিকারের জন্যইতো পথে নেমেছিল। আমি আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। বর্তমান সরকারের কাছে আমার দাবী- আমার ভাইকে যারা বিনা অপরাধে হত্যা করেছে তাদের দ্রুত বিচার করে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কামনা করছি'।

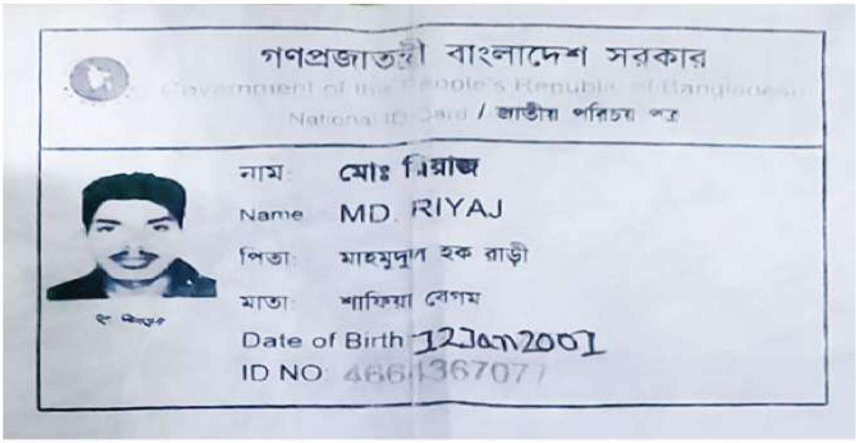

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ রিয়াজ
Name: MD. RIYAJ
পিতা: মাহমুদুল হক রাড়ী
মাতা: শাফিয়া বেগম
Date of Birth: 12 Jan 2003
ID NO: 4664367077

বড়জালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরঃ বড়জালিয়া, উপজেলাঃ হিজলা, জেলাঃ বরিশাল।
মৃত্যু সনদপত্র
আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করি।

এক নজরে শহীদ মোঃ রিয়াজ

পুরো নাম	: মো: রিয়াজ
পিতা	: মাহমুদুল হক রাড়ী
মাতা	: শাফিয়া বেগম
জন্ম তারিখ	: ১২-০১-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান	: লক্ষিপুর, হিজলা, বরিশাল
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পিতার পেশা	: ছোট কাঁচামালের ব্যবসা
মাসিক আয়	: ১০০০০/=
বর্তমান দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে অবস্থান	: অর্থাৎ প্রথম স্ত্রী মোসা: শাফিয়া বেগমের (শহীদ রিয়াজের মা) সাথে প্রায় ১৮ বছর থেকে সম্পর্কহীন অবস্থায় আলাদা জায়গায় বসবাস
শহীদের মায়ের অবস্থা	: মোছা: শাফিয়া বেগম (৫০), পেশা: গৃহিণী বর্তমান তিন সন্তান সহ একসঙ্গেই থাকেন ভাইবোন: রিয়াজসহ মোট ৪ ভাই (বোন নেই) মা-সহ তিন ভাই একই সঙ্গে একই পরিবারে অবস্থান
ভাইদের নাম ও পেশাগত অবস্থান	: ১. রেজাউল করিম (৩২), প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকতা, মাসিক আয়: ৮০০০/= ২. মো: রাকিবুল ইসলাম (৩০), অপসোনিন কোম্পানিতে চাকরি, মাসিক আয় ১৫০০০/= ৩. মো: রাসেল (২৭), মুদি দোকান, মাসিক আয় ৭০০০/=
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: লক্ষ্মীপুর, ইউনিয়ন: মোল্লার হাট, থানা: হিজলা, জেলা: বরিশাল।
বর্তমান ঠিকানা	: কামরাঙ্গীচর, সেকশন, ঢাকা
দলীয় অবস্থান	: কোন দলেই সক্রিয় ছিলেন না
সর্বশেষ পড়ালেখা	: ফুলাদি সরকারী কলেজ বরিশাল, শ্রেণী: ডিগ্রী শেষ বর্ষ
আক্রান্তের তারিখ ও সময়	: ০৪-০৮-২০২৪, বেলা ১:০০টা
আক্রান্তের স্থান	: জিগাতলা, সাইন্স ল্যাব, ঢাকা
আক্রমনকারী	: বাংলাদেশ আওয়ামী-ছাত্রলীগ এবং সাবেক ঢাকা মহানগর উত্তরের ছাত্রলীগ সভাপতি মোঃ মিজানসহ তার সন্ত্রাসী সহযোগীরা
আক্রমনের ধরণ	: মাথার বামপাশে গুলি লেগে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়
শাহাদতের তারিখ ও সময়	: ১৭-০৮-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, বেলা ১৫:৫০ টায়
শাহাদাতের স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
দাফন	: নিজ বাড়িতে, লক্ষ্মীপুর, হিজলা, বরিশাল

"আমি কিছু করবো যাতে দেশ ও পরিবার আমার ওপর গর্বিত হয়"

-মমিন ইসলাম

শহীদ মমিন ইসলাম

ক্রমিক : ০৯৯

অইিডি : ঢাকা সিটি ০৯৯

জন্ম-পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

রাজধানী ঢাকার প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা কমার্স কলেজ'-এর একাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী শহীদ মমিন ইসলাম ভোলা জেলার চরকলমি (চরফ্যাশন) ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভক্তির হাট মাদ্রাসা গ্রামে ২০০৭ সালের ২১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জীবিকার তাগিদে বাবা মো. বাবুল ঢাকায় এসে ভাড়া বাসায় ওঠেন এবং ট্রাক-ড্রাইভারের পেশা গ্রহণ করেন। **"দিন আনি দিন খায়"** পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মেধাবী তরুণ মমিন ইসলাম এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত কলেজ 'ঢাকা কমার্স কলেজ'-এ। স্বপ্ন ছিল পরিবারকে দারিদ্র্যমুক্ত করার। সফল ব্যবসায়ী হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতেও ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। কিন্তু মাত্র ১৭ বছর বয়স্ক শহীদ মমিন ইসলামের জীবন কেড়ে নেয় ঘাতকের বুলেট। সব স্বপ্ন, বৃদ্ধ দাদা-দাদি, বাবা-মা আর অতি আদরের দুই বোনকে রেখে পরপারে পাড়ি জমান ঘাতকের বুলেট ধারণ করে শহীদ মমিন ইসলাম।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা সরকার এদেশের মানুষের ওপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে গুম -খুন- হত্যা- সন্ত্রাস-লুটপাট আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল তারা। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ভারতের পদলেহনকারী খুনি হাসিনা সরকার বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে এবং গণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে পুরো দেশব্যাপী ভীতি ও ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ডোবা-খাল-বিল যখন লাশের গন্ধে মাতোয়ারা, গণমাধ্যমগুলোর টুটি চেপে ধরা হয়েছিল, পেটিকোট আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের কর্তা ব্যক্তিদের ফাঁসি দিয়ে বিচারিক হত্যাকান্ড চালানো হচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল এই জগদ্দল পাথরকে জাতির বুক থেকে নামানো যেন অসম্ভব। ঠিক সেই সময়ে পচা শামুকে পা কাটার মত মীমাংসিত কোটা ইস্যু সামনে আনে জালেমশাহীর কর্তাব্যক্তি খুনি হাসিনা।

হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে আপিল বিভাগ স্থগিতাদেশ প্রদান করলে কোটাবিরোধী ছাত্ররা মাঠে নেমে এর প্রতিবাদ করে। প্রথমে এ আন্দোলনকে খুনি হাসিনা অপরাপর আন্দোলনের মতো 'ডান্ডা মেরে ঠান্ডা' করার নীতি গ্রহণ করে। গণধিকৃত ছাত্রলীগ ও পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হয় কোটা বিরোধী আন্দোলনে সংগ্রামরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে হাসিনা তার স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে শুরু করে। বিশেষ করে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের রাজাকার আখ্যায়িত করলে তা আগুনে ঘি ঢালার কাজ করে। আন্দোলন বেগবান আরো হয়।

আন্দোলনের একপর্যায়ে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্র আবু সাঈদকে সরকারের পেটুয়া বাহিনী গুলি করে হত্যা করলে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে।

শুরু থেকে আন্দোলনে শহীদ মুমিন ইসলাম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের প্রথম ধাপে তিনি টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেটে আঘাতপ্রাপ্তও হন। আন্দোলনও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ৫ই আগস্ট, খুনি হাসেনা হতাহতের দায় স্বীকার করে সেনাপ্রধানের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে দিল্লিতে পাড়ি জমায়।

পুরো দেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীনতা অর্জন করে স্বৈরশাসকের নাগপাশ হতে। হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে গেলেও তার পেটুয়া বাহিনী হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রাখে। মুক্তির আনন্দে উদ্বেলিত মানুষের মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যার মহোৎসবে মেতে উঠে। শহীদ মুমিনও সেই বিজয় মিছিলে শামিল হয়েছিলেন। মিছিল চলাকালেই শহীদ মুমিন ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পুলিশ একেবারে কাছ থেকে শহীদ মুমিনের বুকে গুলি করে। বিকেল পাঁচটায় গুলিবিদ্ধ হবার মাত্র ১৫ মিনিট পর মা বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান এবং দুই বোনের অতি ভালবাসার ভাই শহীদ মমিন ইসলাম মহান প্রভুর সান্নিদ্ধে চলে যান।

শহীদ হবার পর স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

তার অকাল মৃত্যুতে স্বজনরা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তার মা বলেন, "ছেলেটা চলে গেছে কিন্তু রেখে গেছে অনেক।"

বৃদ্ধ দাদা রতন বেপারী বলেন, "আমার মোট ৯ জন নাতি। নাতিরা দাদার কবর দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দাদারা নাতিদের কবর দিচ্ছে। আমার নাতিরে যারা মেরেছে আল্লাহ তাদের বিচার করো।"

দাদি রাবিয়া বেগম বলেন, "আমার নাতি ছোটবেলায় মরতো কোন আফসোস থাকত না। এত বড় হয়ে মরল এই কষ্ট আমি কোথায় রাখি। আমি এর কঠিন বিচার চাই।"

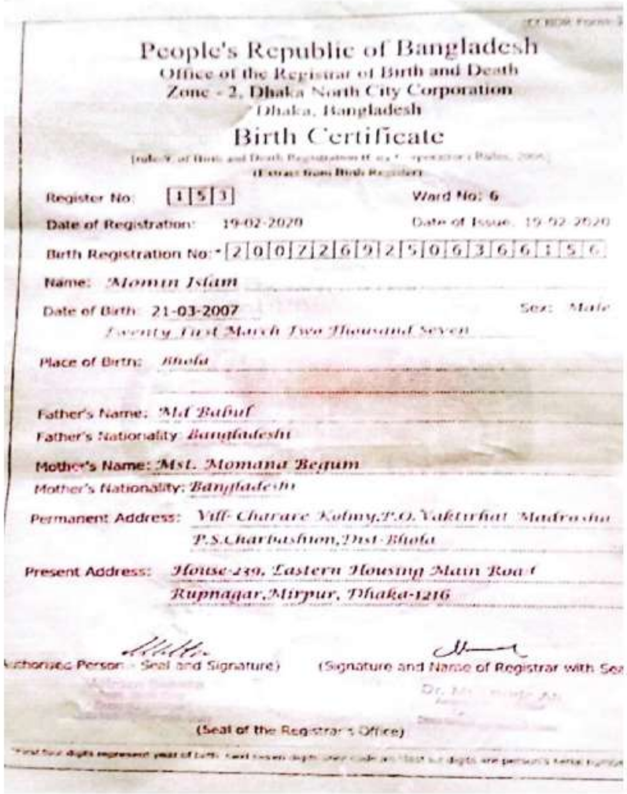

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Zone - 2, Dhaka North City Corporation
Dhaka, Bangladesh

Birth Certificate

(Extract from Birth Register)

Register No: 153 Ward No: 6

Date of Registration: 19-02-2020 Date of Issue: 19-02-2020

Birth Registration No: 20072692506366156

Name: Momin Islam

Date of Birth: 21-03-2007 Sex: Male

Twenty First March Two Thousand Seven

Place of Birth: Bhola

Father's Name: Md Babul

Father's Nationality: Bangladeshi

Mother's Name: Mst. Momana Begum

Mother's Nationality: Bangladeshi

Permanent Address: Vill- Charare Kolmy,P.O. Vaktirhat Madrasha P.S.Charbashion,Dist-Bhola

Present Address: House-239, Eastern Housing Main Road Rupnagar,Mirpur, Dhaka-1216

(Authorised Person - Seal and Signature) (Signature and Name of Registrar with Seal)

(Seal of the Registrar's Office)

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মমিন ইসলাম
জন্ম	: ২১ মার্চ ২০০৭
পেশা	: ছাত্র
জেলা	: ভোলা
পিতার নাম	: মো: বাবুল
পিতার পেশা	: ট্রাক চালক
মাতার নাম	: মোমেনা বেগম, মাতার পেশা: গৃহিণী
ভাই-বোন	: এক ভাই, দুই বোন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-ভক্তির হাট মাদ্রাসা, ইউনিয়ন: চরকলমি চার নং ওয়ার্ড, থানা: দক্ষিণ আইচা, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: বাড়ি-২৩৯, ইস্টার্ন হাউজিং মেইন রোড, থানা: রুপনগর মিরপুর, ঢাকা
শহীদ হওয়ার স্থান	: মিরপুর ২ নং থানা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
সময়	: বিকাল পাঁচটা
আঘাতের ধরন	: পুলিশ কর্তৃক বুকে গুলি
সর্বশেষ পড়াশোনা	: একাদশ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: ঢাকা কমার্স কলেজ

শহীদের পরিবারের প্রতি সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

: ১. পরিবারটির একটি স্থায়ী উপার্জনের উৎস তৈরি করে দেওয়া।

নিজের নামকে শহীদি নাম দ্বারা অলংকৃত করলেন ১৮ মাস বয়সী কন্যা সন্তানের বাবা মোঃ সোহেল রানা

শহীদ সোহেল রানা

ক্রমিক : ১০০

আইডি : ঢাকা সিটি ১০০

শহীদের পরিচয়

মোঃ সোহেল রানা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০০২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার দেওলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ভূইয়া পাড়া শিউলি বাড়ি গ্রামে। জীবন জীবিকার তাগিদে সোহেল রানা নিজের জন্মভূমি ছেড়ে পাড়ি জমান স্বপ্নের শহর ঢাকাতে। স্ত্রী, শিশু কন্যা ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকতেন ঢাকার আদাবর এলাকায়। আদাবরের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করে বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে কোন মতে নিজের সংসার চালিয়ে নিচ্ছিলেন। এদিকে লাল সবুজের পতাকার দেশ তখন কোটা সংস্কার আন্দোলনের জোয়ারে ভাসছে। ঘাতক সরকার ছাত্রদের প্রাণের ও যৌক্তিক দাবিকে উপেক্ষা করলে প্রথম পর্যায়ের কোটা সংস্কার আন্দোলন বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রূপ লাভ করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই আন্দোলন এক দফা তথা সরকার পতনের আন্দোলনে ধাবিত হয়।

শহীদের মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ

স্মরণীয় ৫ আগস্টে গত ১৭ বছরের নির্মম নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম, নিষ্পেষণ ও স্বাধীনতা হীনতার আধার শেষে স্মরণকালের সর্বনিকৃষ্ট কুখ্যাত স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশ থেকে পলায়নের সংবাদ যখন সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে তখন এদেশের আপামর জনসাধারণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্বোপরি দেশের সকল স্তরের মানুষ তাদের বুকে চেপে বসা জগদ্দল পাথরের থেকে মুক্তির নৈসর্গিক আনন্দে রাজপথে নেমে আসে। অন্যান্য সকলের মত সোহেল রানা ও বাহির হয়েছিলেন দীর্ঘদিনের কুক্ষিগত স্বাধীনতার নৈসর্গিক নির্যাস উপভোগ করার জন্য কিন্তু ঘাতকের থাবা যে তখনো শেষ হয়ে যায়নি সেটার জলজ্যান্ত প্রমান আমাদের শহীদ মোঃ সোহেল রানা।

সকলের সাথে স্বাধীনতার নতুন সূর্যের আবেশে রাজপথে নেমে উল্লাস করার জন্য যখনই মাত্র সে এবং তার মতো অনেকে আদাবর থানার সামনে দিয়ে এগিয়ে চলছিল তখনও ঘাতকের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী স্বাধীনতার আবেশে মত্ত মুক্তিকামী মানুষের দাবিকে উপেক্ষা করে তাদের ওপরে নির্বিচার ও নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ঘাতকের এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণে সোহেল রানা গুলিবিদ্ধ হন। ঘাতকের ছোড়া তিনটি বুলেট সোহেলের সিনা ভেদ করে বাহির হয়ে যায় এবং একটি বুলেট শহীদের বাম চোখ বিদ্ধ করে। সাথে সাথেই সোহেলের তাজা রক্ত এই সবুজ জমিনকে লাল করে দেয়, গুলিবিদ্ধ সোহেল ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং এই বাংলাদেশের পতাকার যৌক্তিকতা আবারো প্রমাণ করে দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী এদেশের নির্মল বাতাসের স্বাদ নেয়ার আগেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরকালের জন্য।

শহীদের স্ত্রীর ভাষ্যমতে, তাঁর স্বামীর গুলি লাগার পরে সেখানে থাকা আন্দোলনকারী ছাত্ররা তাঁর স্বামীকে দ্রুত সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নেয়ার পরে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহেল রানাকে মৃত হিসেবে সনাক্ত করে এবং জানায় যে, সে ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী আরো জানান যে, তাদের কাছে কোন ফোন ছিল না এজন্য তাঁরা সোহেল রানার এক বন্ধুর মাধ্যমে সরাসরি সোহেল রানার মৃত্যুর সংবাদ জেনেছিলেন। এরপর তাঁরা দ্রুত সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে যায় এবং সেখানে সোহেল রানাকে হাসপাতালের বারান্দার একটি বেডের উপরে পড়ে থাকে দেখেন। তারপর ডাক্তার তাদের কয়েকটি মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে লাশ নিয়ে চলে যেতে বলে। তাঁরা লাশের পোস্টমর্টেম না করে আঞ্জুমান মফিদুল হক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় লাশের গোসল ও কাফন শেষে আদাবরে প্রথম জানাযা সম্পন্ন করে শহীদের লাশ নিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়ি ভোলার উদ্দেশ্য রওয়ানা করে। পরের দিন অর্থাৎ ৬ আগস্ট আসরের নামাজের পরে দ্বিতীয় জানাজা শেষে শহীদকে তাঁর নিজের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশী/বন্ধু/সহপাঠী/নিকটাত্মীয়দের মন্তব্য/বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদের স্ত্রী সেলিনা বেগমের ভাষ্য, "তাঁর স্বামী অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ ছিলেন। তিনি সমস্ত প্রকারের যৌক্তিক আন্দোলনে প্রথম থেকেই শামিল হতেন যদিও তিনি লেখাপড়া করার খুব বেশি সুযোগ পান নি কিন্তু তিনি সবসময় লেখাপড়া করতে চাইতেন এবং ছাত্রদের দাবির সাথে একত্বতা পোষণ করতেন। তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার দাবি করেন। একই সাথে তিনি তাঁর রেখে যাওয়া কন্যা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এর

একটি যথাযথ বিহিত করার দাবি রাখেন।"

শহীদের শ্যালক মোঃ ইরশাদুল ইসলাম বলেন, "তাঁর দুলাভাই সর্বদা যৌক্তিক আন্দোলনে শামিল হতেন। ইতোপূর্বে ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন সহ সমস্ত যৌক্তিক আন্দোলনে সে শামিল হয়েছিল। আর ২৪ এর আন্দোলনে সে তাঁর কাজের ফাঁকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করত আন্দোলনে শামিল থাকার। সে লেখাপড়ার প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী ছিল।"

আদাবর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মুঠোফোনে বলেন, "সোহেল রানা তাদের অধীনেই কাজ করতো। সর্বদা হাস্যজ্জ্বল, সদালাপী সোহেল রানা অত্যন্ত কর্মঠ এবং দায়িত্ববান একজন ছেলে ছিল। তাঁর সকলের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার চান। এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত করে সোহেল রানার রেখে যাওয়া ১৮ মাস বয়সী কন্যা সন্তানের ভবিষ্যৎ সুসংহত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করার দাবি জানান।"

শহীদের পরিবার সম্পর্কে বিশেষ তথ্য

১। শহীদের গ্রামের বাড়িতে কোন বাড়ি-ঘর নেই।
২। শহীদের বিধবা স্ত্রী সেলিনা বেগম বর্তমানে তাঁর ১৮ মাস বয়সি কন্যা সন্তান তৈয়্যেবাকে সাথে নিয়ে নিজের বাবার বাড়ি চুয়াডাঙ্গাতে অবস্থান করছেন।

শহীদের পরিবারের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবরণঃ

শহীদের পরিবারের বাড়িতে ভিটেবাড়ি সংশ্লিষ্ট সামান্য পরিমাণ জমি আছে। আনুমানিক ১০ শতাংশ। সোহেল রানা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বর্তমানে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে সোহেল রানার বিধবা স্ত্রী এবং তাঁর রেখে যাওয়া ১৮ মাস বয়সী কন্যা তাঁর স্ত্রীর বাবার বাসাতে একপ্রকার মানবেতর জীবনযাপন করছে।

শহীদের পরিবারকে সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনাঃ

শহীদ সোহেল রানার পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় সুতরাং তাঁর পরিবারের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। বলে রাখা ভালো যে, সোহেল রানার গ্রামের বাসা বরিশালের ভোলা জেলাতে কিন্তু সোহেল রানার স্ত্রীর বাবার বাসা খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে। শহীদের বিধবা স্ত্রী তাঁর ১৮ মাস বয়সী কন্যা সন্তানকে নিয়ে তাঁর বাবার বাসা চুয়াডাঙ্গাতে অবস্থান করছেন। শহীদের রেখে যাওয়া কন্যা সন্তানের জন্য বিশেষ কোন ধরনের আর্থিক ফান্ডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এটা করা অত্যন্ত জরুরী। তা নাহলে ছোট্ট শিশু তৈয়্যেবার ভবিষ্যৎ মসৃণ নাও হতে পারে। অতএব তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সুরক্ষার জন্য, তাঁর সুন্দর মত বেড়ে ওঠা, লেখাপড়ার খরচ সহ বিবিধ বিষয়ে সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য সোহেল রানার পরিবার বিশেষ আর্থিক সুবিধার দাবিদার।

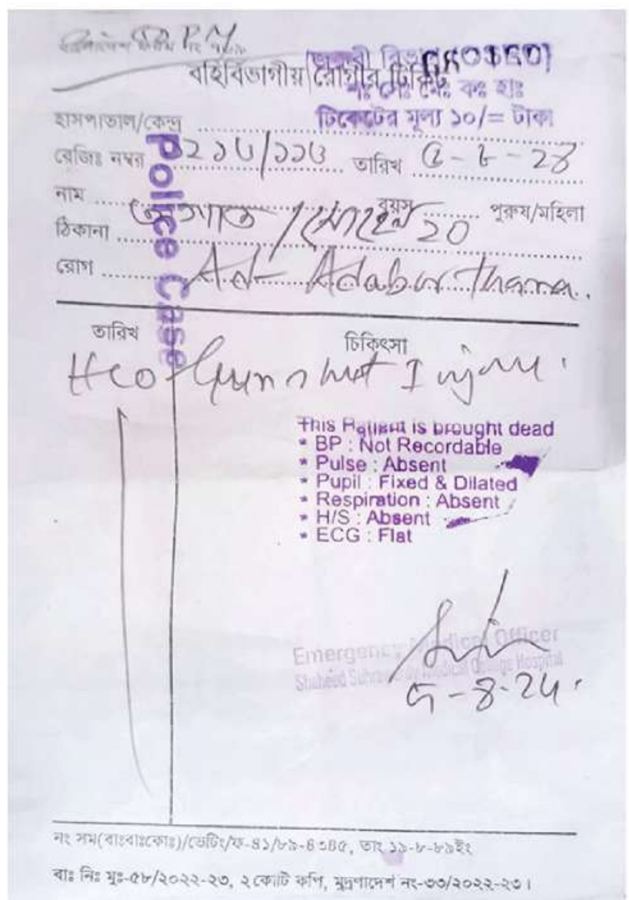
বহির্বিভাগীয় রোগীর টিকিট
টিকেটের মূল্য ১০/= টাকা
হাসপাতাল/কেন্দ্র
রেজিঃ নম্বর ২১৬/১১৬ তারিখ ৫-৮-২৪
নাম
বয়স 20 পুরুষ/মহিলা
ঠিকানা
রোগ
Police Case
তারিখ
চিকিৎসা
This Patient is brought dead
* BP : Not Recordable
* Pulse : Absent
* Pupil : Fixed & Dilated
* Respiration : Absent
* H/S : Absent
* ECG : Flat
Emergency Medical Officer
৫-8-24
নং সম(বাঃবাঃকোঃ)/ভেটিং/ফ-৪১/৮৯-৬৩৪৫, তাং ১১-৮-৮৯ইং
বাঃ নিঃ মুঃ-৫৮/২০২২-২৩, ২ কোটি কপি, মুদ্রণাদেশ নং-৩৩/২০২২-২৩।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সোহেল রানা
পিতা	: মৃত আব্দুল হক
মাতা	: শাফিয়া খাতুন, পেশায় গৃহিণী
পেশা	: পোশাক শ্রমিক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভুইয়াপাড়া শিউলি বাড়ি, ইউনিয়ন: ৩ নং দেওলা, থানা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: শনির বিল, এলাকা: আদাবর, থানা: ঢাকা, জেলা: ঢাকা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
ঘটনার স্থান	: আদাবর থানার সামনে
আক্রমণকারী/ঘাতক	: আদাবর থানার পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪ আনুমানিক বিকাল ৫.০০ ঘটিকা
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক বিকাল ৫:২০ ঘটিকা
শহীদের দাফনের স্থান	: ভোলার নিজ বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়

শহীদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা : ৪

: ১। স্ত্রী, নাম: সেলিনা বেগম, বয়স: ১৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী, পেশা: গৃহিনী

: ২। মেয়ে, নাম: তৈয়্যেবা, বয়স: ১৮ মাস

: ৩। মা, নাম: শাফিয়া খাতুন, বয়স: ৫৫, পেশা: গৃহিনী

“আমি কিছু করবো
যাতে দেশ ও পরিবার আমার ওপর গর্বিত হয়”

শহীদ হাসনাইন আহমেদ

ক্রমিক : ১০১

আইডি : ঢাকা সিটি ১০১

জন্ম-পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

১৯৯৬ সালের ১৫ মার্চ ভোলার চরফ্যাশনে জন্ম শহীদ হাসনাইন আহমেদের। পিতা আলমগীর (মৃত) এবং মা হাসিনা বেগমের ৩ সন্তানের মধ্যে সবার বড় হচ্ছেন শহীদ হাসনাইন। কাজ করতেন আকাশ টিভির ডিস বিভাগের কর্মী হিসেবে। নিজ জেলা ভোলা হলেও পরিবার নিয়ে থাকতেন রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়ের বাজারে একটি ভাড়া বাসায়। তার পরিবারে ছিলো স্ত্রী রুমা আক্তার ও ২ বছরের মেয়ে রায়সা মনি। এছাড়া ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া বোন তানহা আক্তার মিম এবং ভাই মোহাম্মদ হোসেনও থাকতো তাদের সাথে। ১৯ জুলাই ধানমন্ডি নাইন স্টার কাবাব নামের রেস্তোরার সামনে পুলিশের গুলিতে তিনি শহীদ হন।

শাহাদাতের দিন

দেশে শুরু হয়েছিলো কোটা সংস্কার আন্দোলন। আন্দোলন দমানোর নামে স্বৈরাচার হাসিনা ছাত্রদের উপর শুরু করেছিল পাশবিক নির্যাতন। ছাত্রদের দাবী না মেনে নিয়ে তাদের আন্দোলন থামাতে নানা ধরনের পাশবিকতার আশ্রয় নেয় এই জালিম সরকার। আন্দোলনের উপর চালাতে থাকে টিয়ার শেল, রাবার বুলেট এবং ছররাগুলি। তার চেয়ে ভয়ংকর যে বিষয়টা সবাইকে হতবাক করেছে তা হলো এই স্বৈরাচার ছাত্রদের উপর নির্বিচারে তাজা গুলি চালাতে থাকে। যে গুলি গুলো ছাত্রদের বক্ষকে ঝাঝরা করতে থাকে।

১৯ জুলাইতেও সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সর্বাত্মক অবরোধ চলে। রাজধানীর প্রায় প্রতিটি জায়গায় চলতে থাকে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচী। রাজধানীর ধানমন্ডি

এলাকাতেও চলছিলো ছাত্রদের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলেন হাসনাইন আহমেদ। আন্দোলন চলমান থাকে রাত পর্যন্ত। রাত নটার দিকে হঠাৎ একটি শটগানের বুলেট এসে লাগে তার বুকে। সাথে সাথে রাইফেল থেকে ছোড়া আরেকটা বুলেট এসে তার বুক ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পরে তার দেহ। সাথে থাকা সঙ্গীরা তাকে নিয়ে যায় ইবনে সিনা হাসপাতালে। সেখানের চিকিৎসকরা তাকে অন্যত্র স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। অতপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে।

জীবনে মৃত্যুর সাথে লড়তে লড়তে রাত ১১ টায় মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে শহীদের খাতায় নাম লেখান রাজপথের বীরসেনানী হাসনাইন আহমেদ। এভাবেই আরেকটা তাজা প্রাণ কেড়ে নেয় খুনি হাসিনা। সাথে কেড়ে নেয় ২ বছরের রাইসা মনির থেকে নিজের বাবার স্নেহের পরশ। ১৫ বছরের আওয়ামী বর্বরতা এরকম হাজারো রাইসার বাবা ডাক কেড়ে নিয়েছিলো।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

ভিটেবাড়ি সংক্রান্ত মাত্র ৫ শতাংশ জমি আছে গ্রামে। ঢাকা মোহাম্মদপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। শহীদের মা একটি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য খাবার রান্না করে দেন। সেখান থেকে মাসিক ৬০০০ টাকা বেতন পান। ছেলেকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন তার মা।

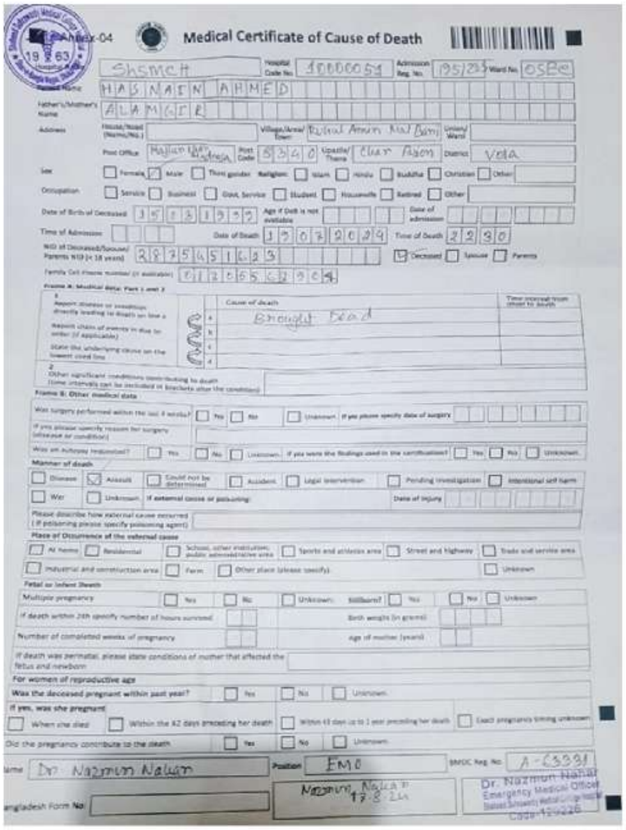

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital: ShSMCH — Hospital Code No: 10000059 — Admission Reg. No: 195123 — Ward No: OSEC

Deceased Name: HASNAEN AHMED

Father's/Mother's Name: ALAMGIR

Address: Village/Area/Town: Rubal Amin Mal Bari — Post Office: Hajiur Hat — Post Code: 8340 — Upazila/Thana: Char Fashon — District: Vola

Sex: Male

Date of Birth of Deceased: 15 12 1999

Date of Death: 19 07 2024 — Time of Death: 22 30

Cause of death: a. Brought Dead

Manner of death: Assault

Name: Dr. Nazmun Nahar — Position: EMO — BMDC Reg. No: A-63391

Signature: Nazmun Nahar 17.8.24

Dr. Nazmun Nahar, Emergency Medical Officer

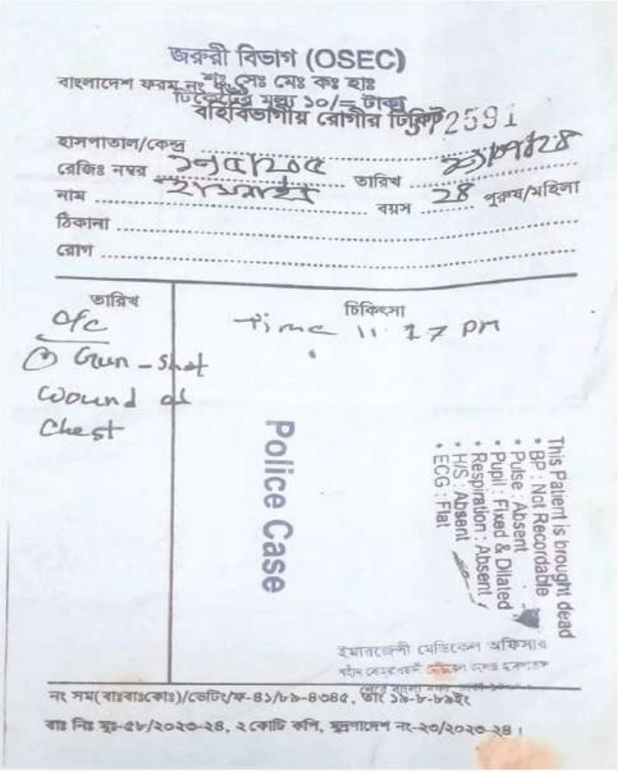

জরুরী বিভাগ (OSEC)

বাংলাদেশ ফরম নং স্বাঃ সেঃ মেঃ কঃ হাঃ

টিকেটের মূল্য ১০/= টাকা

বহির্বিভাগীয় রোগীর টিকেট 2591

হাসপাতাল/কেন্দ্র

রেজিঃ নম্বর ১৭৫৮২০৫ তারিখ 20/07/24

নাম হাসনাইন বয়স 28 পুরুষ/মহিলা

ঠিকানা

রোগ

তারিখ

Ofc

Gun-shot wound at Chest

চিকিৎসা

Time 11.17 pm

Police Case

This Patient is brought dead
- BP : Not Recordable
- Pulse : Absent
- Pupil : Fixed & Dilated
- Respiration : Absent
- H/S : Absent
- ECG : Flat

ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার

নং সম(বাঃবাঃকোঃ)/ভেটিং/ফ-৪১/৮৯-৪৩৪৫, তাং ১৯-৮-৮৯ইং

বাঃ নিঃ মুঃ-৫৮/২০২৩-২৪, ২ কোটি কপি, মুদ্রণাদেশ নং-২৩/২০২৩-২৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: হাসনাইন আহমেদ

Name: HASNAIN AHMED

পিতা: আলমগীর

মাতা: হাসিনা বেগম

Date of Birth: 15 Mar 1999

ID NO: 2875451623

এক নজরে শহীদ হাসনাইন

পূর্ণনাম	: হাসনাইন আহমেদ
জন্ম তারিখ	: ১৫-৩-১৯৯৯
জন্মস্থান	: ভোলা জেলার শ্রীধরগুর নই গ্রাম
পেশা	: চাকরি
পিতা	: মো: আলমগীর
মাতা	: মোসা: হাসিনা বেগম
স্ত্রী	: মোসা: রুমা আক্তার
বর্তমান ঠিকানা	: মোহাম্মদপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রুহুল আমিন মাল বাড়ি, ইউনিয়ন: বাকের চর, থানা: চরফ্যাশন , জেলা: ভোলা
আহত হওয়ার স্থান	: স্টার কাবাবের সামনে, ধানমন্ডি
শহীদ হওয়ার স্থান	: হাসপাতাল
ঘাতক	: পুলিশ
আঘাতের ধরন	: গুলি
গুলিবিদ্ধের তাং ও সময়	: ১৯ জুলাই, ২০২৪ রাত ৯.০০ টা
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ১৯ জুলাই, ২০২৪ রাত ১১.০০ টা
সহযোগিতার প্রস্তাবনা	: ১ শহীদের এতিম কন্যা সন্তানের প্রতিপালনে যাবতীয় খরচ বহন করা
	: ২ ৭ম শ্রেণী পড়ুয়া শহীদের ছোটো বোনের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

শহীদ মোঃ সোহাগ

ক্রমিক : ১০২

আইডি : ঢাকা সিটি ১০২

জন্ম-পরিচিতি

হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এক অকুতোভয় বীর সৈনিক মেধাবী ছাত্র ও হাফেজী মাদ্রাসার শিক্ষার্থী শহীদ মোঃ সোহাগ। তিনি ১ জানুয়ারি ২০০৫ সালে ভোলা জেলার অন্তর্গত হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের চরফকিরা গ্রামে এক দিনমজুরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে স্বপ্ন বুনতে থাকেন। স্বৈরাচার খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনী কতৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে হঠাৎ অকালে মারা যাওয়ার দরুন কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। যার ফলে পুরো পরিবারে হতাশা নেমে আসে। তাঁর পিতা সালাউদ্দিন পেশায় একজন দিনমজুর এবং মাতা শাহনাজ গৃহিণী। সোহাগের ছোট এক ভাই ও এক বোন আছে।

ব্যক্তিগত জীবন

রিয়াজ একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার্থী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী রিয়াজ হাফেজী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছিলেন। মাদ্রাসার বন্ধুদের মধ্যে তাঁর প্রতিভা এবং আদর্শবান জীবনের কারণে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। শিক্ষাজীবনে তার লক্ষ্য ছিলো ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমাজের উন্নয়ন এবং ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করা।

পারিবারিক অবস্থা

মো: সোহাগের গ্রামে বাড়ি ভিটা আছে কিন্তু কোন ঘর বাড়ি নাই। তাঁর পরিবার ঢাকায় থাকেন ১৪ বছর ধরে। শহীদের পিতা দিন মজুরের কাজ করেন। তাঁর বড় ভাই রাব্বী ৮ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করেন। নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে শহীদ সোহাগের পরিবার কায়ক্লেশে দিন গুজরান করছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ছাত্ররাই অজেয়-এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। এ সফলতা যতটা না স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বৈকল্যকে চলাকালীন তুলে ধরেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে ঘাতক আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে।

আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

'সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' এর মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহীত। এ শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলে নেতৃত্ব দেয় তরুণ ছাত্র-জনতা। একজন সচেতন ছাত্র দেশ ও জাতির সক্রিয় কার্যকর প্রতিবাদী জনশক্তি। এ তরুণ ছাত্র সমাজ যখন কোনো যৌক্তিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তখনই তাদের যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনুভব করে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকুতোভয় শহীদ মো: সোহাগ। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নিজ অবস্থান নিশ্চিত করেন। পরিবারের অভাব অনটন মাথায় রেখে স্বপ্নবাজ ও তরুণ প্রজন্মের আদর্শ শহীদ সোহাগের তাজা প্রাণ এত নির্মমভাবে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিদায় নেবে তা ছিল কল্পনাতীত।

শাহাদাত বরণ

স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার ক্ষমতার মসনদ ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে মুক্তিকামী ছাত্র জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; নেমে আসে রাজপথে। জনমনে দীর্ঘদিনের ছাই চাপা আগুন স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। রাজপথ উত্তাল হয় ছাত্র জনতার বজ্রকণ্ঠের হুংকারে। শোষক গোষ্ঠীর লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র ঘাতক বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থানে নিরীহ, নিরস্ত্র বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার 'এক দফা এক দাবি খুনি হাসিনা তুই কবে যাবি'। ১৯ জুলাই ২০২৪। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলন পল্টন এলাকায় অবস্থান নেয়। এ আন্দোলনের স্মমুখভাগে নেতৃত্ব দিতে থাকে বীর যোদ্ধা মেধাবী ছাত্র সোহাগ।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে মুক্তিকামী ছাত্র জনতার উপর চড়াও হয় জুলুমবাজ সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশ বাহিনী; শুরু করে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ। এমতাবস্থায় গোটা এলাকা মুহুর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আন্দোলন চলাকালীন আনুমানিক দুপুর ১২:০০ টায় ঘাতক পুলিশের ছোঁড়া গুলি রিয়াজের মাথায় লাগে। তেজোদ্দীপ্ত সোহাগ সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। প্রতিকূল যুদ্ধের ময়দান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় সোহাগের সাথের আন্দোলনকারী বন্ধুরা দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন দেখা দেয় রক্তের। এক ব্যাগ রক্ত এবং দুই ব্যাগ স্যালাইন দেওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। দুপুর ২:৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে হাসপাতালের বিছানায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানাযা ও দাফন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে শহীদ সোহাগ নিজের বলিষ্ঠ আদর্শকেই প্রতিফলিত করেছিলেন। তবে অভিযোগ আছে যে, সোহাগের মরদেহ দুই দিন পর্যন্ত পরিবারের হাতে পৌঁছায়নি। অবশেষে, তার মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায় এবং নিজ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নামাজে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণকারীরা শহীদের জন্য চোখের পানি ফেলেছে এবং এলাকার মানুষ এই হত্যার জন্য কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে বিপ্লবী শহীদ সোহাগের মতো যুবকদের সাহসিকতা সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার।

শোকাচ্ছন্ন নিকটজন

সোহাগের মৃত্যুতে তার পরিবার এবং সহপাঠীরা শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে তার পরিবার, যারা ১৪ বছর ধরে ঢাকায় বসবাস করছে, এই শোক সহ্য করতে পারছে না। শহীদের পিতা একজন দিনমজুর, আর বড় ভাই রাব্বী মাত্র ৮ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করেন। তাদের গ্রামের বাড়ি ভোলার হাজারীগঞ্জের শশীভূষণ এলাকায়, যেখানে একটি ভিটা রয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো স্থায়ী ঘরবাড়ি নেই। দারিদ্রের সাথে লড়াই করেও রিয়াজ তার পরিবারকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিলো, কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূর্ণতা পেল না।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ সোহাগের মামী ফাতেমা তাঁর সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, সোহাগ একজন ভালো ছাত্র ছিল। সে মাদ্রাসায় হাফেজি পড়েছিল। অভাব অনটনের কারণে সে ঢাকায় গিয়ে ছোট খাটো চাকরি নিয়েছে।

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র
1023
পৃষ্ঠা নং-
সুত্র নং রামপুরা থানা, ডি.বি./ইউ.ডি. মামলা নং ১০২৭ তারিখ ২০/০৭/২৪ইং
মৃতের নাম মোঃ সোহাগ
ঠিকানা
পিতা/স্বামীর নাম সালাউদ্দিন
লিংগ-পুরুষ/মহিলা বয়স (১৭) বৎসর/মাস
ধর্ম-মুসলমান/হিন্দু/বৌদ্ধ/খৃষ্টান
ময়না তদন্ত নং ৩০৭০/২০২৪ইং তারিখ ২১/০৭/২৪ইং
ময়না তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম
পদবী

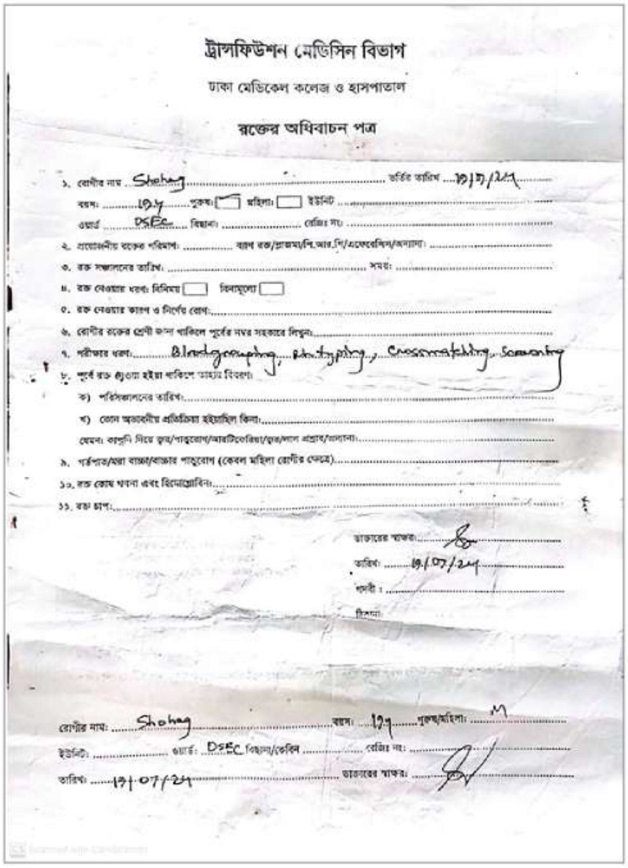
ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
রক্তের অধিবাচন পত্র
১. রোগীর নাম Shohag ভর্তির তারিখ 19/7/24
বয়স 17y পুরুষ মহিলা ইউনিট
ওয়ার্ড DSEC বিছানা রেজিঃ নং
৭. পরীক্ষার ধরন Bloodgrouping, Rh-typing, Crossmatching, Screening
ডাক্তারের স্বাক্ষর
তারিখ 19/07/24
পদবী
ঠিকানা
রোগীর নাম: Shohag বয়স: 17y পুরুষ/মহিলা: M
ইউনিট: ওয়ার্ড: DSEC বিছানা/কেবিন রেজিঃ নং:
তারিখ: 19/07/24 ডাক্তারের স্বাক্ষর:

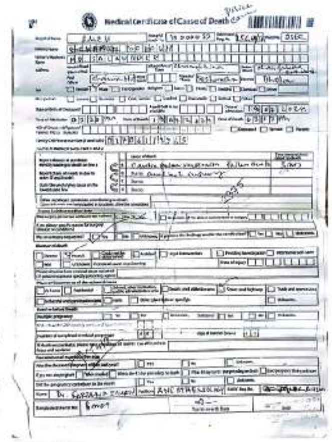

এক নজরে শহীদ হাসনাইন

নাম	: মো: সোহাগ
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-২০০৫
জন্মস্থান	: ভোলা
পেশা	: ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরফকিরা ৫নং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন: হাজারীগঞ্জ, থানা: শশীভূষণ, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: বাঁশতলা, গুলশান-২ ঢাকা
পিতা	: সালাউদ্দিন, পেশা ও বয়স দিনমজুর, ৪৬
মাতা	: শাহানাজ, পেশা ও বয়স: গৃহিণী, ৪১
ঘটনার স্থান	: পল্টন
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, দুপুর ১২ টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, দুপুর ২.৩০ টায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
কবরের অবস্থান	: ভোলা জেলার অন্তর্গত হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের চরফকিরায় নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থান
ভাই	: রাব্বি, বয়স ১৫, দোকানে চাকরি
বোন	: সোহানা, বয়স: ৭, ছাত্রী

সম্ভাব্য প্রস্তাবনা
: দরিদ্র পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা
: শহীদের দিনমজুর বাবাকে স্থায়ীভাবে ব্যবসা ধরিয়ে দেয়া
: নিম্ন বেতনে চাকুরিজীবী বড় ভাইয়ের উন্নত চাকুরি দেয়া
: ছোট ভাই বোনের পড়ালেখার যাবতীয় খরচ বহন করা

“আসরের নামাজ শেষে বাসায় ফেরা হলোনা”

শহীদ আলাউদ্দিন

ক্রমিক : ১০৩

আইডি : ঢাকা সিটি ১০৩

জন্ম-পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

শহীদ আলাউদ্দিন মল্লিক ভোলা জেলার দক্ষিণ দিঘলদি ইউনিয়নের পশ্চিম বালিয়া গ্রামে ১৯৬৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে জীবন ও জীবীকার তাগিদে পাড়ি জমান ঢাকায়। মাত্র ১৩০০০ টাকার বিনিময়ে মধ্য বাড্ডার একটি বাসার সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে একরুমের একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন।

শহীদ আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তার বড় ছেলে আল-আমিন (২৩) বাবার পূর্বের কর্মস্থলে যুক্ত হয়েছেন।

শাহাদাতের ঘটনা

৫ আগস্ট ২০২৪। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হতে যাচ্ছে এই দিন। দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগের ফ্যাসিস্ট শাসন, গুম খুন, আয়নাঘর, বিচারিক হত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, লক্ষকোটি টাকা বিদেশে পাচারসহ অসংখ্য অপরাধের মূল হোতা স্বৈরাচারী হাসিনা বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে অবশেষে পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। তার সাথীরাও বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে। যারা এখনো সীমান্ত পাড়ি দিতে পারেনি তাদের বেশিরভাগই এখন আত্মগোপনে রয়েছেন। কিন্তু গত দেড়যুগ ধরে গড়ে তোলা তার সশস্ত্র পেটোয়া পুলিশ বাহিনী তখনও সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে নিরস্ত্র, নিরপরাধ জনগণের উপর।

শহীদ আলাউদ্দিন মল্লিক কর্মস্থল থেকে বের হয়ে বাসার নিকটস্থ মসজিদে আসর নামাজ আদায়ের পর ব্যক্তিগত কাজের উদ্দেশ্যে বের হলে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতা ও পেটোয়া পুলিশের ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার মধ্যে পড়ে যান।

এক পর্যায়ে পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের উপর নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করলে আলাউদ্দিন মল্লিক গুলিবিদ্ধ হন। ঘাতকের বুলেট সরাসরি তার মাথায় আঘাত করে, মল্লিক লুটিয়ে পড়েন রাজপথে। রাজপথের কালো পিচ তার রক্তে রঙ্গিন হয়ে উঠে। হৃদয়ের

ধুকপুক তখনও একেবারে থেমে যায়নি। রাস্তা থেকে তাকে উদ্ধার করে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন ৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত চলে চিকিৎসকদের সর্বাত্মক চেষ্টা। অবশেষে রব তার বান্দাকে নিজের কাছে ডেকে নেন, চিরতরে থেমে যায় হৃদয়ের ধুকপুক। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন।

শহীদ সম্পর্কে তার নিকটাত্মীয়র বক্তব্য

আমার ভগ্নিপতি মারা যাওয়ায় আমার বোনের পরিবার এখন বিপদগ্রস্ত। তিন সন্তান নিয়ে এখন তিনি দিশেহারা, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা জানা নেই। আমার ভগ্নিপতিকে যারা খুন করেছে তাদের বিচার চাই।

City Care General Hospital & Diagnostic Center

DEATH CERTIFICATE

Certificate No: 20240801 Issue Date: 06-08-2024 UHID: 774
Name: MD. ALAUDDIN Gender: Male
Date Of Birth: 06-08-1969 Date Of Death: 06-08-2024 Time Of Death: 06:00 am
Religion: Islam Nationality: BANGLADESHI
Father Name: KANCHAN MALLIK Mother Name: MONOWARA BEGUM
Contact Name: BIBI KULSUM Contact Number: 01772804788
Address: BHOLA SADAR, Bhola Sadar, Bhola Sadar, Bhola
Name (Dead Body Taken): BIBI KULSUM Mobile (Dead Body Taken): 01772804788
Address (Dead Body Taken): MODHHOM BADODA DHAKA
Date: 06-08-2024 Time: 06:00 am
Cause Of Death: Irreversible cardio-respiratory failure due to gun shot injury penetrating skull & brain parenchyma
Certifying Doctor: Dr. Md. Didar Ur Rashid

এক নজরে শহীদ আলাউদ্দিন মল্লিক

নাম	: আলাউদ্দিন
জন্ম তারিখ	: ২৪-০৯-১৯৬৭
পিতা	: মো: কাঞ্চন মল্লিক
মাতা	: মোসা: রোকেয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম বালিয়া, ইউনিয়ন: দক্ষিণ দিঘলদী, থানা: সদর থানা, জেলা: ভোলা
সন্তান	: দুই ছেলে এক মেয়ে
পেশা	: বাসার সিকিউরিটি
ঘটনার স্থান	: মধ্য বাড্ডা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫-০৮-২০২৪ বাদ আছর
শাহাদাতের সময়কাল	: ০৬-০৮-২০২৪ সকাল ১১টা, ঢাকা মেডিকেল
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রামে প্রতিবেশীর জায়গায়
পরিবার সংক্রান্ত তথ্য	: নাম আল আমিন (২৩), বড়ছেলে, বর্তমানে বাবার কর্মস্থলে নিয়োজিত
কুলসুম	: বিবাহিত
ইয়ামিন	: ছোট ছেলে, ২৬ পারা হাফেজ
প্রস্তাবনা ১	: শহীদের হাফেজী মাদরাসায় পড়ুয়া ছেলে রয়েছে তার পড়াশোনার খরচ বহন করতে পারলে ভালো হয়

শহীদ সাব্বির হোসেন রনি

ক্রমিক : ১০৪

আইডি : ঢাকা সিটি ১০৪

জন্ম-পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

পুরো নাম সাব্বির হোসেন রনি। ২৫ জুলাই ২০০১ সালে ঢাকা জেলায় জন্ম গ্রহন করেন। মা রাশেদা বেগম এবং বাবা মহিউদ্দিনের ২ সন্তানের মধ্যে ছোট ছিলেন রনি। তিনি হারুন মোল্লা ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০২৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। রাজধানী ঢাকার মিরপুর-১২ এলাকায় মা বাবার সাথেই বসবাস করতেন।

বেড়ে উঠা

সাব্বির হেসেনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকাতেই। বাবা-মা এবং বড় বোন তাহমিনার স্নেহ-ভালোবাসায় শৈশব কৈশোর পার করেন রনি। ২০২৩ সালে এইচ এসসি পরীক্ষায় উত্তির্ণ হন। পরিকল্পনা করেছিলেন বিদেশে পাড়ি জমানোর। একই সাথে, দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার জীবন-যাপন ছিলো সাধাসিধে। শহরের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ আর তারুণ্যের তেজ ও দৃঢ়-প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে পা রাখেন ২৩ বছরে। এই তেজই তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল ন্যায়বিচারের দাবী নিয়ে রাজপথে নামার।

ন্যায়ের জন্য রনি

ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার সাধারণ ছাত্রদের অধিকারের সাথে ছেলেখেলা শুরু করে। ২০১৮ সালে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কোটা পদ্ধতি বাতিল হওয়ার রায়টি ২০২৪ সালে এসে পুনর্বহাল রাখা হয়। অর্থাৎ সরকারীর চাকরির ৯ম থেকে ১৩ তম গ্রেডে আবেদন করা সমগ্র চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪৪ শতাংশ নিয়োগ দেয়া হবে মেধার ভিত্তিতে ও বাকি ৫৬ শতাংশ নির্ধারণ করবে কোটার মাধ্যমে। প্রহসনের এই রায়কে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতা মাঠে নামে। মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচী, মিডিয়ায় বিবৃতি প্রদানসহ নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন হতে থাকে। একজন ছাত্র হিসেবে রনিও নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। এমন

পরিস্থিতিতে রনিকে কোনো ভাবেই ঘর থেকে বের হতে দিতে চাননি পরিবারে সদস্যরা। কিন্তু একজন নির্ভীক তরুণকে কি পারিবারিক ভালোবাসার মোহে আটকে রাখা যায়? পরিবারের বাঁধার কথা চিন্তা করে মা-বাবা কিংবা বড় বোনকে না জানিয়েই আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে রনি। রাজপথে স্লোগান তোলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে মা-বাবা বিষয়টি জানতে পারলেও তাকে আর বাঁধা দেননি। আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে। সাথে বাড়তে থাকে আওয়ামী বর্বরতা।

এলো সেই দিন

জুলাই মাস জুড়ে স্বৈরাচারী খুনি অবৈধ সরকার আন্দোলনকারীদের নির্মূল করতে ঘরে ঘরে অভিযান, গ্রেফতার, রিমান্ডে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন, মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট বন্ধ, যাতায়াতে সীমাবদ্ধতা, কারফিউ জারি, অফিস আদালতসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করাসহ নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। স্বৈরাচারী সরকারের প্রহসনমূলক এমন কর্মসূচীতে দিনে দিনে সাধারণ জনতার ক্ষোভ আরো বাড়তে থাকে। ছাত্র-জনতা ধীরে ধীরে আরো কঠোর কর্মসূচী দিতে থাকে। আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করার পর এই বিশাল গণজোয়ারের মুখে টিকতে পারেনা রক্ত পিপাসু হাসিনা। ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠে পুরো দেশ।

রাজধানীতে বিকালের এ ঘটনার আগে সকালে বিরাজ করছিল এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। একারনে রনির সকালটা ঘরেই কাঁটে। যখন শুনতে পেল সরকারের পলায়ন ঘটেছে, নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। মা বাঁধা দিলেও বাবা আশ্বাস দেয় ‘যেহেতু স্বৈরাচার আর নেই তাই ভয় কেঁটে গেছে’। এক কাজিনকে সাথে নিয়ে মিরপুর ১০-এ গেল বিজয় মিছিলে। আর কোনো বাঁধা নেই। সবাইকে বুক চিতিয়ে ঘোষনা দিচ্ছে ‘আমার দেশ স্বাধীন’। বড় বোন আর দুলাভাইকে ভিডিও কলে উচ্ছ্বসিত চোখ নিয়ে স্বৈরাচারের পতনের বার্তা বারবার দিচ্ছিলেন তিনি। বড় বোন জিজ্ঞেস করলো গণভবনের দিকে যাবে কিনা; কারন সবাই সেদিকটায় গিয়ে উদযাপন করছে। কিন্তু রনি অসম্মতি জানিয়ে বাসায় ফেরার কথা জানালেন। এরকমই তো একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের ভাবনা গুলো হয়ে থাকে। যেখানে বিজয়টাই সবচেয়ে আনন্দের উদযাপনটা নয়। তিনি বাসার পথে রওনা দিলেন।

কিন্তু কোনো এক কারণে মিরপুর-২ এ এসে সম্মুখিন হলেন বিপদের। এদিকটাতে মানুষের ভীড় কম থাকায় ঘাতক পুলিশ আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। কাঁদানে গ্যাস আর লাঠি চার্জ চলতে থাকে অবিরাম। মাঝে মাঝে গুলিও ছুড়তে থাকে তারা। হট্টগোলের মধ্যে রনি ও তার কাজিন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রনি ঢুকে পরে ২ নম্বর শপিং কমপ্লেক্সে আর তার কাজিন কাছের পাম্পের ভিতরে। এদিকে গোলাগুলি ভয়ংকর রূপ নিতে থাকে। মিনিট দশেক পর রনিকে ফোন দেয় রনির সাথে থাকা আত্মীয়।

কিন্তু রনি ফোন রিসিভ করছে না। হঠাৎ ফোনটা রিসিভ হয়। একটি অচেনা, ভয়ার্ত ও পেরেশানী কণ্ঠ ওপাশ থেকে ভেসে আসে। কথক জানায়, 'রনির গুলি লেগেছে। পুলিশরুপী নরপিশাচেরা খুব কাছ থেকে গুলি করে রনির বুক ঝাঝড়া করে দিয়েছে'।

তার সুঠাম দেহ তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে রনির আত্মীয়। তাকে জানানো হয় নিকটস্থ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি পাগলের মতো ছুটে সেখানে পৌছান। গিয়ে জানতে পারেন এখান থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে কুর্মিটোলা হাসপাতালে। সেখানে যাওয়ার পথে ফোন পায় হাসপাতাল থেকে। জানতে পারে রনি আর বেঁচে নেই। পুরো পৃথিবী তখন তার সামনে ঝাপসা হয়ে যায়। বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। নিজ দায়িত্বেই রনির মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি পৌঁছেন। দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন দেশের আলো হাওয়ায় তৃপ্তির নিঃশ্বাসটা নিতে পারলোনা শহীদ রনি। হেসে-খেলে বেড়ানো সরল জীবনটাকে এভাবেই অসময়ে শেষ করে দিলো হায়েনার দল।

শহীদ রনির পরিবারের অর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়। হাড় ও কিডনির সমস্যায় জর্জরিত মা রাশেদা বেগম ছেলের মৃত্যুশোকে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এদিকে অসুস্থতাজনিত কারণে বাবা তেমন কোনো কাজ করতে পারেননা। দোতলা বাড়িটার উপরতলার যতসামান্য ভাড়ায় তাদের সংসার পরিচালিত হয়।

টিভি সাক্ষাৎকারে বাবা মহিউদ্দিন জানান, 'তার চাওয়া শুধু একটাই। দেশের জন্য যেহেতু ছেলেটা জীবন দিয়েছে তাই দেশের মানুষ যেনো তার ছেলের জন্য দোয়া করেন'। আল্লাহ শহীদ সাব্বির হোসেন রনির পরবারকে আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও ছেলের শোকের অসীম বেদনা থেকে ধৈর্য্য ধরার তৌফিক দিন এবং শহীদ রনির এই আত্মত্যাগকে মহান রব কবুল করে নিন। আমিন।

এক নজরে শহীদ রনি

নাম	: সাব্বির হোসেন রনি
জন্ম	: ২৫.০৬.২০০১
জন্মস্থান	: মিরপুর, ঢাকা
পেশা	: ছাত্র (বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু)
শহীদ হয়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪
বাসস্থান	: স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা- ২/এ লেন ১১বি, ব্লক ডি, মিরপুর-১২, ঢাকা
বাবা	: মো: মহিউদ্দিন
মা	: রাশিদা বেগম
বোন	: (১ বোন) তাহমিনা

শহীদ মো: হাসিব আহসান

ক্রমিক : ১০৫

আইডি : ঢাকা সিটি ১০৫

পরিচয়

বুড়িগঙ্গার তীর ঘেষে পুরান ঢাকার জীর্ণশীর্ণ সুউচ দালানকোঠার মধ্যে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম শহীদ হাসিব আহসানের। দুরন্ত শৈশবের পুরো সময়টা কাটে ঢাকার অলিতে গলিতে। টানাপোড়েন সংসারে নিজের লেখাপড়া করাই ছিলো দুরূহ কাজ। মাতার অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে সংসারের ভার কাঁধে নিতে যোগ দেন রাজধানী পল্টনের একটি গাড়ির শো রুমে। স্বল্প বেতনের চাকুরিতে শহীদ হাসিব আহসানের পরিবারের অভাব যেনো নিত্যসঙ্গী।

একমাত্র উপার্জনক্ষম শহীদের ছিলো ফুটফুটে দুটি রাজকন্য। বড় মেয়ে মুসাইতা আহসান দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী। বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়ালের ৫ম শ্রেণীতে পড়তো ছোট মেয়ে সারিনা আহসান। শহীদ হাসিব আহসানের পরম চাওয়া ছিলো কলিজার টুকরো দুই মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের সেবায় নিয়োজিত করা। কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই ১৯ শে জুলাই স্বৈরাচারীর বুলেটের আঘাতে শেষ হয়ে যায় তার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

১৯ শে জুলাই ২০২৪, ছাত্রজনতার বিক্ষোভে টাল মাতাল পুরোদেশ। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী থেকে পেশাজীবী, আবাল বৃদ্ধ বণিতা যেনো আগুনের ফুলকি হয়ে স্বৈরাচারী সরকারের বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছে দ্বিধাহীনচিত্তে। যার অন্যতম স্থান ছিল ঢাকার বনশ্রী। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে এ এলাকার আপমর জনসাধারণ। ঘটনার দিন সকালে ছাত্র জনতার বিক্ষোভে জনস্রোতে পরিণত হয় বনশ্রীর সড়ক। ছাত্র জনতা এবং পেটুয়া বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান এক ভীতিকর পরিবেশের আবির্ভাব হয়। নানা বাঁধা উপেক্ষা করে ছাত্রদের বিক্ষোভ সমুদ্রে পরিণত হয়। স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বিনা উসকানিতে নিরীহ আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। গুলির শব্দে আশেপাশের এলাকা পরিণত হয় এক যুদ্ধক্ষেত্রে।

ঘটনাস্থলের পাশেই পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন হাসিব আহসান। গুলিতে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের নানা সহযোগিতার নির্দেশনা দিচ্ছিলেন বাসার বারান্দা থেকে। নিজের গন্ডির মধ্যে থেকে সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। ততক্ষণে মুহুর্মুহু গুলিতে আশেপাশের এরিয়া আহতদের স্তুপে পরিণত হয়। মুহুর্তেই দৌড়াদৌড়ি শুরু হয় আহতদের নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা দিতে। এদিকে আওয়ামী পুলিশলীগ আশেপাশের প্রতিটি বাড়ির ছাদ হতে নিরীহ নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের উপর গুলি চালায়। উপর থেকে চালানো গুলি কারো মাথায়, কারো পায়ে, কারো হাতে ভেদ করে। মুহুর্তেই এক বিভীষিকার পরিবেশ তৈরি হয়।

এমন সময় আচমকা একটি বুলেট হাবিব আহসানের সরাসরি চোখে লাগে। সাথে সাথেই দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই বাসায় কান্নার রোল পড়ে যায়। যুদ্ধাবস্থা থেকে হাসিব আহসানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটা ছিলো আরেকটা যুদ্ধের শামিল। অনেক চেষ্টার পর শ্যামলীর নিউরোসাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চারিদিক থেকে আহতদের ভীড়ে হাসপাতালে জায়গা পাওয়াটা অনেক বেশি কষ্টকর ছিলো। পরিবারের উৎকণ্ঠায় কেটে যায় তিন দিন তিন রাত। আর্থিল ভাবে অস্বচ্ছল আহসানের পরিবারের জন্য সাময়িক চিকিৎসা ব্যয় অনেকটা মাথায় আকাশ ভাঙার মতো।

অবশেষে দীর্ঘ তিন দিন **ICU** এর নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শহীদ হাসিব আহসান। চলে যান আল্লাহর জিম্মায়। পুরো পরিবারকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমান দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অগ্রপথিক শহীদ হাসিব আহসান। তার মৃত্যুতে পরিবার হয়ে পড়েন বাকরুদ্ধ ও বিপর্যস্ত। মৃত্যুর পর তার মা খালেদা বেগম গগণ বিদারী চিৎকার দিয়ে শুধু একটি কথাই বার বার বলছিলো-কেনো আমার ছেলেকে গুলি করা হলো? ও তো কোন দোষ করেনি। নির্বিকার মায়ের কণ্ঠের প্রতিধ্বনিই শুধুই বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এর কোনো জবাব আসে না। শহীদ হাবিব আহসানের মৃত্যুর মাধ্যমে অচিরেই নিভে যায় জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠা আশার প্রদীপ।

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পুরো নাম	: মো: হাসিব আহসান
জন্মতারিখ	: ১৯/০৫/১৯৭৪
পিতার নাম	: মৃত আহসান হাবিব
মায়ের নাম	: খালেদা বেগম, বয়স : ৭০ পেশা: গৃহিণী
স্ত্রীর নাম	: জেসমিন আহসান, বয়স: ৪৮
পেশা	: গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৪ জন
পরিবারের মাসিক আয়	: ২৫ হাজার টাকা
ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা	: দুই মেয়ে
১) বড় মেয়ে	: মোসা: সুমাইতা আহসান, বয়স: ২২, পেশা: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ২য় বর্ষ
২) ছোট মেয়ে	: সারিনা আহসান, বয়স: ১৩, শিক্ষার্থী: বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল
স্থায়ী ঠিকানা	: ১৯ নং সতীশ সরকার রোড, থানা: গেন্ডারিয়া, জেলা: ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: ৩ রোড, সি ব্লক, ২৫ বাসা, বনশ্রী, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: বনশ্রী, ঢাকা মেট্রোপলিটন, ঢাকা
আঘাতকারী	: সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে
আহত হওয়ার সময়	: বিকাল ৩ টা, নিজ বাসায়
নিহত হওয়ার স্থান ও সময়	: নিউরোসাইন্স হাসপাতালের আইসিইউতে রাত ২টায়
শহীদের কবরে অবস্থান	: গেন্ডারিয়া পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ জোবায়ের ওমর খান

ক্রমিক : ১০৬

আইডি : ঢাকা সিটি ১০৬

পরিচয়

শহীদ জোবায়ের ওমর খান ছিলেন এক সম্ভবনাময় তরুণ। তিনি ২০০৩ সালের ১০ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত বিনোদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র ৬ মাস পরেই মাকে হারান। মায়ের ভালোবাসা ছাড়াই বেড়ে ওঠেন। শিক্ষা জীবনে সর্বশেষ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশোনালস (বিউপি) এর আইন বিভাগে অধ্যয়নরত ছিলেন। বিইউপির ১ম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ হন।

ঘটনার বিবরণ

শহীদ জোবায়েরের পিতা একজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। নৈতিক শিক্ষা ও দেশ-জাতির প্রতি দায়বদ্ধতার শিক্ষাটি পেয়েছিলেন বাবার কাছেই। নিজেও ছিলেন আইনের ছাত্র। মানবাধিকারের বিষয়ে ছিলেন সচেতন। তাইতো যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক আসলো তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারেননি। ছাত্র-জনতার প্রাণের দাবির এ আন্দোলনে ছিলেন শুরু থেকে। সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন মিছিলে। ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে যখন তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলেন, ঠিক সে সময় যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী অস্ত্র হাতে ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরস্ত্র ছাত্ররা বাধ্য হয়ে পিছু হটতে থাকে। সে সময় শহীদ জোবায়ের দেখলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে সন্ত্রাসীরা

মারধর করছে। আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী তরুণ জোবায়ের একাই রড হাতে রুখে দাঁড়ান। উদ্ধার করেন সহযোদ্ধাকে।

শহীদ জোবায়ের রাখেন সাহসের স্বাক্ষর। অনুপ্রাণিত করেন অন্যান্য ছাত্রদের। বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে ছাত্র-জনতার দাবি চলে আসে এক দফায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন ছাত্র-জনতা অর্জন করে চূড়ান্ত বিজয়।

৫ই আগস্ট ঐতিহাসিক সেই দিনে স্বৈরাচার পতনের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে কোটি প্রাণে। এমন দিনে যাত্রাবাড়িতে বিজয়োল্লাসরত ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি করে পুলিশ। শহীদ জোবায়েরের ডান পাজরে বৃদ্ধ হয় দুটো বুলেট। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন এই মেধাবী ছাত্র।

বাবার মতো তাঁর বড়ো ভাইও একজন আইনজীবী। তাদের মতো আইনজীবী হবার স্বপ্ন পূরণ হয়নি শহীদ জুবায়েরের। কিন্তু একটি মুক্ত-স্বাধীন দেশ এনে দিতে সহযোগিতা করেছিলেন।

শহীদের বড় ভাই অ্যাডভোকেট জেআই খান পিয়াস বলেন, "জুবায়ের চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ভর্তি হওয়ার চান্স পেয়েছিল কিন্তু ঢাকায় পরিবারের সাথে থাকার জন্য আমরা তাকে বিইউপিতে ভর্তি করি। জজ হওয়ার তীব্র বাসনা থেকেই আইন বেছে নেওয়া তাঁর। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন জাতির মেধাবী এ বীর সন্তান। দোয়া করি মহান আল্লাহ যেন তাঁর আত্মত্যাগ ও শাহাদাতকে কবুল করে নেন।"

Bangladesh University of Professionals

GRADE CERTIFICATE

Bachelor of Laws (LL. B.) Honours

Batch: 2022-2023

Academic Session : Jan - Jun 2023 Examination

Name: JOBAER OMER KHAN

Roll No: 23429508036 Reg No: 109501230836 Session: 2022-2023

Faculty: Faculty of Security and Strategic Studies

Subj Code	Course Name	Semester	Cr. Hr.	Grade	Grade Pt
LAW1101	Functional English	1st	3.00	B+	3.25
LAW1102	Bangladesh and International Studies	1st	3.00	B+	3.25
LAW1103	English for Law and Interpretation of Statutes	1st	3.00	B+	3.25
LAW1104	Presentation Skill Development	1st	3.00	A-	3.50
LAW1105	Legal System of Bangladesh	1st	3.00	C+	2.50

Summary of Results									Earned Cr. Hr. Out of 15.00	CGPA	Remarks
Semester	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th			
Cr. Hr.	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00	3.15	
GPA	3.15	-	-	-	-	-	-	-			

Office of the Controller of Examinations
Bangladesh University of Professionals
Mirpur Cantonment
Dhaka-1216, Bangladesh

Prepared by

Compared by

Mohammad Humayun Kabir Bhuyan
Deputy Controller of Examinations

Result Published on: 03-Jan-2024
Issued on: 30-Apr-2024

www.bup.edu.bd E-mail: controller@bup.edu.bd

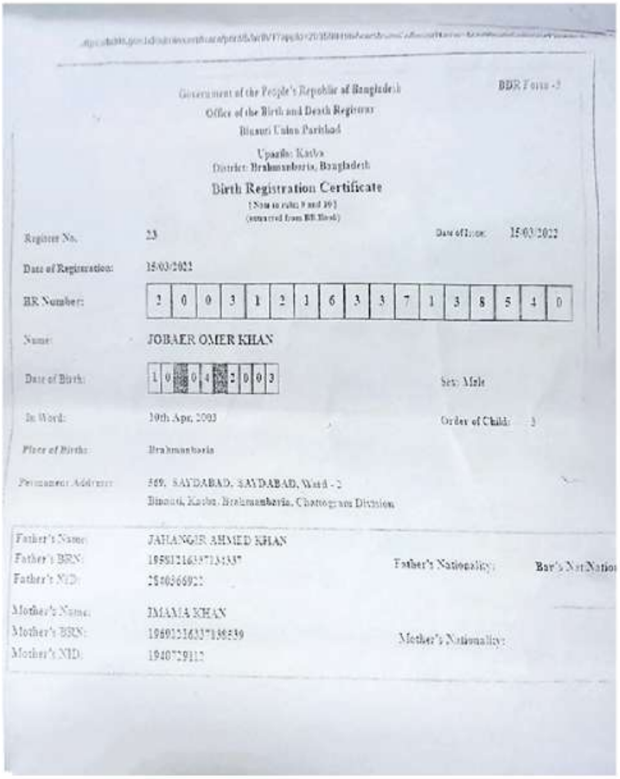

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Birth and Death Registrar
Binauti Union Parishad
Upazila: Kasba
District: Brahmanbaria, Bangladesh

BDR Form - 5

Birth Registration Certificate
[Note to rules 9 and 10]
(extracted from BR Book)

Register No.	23	Date of Issue:	15/03/2022
Date of Registration:	15/03/2022		
BR Number:	2 0 0 3 1 2 1 6 3 3 7 1 3 8 5 4 0		
Name:	JOBAER OMER KHAN		
Date of Birth:	1 0 [redacted] 0 4 [redacted] 2 0 0 3	Sex:	Male
In Word:	10th Apr, 2003	Order of Child:	3
Place of Birth:	Brahmanbaria		
Permanent Address:	569, SAYDABAD, SAYDABAD, Ward - 2 Binauti, Kasba, Brahmanbaria, Chattogram Division		
Father's Name:	JAHANGIR AHMED KHAN		
Father's BRN:	19581216337134337	Father's Nationality:	Bangladeshi
Father's NID:	2540366922		
Mother's Name:	IMAMA KHAN		
Mother's BRN:	19691216337138539	Mother's Nationality:	
Mother's NID:	1940729112		

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: জোবায়ের ওমর খান
জন্ম	: ১০.০৪.২০০৩
পিতা	: জাহাঙ্গীর আহমেদ খান
পিতার পেশা ও বয়স	: আইনজীবী, ৬৫
মাতা	: ইমামা খান
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
মাসিক আয়	: ১ লক্ষ টাকা
আয়ের উৎস	: আইনজীবী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: বিইউপি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বিনোদ, থানা: কসবা, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: ৫৬৯, এলাকা: সায়দাবাদ, ২ নং ওয়ার্ড, জেলা: ঢাকা

শহীদের জানাজা তাঁর নিজ উপজেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পারিবারিক কবরস্থানেই সমাহিত করা হয়

শহীদের পরিবারের প্রতি সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১.আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই তবে শহীদ পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার

“আমার জন্য সবাই দোয়া কইরো আমি জিহাদে যাইতাছি”

শহীদ মো: আকিনুর রহমান

ক্রমিক : ১০৭

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০১

জন্ম ও পরিচিতি

মো: আকিনুর রহমান সবসময় শহীদি তামান্না পোষণ করতেন। তিনি ১৯৯১ সালের ৮ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং এ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: তাহের আলী ইন্তেকাল করেছেন এবং ৬৫ বছর বয়সী মাতা মিনারা খাতুন একজন গৃহিণী।

ব্যক্তিগত জীবন

মো: আকিনুর রহমান শহীদের অমীয় সুধা পান করতে নিজেকে সবসময় প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ৫ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করতেন। নিজে নামাজ পড়ার পাশাপাশি পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের নামাজের দিকে আহ্বান করতেন। তার ৩ জন সন্তানকেই তিনি দ্বীনের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজে খুব বেশি পড়ালেখা করতে না পারলেও সন্তানদেরকে মানুষ করার জন্য দিন-রাত আপ্রান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শহীদ মো: আকিনুর রহমান নিজেকেসহ গোটা পরিবারকে ইসলামের রঙে রঙিন করতে চেয়েছিলেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আকিনুর রহমানের পারিবারিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তিনি রং মিস্ত্রির কাজ করতেন। এছাড়াও যখন যে কাজ পেতেন তাই করে সংসার চালাতেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ সন্তান রেখে গেছেন। বড় মেয়ে উম্মে সালমা (০৯) ৩য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। মেজো মেয়ে সামিয়া সুলতানা (৩.৬) এবং ছোট ছেলের বয়স মাত্র (১.৬) বছর। মৃত্যুকালে তিনি সংসারের জন্য তেমন কোন কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তার কোন ফসলি জমি নেই। ঘরের ভিটাটুকুই তার পরিবারের একমাত্র সম্বল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ছোট। রান্না করার মতো তাদের পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় তিনি তার ঘরের এক কোণায় কোনমতে রান্না করার ব্যবস্থা করেন। তাদের শৌচকাজ করার জন্য কোন বাথরুম না থাকায় বড় ভাইয়ের টয়লেট ব্যহহার করেন।

শহীদ আকিনুর রহমান ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ৩ সন্তান নিয়ে আকিনুরের স্ত্রী দিশেহারা প্রায়। তার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে সংঘঠিত ২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসীস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নীরিহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় জনতা।

"আমি শহীদ হবো, ইনশাআল্লাহ"

আন্দোলনে যোগদান

ছোটবেলা থেকেই মো: আকিনুর রহমান ছিলেন আন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন। তিনি নিজে কখনো কারো সাথে অন্যায় আচরন করা বা মানুষের হক নষ্ট হয় এমন কোন কাজ করতেন না। জুলাই মাসে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে রুপ নেয়; তখন থেকেই তিনি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করেন। তিনি নিজে আন্দোলনে শরিক হওয়ার পাশাপাশি এলাকার আন্যান্যদেরও আন্দোলনে শরিক করার চেষ্টা করেন।

শাহাদাত বরণ

৫ আগষ্ট আনুমানিক সকাল ১০ টায় মসজিদের মাইক থেকে আন্দোলনের ঘোষণা আসার পর আর ঘরে বসে থাকতে পারেননি শহীদি তামান্না পোষণকারী মো: আকিনুর রহমান। তিনি যখন ঘর

থেকে বের হয়ে বানিয়াচং থানার সামনে আন্দোলন করতে যাচ্ছিলেন তখন তার স্ত্রীকে বলেছিলেন "আমার জন্য সবাই দোয়া কইরো আমি জিহাদে যাইতাছি" সে তার স্ত্রীকে প্রায়ই বলতেন "আমি শহীদ হবো, ইনশাআল্লাহ" আল্লাহ তার ফরিয়াদ শুনেছেন।

মো: আকিনুর রহমান অন্যান্যদের সাথে বানিয়াচং থানার সামনে আন্দোলন করতে গেলে স্বৈরাচারী সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামিলীগ এর সদস্যরা এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। আন্দোলনের একপর্যায়, একটি গুলি এসে আকিনুর রহমানের বুকের ডান পাশে বিধে এবং পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন সদা হাস্যোজ্জ্বল আকিনুর রহমান। পাড়া প্রতিবেশিরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পর্যবেক্ষণ করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে নিজ এলাকায় শহীদের নামাজে জানাজা শেষে তাকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়।

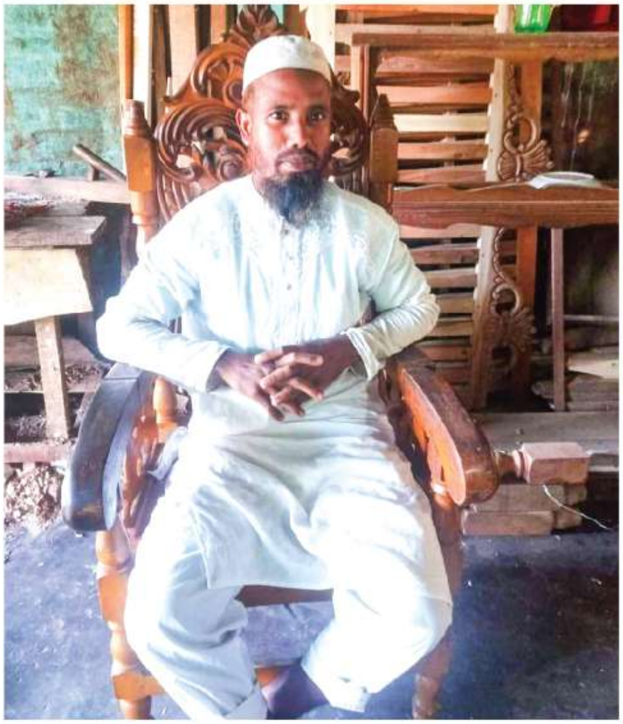

শহীদ সম্পর্কে বড় ভাইয়ের বক্তব্য

শহীদ মো: আকিনুর রহমানের বড় ভাই মো: শাহিনুর রহমান আপন ছোট ভাই সম্পর্কে বলেন, আকিনুর রহমান অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিল। সে নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। মাঝে মাঝে তাবলীগেও যেতো। পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতো। সহজ সরল একজন নির্ভেজাল মানুষ ছিল। নিজেও নামাজ আদায় করতো; অপরকেও নামাজের জন্য ডাকতো। গ্রামের মানুষের কাছে একজন ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল। না খেয়ে থাকলেও কারো কাছে ধার নিত না।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া
২. এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান
৩. শহীদের সন্তানদের সকল খরচ নিশ্চিত করা

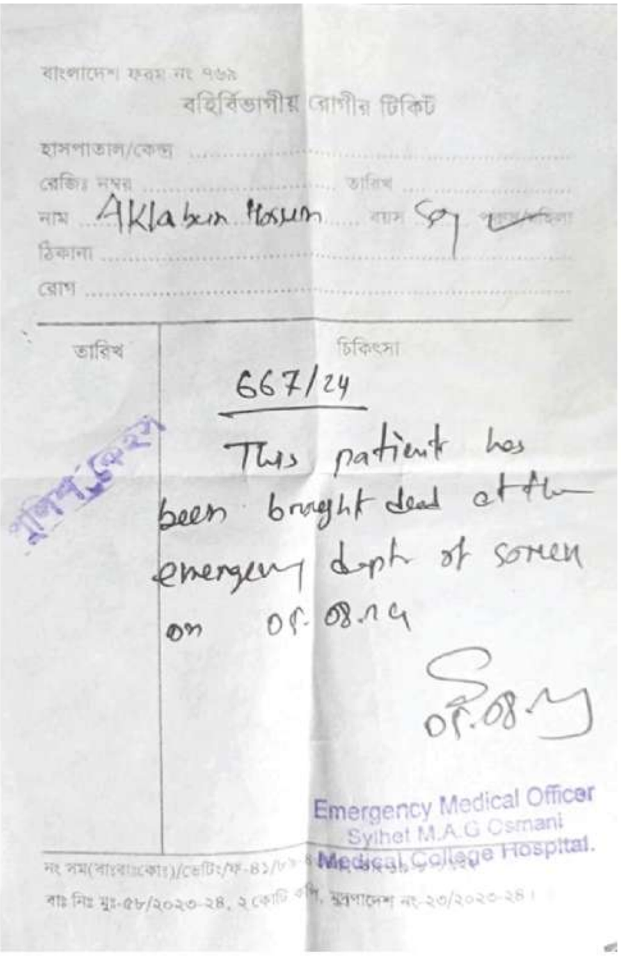

বাংলাদেশ ফরম নং ৭৬৯
বহির্বিভাগীয় রোগীর টিকিট
হাসপাতাল/কেন্দ্র
রেজিঃ নম্বর .... তারিখ
নাম Akla bun Hasun বয়স 30 পুরুষ/মহিলা
ঠিকানা
রোগ
তারিখ | চিকিৎসা
667/24
This patient has been brought dead at the emergency deptt of somen on 05.08.24
05.08.24
Emergency Medical Officer
Sylhet M.A.G Osmani
Medical College Hospital.
নং সম(বাংবাঃকোঃ)/রেজিঃ/ফ-৪১/৮৬-৮
বাঃ নিঃ মুঃ-৫৮/২০২৩-২৪, ২ কোটি কপি, মুদ্রণাদেশ নং-২৩/২০২৩-২৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
08 Apr 1991
নাম
মোঃ আকিনুর রহমান
Name
MD. AKINUR RAHMAN
পিতা
তাহের আলী
মাতা
মিনা খাতুন
Date of Birth 08 Apr 1991
NID No. 235 569 3256

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: আকিনুর রহমান
পেশা	: রং মিস্ত্রী
জন্ম তারিখ	: ৮ এপ্রিল ১৯৯১
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১.৩০ মিনিট
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট, ২০২৪
দাফনের স্থান	: বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চানপুর, ইউনিয়ন: ১ নং, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ
পিতা	: তাহের আলী
মাতা	: মিনা খাতুন
বাড়ী ঘর ও সম্পদের অবস্থা	: শুধুমাত্র বাড়ি ভিটা আছে

সন্তানের বিবরণ

১) উম্মে সালমা	: বয়স: ৯ বছর, পেশা: ছাত্রী, প্রতিষ্ঠান: আল জামেয়াতুল বাইতুল কোরআন, শ্রেণী: ৩য়, সম্পর্ক: মেয়ে
২) সামিয়া সুলতানা	: বয়স: ৩.৫ বছর, সম্পর্ক: মেয়ে
৩) আব্দুল্লাহ আল মামুন	: বয়স: ১.৫ বছর সম্পর্ক: ছেলে

শহীদ মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান

ক্রমিক : ১০৮

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০২

জন্ম ও বেড়ে উঠা

১৯৯৬ সালের ২৫ জানুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানাধীন মীর মহল্লা পূর্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান। ছেলেবেলা থেকেই নামাজী ও আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত বান্দা হিসেবেই তার বেড়ে উঠা। পাড়া প্রতিবেশী ও গ্রামের মানুষের কাছে একজন ভালো মানুষ হিসেবেই তিনি পরিচিত। গ্রামে বৃদ্ধ কৃষক বাবা ও ঢাকায় গার্মেন্টস শ্রমিক মায়ের পাশাপাশি পরিবারের হাল ধরতে তিনি নিজ গ্রামে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালাতে শুরু করেন। শাহাদাতের দিনও তিনি সারা সকাল অটোরিকশা চালান। ছাত্রজনতার গন অভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভারতে পালিয়ে গেলে ছাত্র জনতা বিজয় মিছিল বের করে। সাদিকুর রহমান ও এতে অংশ নেন। বিজয় মিছিল বানিয়াচং থানা অতিক্রমকালে ছাত্র জনতার উপর অতর্কিত গুলিবর্ষণ করে পুলিশ ও আওয়ামী গুন্ডারা। পুলিশ ও আওয়ামীলীগের ছোড়া গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে শহীদ হন সাদিকুর রহমান।

শাহাদাতের ঘটনা

২০১৮ সালে বাতিল হওয়া সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা প্রথা ফের ২০২৪ সালের জুন মাসে হাইকোর্ট কর্তৃক পুনর্বহাল হলে আপামর ছাত্রজনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের ঘোষিত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বাধা দেয় পুলিশ, আওয়ামী লীগ তার সহযোগী সংগঠনসমূহ। প্রথমদিকে নিরাপত্তা বাহিনী সমূহ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের দমাতে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে শটগান, স্নাইপারসহ আরও বিভিন্ন মরনাস্ত্রের ব্যাবহার শুরু করে। হেলিকপ্টার ব্যবহার করেও নিরস্ত্র জনতার উপরহত্যাযজ্ঞ চালায় ফ্যাসিস্ট সরকার ও তার সহযোগিরা। বাড়তে থাকে লাশের সারি।

অবশেষে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতার গণবিস্ফোরণ ও হাজারো শহীদের রক্তস্রোতে ভেসে যায় জালিম হাসিনার মসনদ। ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় খুনি হাসিনা। দেশজুড়ে আরম্ভ হয় আনন্দ মিছিল, সেই মিছিলে যোগ দেন শহীদ সাদিকুর রহমানও। জনতার আনন্দ মিছিল বানিয়াচং থানা অতিক্রম কালে অতর্কিত হামলা চালায় সদ্য পরাজিত ফ্যাসিস্টের প্রেতাত্মা পুলিশ ও হাসিনার পরিত্যক্ত আওয়ামী গুন্ডা বাহিনী। মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করে হামলাকারীরা। পুলিশের এস আই সন্তোষ কুমারের ছোড়া বুলেট সরাসরি আঘাত করে সাদিকুর রহমানের গলায়, গলগল করে বের হতে থাকে তাজা রক্ত। হাত দিয়ে গলা চেপে ধরে দৌড়াতে থাকেন তিনি। কিন্তু পর মুহূর্তেই পিঠের মেরুদণ্ডে আঘাত হানে ঘাতকের দ্বিতীয় বুলেট। থমকে যান সাদিকুর, লুটিয়ে পড়েন রাজপথে। আর উঠে দাড়াতে পারেননি তিনি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরনে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। পান করেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। পেছনে রেখে যান স্ত্রী, দুই শিশু সন্তানসহ দেশব্যাপী অসংখ্য গুনগ্রাহী।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ সাদিকুর রহমান একজন অটো চালক ছিলেন। তিনি ৮৪,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি অটো রিকশা ক্রয় করেছিলেন। তার কোন ফসলি জমি-জমা নেই। তাঁর এই অটোর আয় দিয়ে স্ত্রী সন্তান ও বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে থাকতেন। সাদিকুর রহমান মৃত্যু বরণ করার পরে অটোটি বিক্রয় করে অটোর কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই। ছোট ছোট দুটি সন্তান নিয়ে তার স্ত্রী খুবই অসহায়। দু এক বেলা খেয়ে, না খেয়ে তাঁর স্ত্রী সন্তানরা দিনাতিপাত করছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

সাদিকুর রহমারনর চাচতো ভাই, "মো: হুমায়ন বলেন": সাদিকুর রহমানে অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। তিনি পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। তিনি গ্রামের মানুষের কাছে একজন ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি মিশুক একজন মানুষ ছিলেন। তিনি বিড়ি সিগারেট/ধুমপান করতেন না। তিনি কারো আমানতের খেয়ানত করতেন না। তার ভাইয়েরা তাকে ঠকাতো, কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করতেন না। বাজে মানুষের সাথে টঙয়ে কোনো আড্ডা দিতেন না। স্ত্রী- সন্তান ও বৃদ্ধ বাবাকে নিয়েই সবসময় তার চিন্তা ছিল"।

প্রস্তাবনা

১ : শহীদ পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন

২ : গরু ছাগল হাঁস-মুরগি কিনে দিলে তার স্ত্রী মোটামুটি সংসার চালাতে পারবে

৩ : শহীদের দুটি নাবালক সন্তান রয়েছে। তাদের দায়িত্ব নিতে পারলে ভালো হয়

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: সাদিকুর রহমান
জন্ম তারিখ	: ২৫-০১-১৯৯৬
পিতা	: মোহাম্মদ ধলাই মিয়া
মাতা	: সাজেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মীর মহল্লা পূর্বপাড়া, ইউনিয়ন: ১নং বানিয়াচং, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ
সন্তান	: এক ছেলে এক মেয়ে
	: হাবিবুর রহমান (৩.৫ বছর, ছেলে)
	: তাকিয়া তাবাচ্ছুম (১.৫ বছর, মেয়ে)
পেশা	: অটোরিকশা ড্রাইভার
ঘটনার স্থান	: বানিয়াচং থানার সামনে
শাহাদাতের সময়কাল	: ০৫-০৮-২০২৪ বিকাল ৩টা
আঘাতের ধরন	: গলায় ও পিঠে গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ (পুলিশের এস আই সন্তোষ কুমার, আওয়ামীলীগ)
শহীদের কবরের অবস্থান	: মীর মহল্লা পূর্বপাড়া কবরস্থান

শহীদ শেখ নয়ন হোসেন

ক্রমিক : ১০৯

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০৩

প্রাথমিক জীবন

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার কামালখানি গ্রামের মো: আলী হোসেন অনেক কষ্ট করে ৭ সন্তানসহ ৯ সদস্যের বড় একটি পরিবার রিকশা চালানো উপার্জন দিয়ে পরিচালনা করে আসছিলেন। হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরিবারের দায় দায়িত্ব ১৬ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে শেখ নয়নের উপর এসে পড়ে। শহীদ শেখ নয়ন হোসেন ০৮-০৩-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিন বোনের পরে গরিবের ঘরের খুটি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই পরিবারের আর্থিক সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন কাজ করতে হয় শেখ নয়নকে। পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য লেখাপড়ার তেমন সুযোগ হয়নি তাঁর। শেখ নয়ন যখন ১৮ বছরের যুবক তখন তাঁর বাবা মৃত্যুবরণ করেন।

ঋণ করে অটো রিকশা কেনার পর ভালোই চলছিল সংসার। শেখ নয়ন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়লেও লেখাপড়ার প্রতি এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি তার ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি সবার আগে ছিলেন। ছাত্রজনতার ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেননি। অবশেষে আন্দোলনকে সফল করেই চির বিদায় নিলেন তিনি। শহীদ শেখ নয়ন হোসেন অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিলেন। নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। নয়ন সবসময় বন্ধুদের অনুসরণীয় ছেলে ছিলেন। তিনি সবসময় পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতন। তিনি খুবই সাহসী ছিলেন। তিনি কখনো মিথ্যা এবং অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। নয়ন বারবার শহীদ আবু সাঈদের কথা বলতেন। তিনি তার বন্ধুদের বলতেন: "তোরা সবাই আবু সাঈদের দিকে লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি তাঁর মূল্যবান জীবনটা বিলিয়ে দিলো! শহীদ আবু সাঈদের মতো সাহসী বীর হয়ে আমিও যদি এই দেশের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে পারতাম! এই মজলুম ছাত্র-জনতার জন্য নিজের জীবন দিয়ে হলেও যদি পাশে দাঁড়াতে পারতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।" নয়ন নিজেকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান, সত্যবাদী, মিশুক, সদাহাস্য উজ্জ্বল ছেলে হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন।

শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের শাহাদাতের ঘটনা

বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে চার দফা দাবিতে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা লাগাতার কর্মসূচি দেয় । বিভিন্ন বাধা বিপত্তি পার করে ৩ আগস্ট ২০২৪ শহীদ মিনার থেকে সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম সরকার পদত্যাগের একদফা আন্দোলন ঘোষণা করেন। শুরুতে ৬ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন "লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সমন্বয়করা কর্মসূচি একদিন এগিয়ে এনে ৫ই আগস্ট ঘোষণা করেন আন্দোলনকে ঘিরে ৫ আগস্ট অনেক জেলায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ এবং গোলাগুলীর ঘটনা ঘটে এতে প্রায় অনেক সাধারণ ছাত্র ও নাগরিক নিহত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলার মতো হবিগঞ্জেও এক দফা দাবি নিয়ে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন হয়। অন্যান্য দিনের মতো শেখ নয়ন হোসেন ৫ই আগস্ট সকাল আনুমানিক ১১ টার দিকে ছাত্র বন্ধুদের সাথে স্বৈরচার পতনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রজনতা মিছিল করতে করতে বানিয়াচং থানার সামনে যায়। মিছিলের সামনের দিকে ছিলেন শেখ নয়ন হোসেন। তিনি তার হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে ছাত্রদের এই মিছিলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। শেখ নয়ন হোসেনের স্লোগানের শক্তিতেই যেন পিছনের সকল ছাত্রজনতা তাদের হৃদয়ে শতগুণ শক্তি বৃদ্ধি করে নিচ্ছিল।

প্রথমে চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। হঠাৎ পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগ তাদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করা শুরু করলো। দেশের মানুষের ঘাম ঝরানো টাকায় যে পুলিশের বেতন হয় সেই সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের টাকায় কেনা রাবার বুলেট ও গুলি ছুড়তে থাকে সাধারণ ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। একটু পরেই সামনের দিকে স্লোগান দিতে দেখে অকুতোভয় বীর শেখ নয়নকে লক্ষ্য করে পুলিশ রাবার বুলেট ও গুলি ছুড়ে। একটি রাবার বুলেট এসে বিধে তাঁর নাকে ও একটি গুলি এসে কপালের উপরের অংশে লেগে অপর দিক দিয়ে মগজ বের হয়ে যায়। ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বড় একটি পরিবারের দায়িত্বে থাকা একমাত্র ছেলেটি সত্যের পথে লড়াই করতে করতে এভাবেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। সমাপ্তি হয় একটি বীর সাহসী, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল, মায়ের একমাত্র ছেলে, আয়ের শেষ সম্বল সন্তান, নিভে যায় এলাকাবাসীর নয়নতারা।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে। শাশ্বত সত্য উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য আল্লাহর একান্ত প্রিয় নির্ভীক সিপাহসালারগণ যুগ যুগ ধরে সদা-সর্বদা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। অপরদিকে মিথ্যার ধারক-বাহক বলে পরিচিত যারা, সত্য যাদের অন্তরে তীরের ন্যায় বিঁধে, তারা সব সময়ই এই শাশ্বত সত্যের টুঁটি চেপে ধরে রাখতে চেয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস ন্যায় এবং ইনসাফকে বারবার ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্যই হয়েছে সত্যের বিরুদ্ধে। তাই তারা বারবার সত্যনিষ্ঠ পথে যারা চলতে চাই তাদেরকে জেল জুলুম খুন গুম এবং ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিঃশেষ করতে চেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোন স্বৈরশাসক শত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরেও শত জুলুম নির্যাতনের পরেও ন্যায় এবং ইনসাফের পথের মানুষদের দাবি রাখতে পারেনি। অবৈধ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাও পারলো না। গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা চেয়েছিল ৫ আগস্ট ২০২৪ লাখো ছাত্রদের লাশের উপর দিয়ে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকবে। কিন্তু শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের মত সাহসী বীরদের জীবনের বিনিময়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার স্বপ্ন এদেশে বাস্তবায়ন হয়নি আর হবেও না ।

শেখ শহীদ নয়নের ইচ্ছা

পারিবারিক অসচ্ছলতার জন্য লেখাপড়া খুব বেশি করতে পারেন নি। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া জীবনের ইতি টানেন। কিন্তু তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ছিল একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষের মত। তিনি মৃত্যুর দিনেও তিনার মাকে বলেছেন যে "আমি দেশের জন্য কিছু করতে চাই।" তিনি সবসময়ই বলতেন আমি সত্যের পথে থাকতে চাই এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সব সময় লড়াই করতে চাই। তিনি তার মাকে বলতেন মা, আমি অল্প দিনের ভিতরেই বিদেশে যেয়ে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিব। আমাদের যে থাকার ঘরের সমস্যা সেই সমস্যাও থাকবে না। মা, তুমি অল্প কিছুদিন ধৈর্য ধরো।

শহীদ শেখ নয়ন হোসেন সম্পর্কে এলাকাবাসীর মন্তব্য

শহীদ নয়ন এমন একজন ব্যক্তি ছিল যে অভাব অনটনের ভেতর থাকলেও কোনদিন অবৈধ ইনকাম করেনি। কোনদিন সে খারাপ অভ্যাসের সাথে জড়িত হয়নি। কোনদিন ধূমপান করেনি। শুক্রবারের দিন সবার আগে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে যেত। নিজে অভাবের ভিতর থাকলেও সর্বোচ্চ চেষ্টা করত গরিব-দুঃখীদের পাশে দাঁড়ানোর।

এক নজরে শহীদ শেখ নয়ন হোসেন

পুরো নাম	: শেখ নয়ন হোসেন
পিতা	: মৃত আলী হোসেন
মাতা	: জরিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম :কামালখানি, ইউনিয়ন: কামালখানি, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: কামালখানি, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
ছয় বোন	: ১. তুহিনা আক্তার (২৪): বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন
	: ২. সুহিনা আক্তার (২২): বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন
	: ৩. আইরিন আক্তার (২১): অবিবাহিত (বর্তমান ঢাকায় গার্মেন্টস কর্মী), সম্পর্ক: বোন
	: ৪. তোফা (১৩): ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত, সম্পর্ক: বোন
	: ৫. সুমনী (১১): চতুর্থ শ্রেণী, সম্পর্ক: বোন
	: ৬. রোহিনী (৭): প্রথম শ্রেণী, সম্পর্ক: বোন
পরিবারে আয়ের উৎস	: শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের অটো চালানোর মাধ্যমে ছিল
শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের ইচ্ছা	: "দেশের জন্য কিছু করে যেতে চাই"
শাহাদাতের স্থান	: বানিয়াচং থানার সামনে
শাহাদতের তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আক্রান্তের ধরন	: মাথায় গুলি লেগে মগজ বেরিয়ে যায়। সাথে সাথেই শাহাদাত বরণ করেন
জানাজা নামাজ	: ০৬-০৮-২০২৪, সকাল ১০
দাফন	: নিজ বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: আনাছ মিয়া

ক্রমিক : ১১০

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০৪

শহীদের পরিচয়

শহীদ আনাস ২০০৪ সালের ২৫ আগস্ট হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার খন্দকার মহল্লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবুল হোসেন ও মাতার নাম খাইরুন্নেছা। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আনাস নবম শ্রেনিতে পড়াশোনা করতো। ৭ ভাই বোনের মধ্যে সে ছিল সবার ছোট।

কেমন ছিলো শহীদ আনাস

বাবা হারা আনাছ ছিল তার মায়ের চোখের মণি। এলাকার মানুষের ভাষ্যে সে অত্যন্ত সাহসী ও বিনয়ী ছিল। কোনোদিন কারও সাথে বেয়াদবী বা খারাপ আচরণ করেনি। ফলে এলাকাবাসীর অত্যন্ত আদরের ছিলো। সদা হাস্যজ্বল ছেলেটি সামাজিক কাজকর্মে ছিলো স্মার্ট ও দক্ষ। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো সে। অন্যদেরকেও নিয়মিত নামাজের জন্য ডাকতো। তাঁর মেধা ও নম্রতা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও তাকে প্রিয় করে রেখেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে ছিল প্রতিবাদী তরুণদের আইকন। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত নৈতিক ছিল সে। মিথ্যা কথা, ছল-ছাতুরী বা অশ্লীলতা থেকে সে থাকতো যোজন-যোজন দূরে।

যেভাবে আল্লাহর কাছে গেলেন

৫ আগস্ট ২০২৪, জুলাই থেকে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৪ তারিখের বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় ছাত্র-জনতা সেনাবাহিনীর একেবারে সম্মুখে আন্দোলন করলেও সেনাবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করেনি। বরং ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করতে আসা পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীকে ফাঁকা গুলি করে ঠেকিয়ে দিয়েছে। চরম আত্মবিশ্বাস চলে আসে সারাদেশের মানুষের মধ্যে। সেনাবাহিনীর সমর্থন হারিয়ে সরকারের পতন হচ্ছে বলেই গুঞ্জন উঠতে থাকে। গণভবন ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষনা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। প্রথমে ৬ তারিখে গণভবন ঘেরাওয়ের কথা বলা হলেও আরও কৌশলগত কারণে ৫ তারিখ করতে পরামর্শ দেয় আন্দোলনে সমর্থনদানকারী বিভিন্ন পক্ষ। ঘোষণা আসে, "পরশু নয়, কালই।"

বানিয়াচং থেকে গণভবন যাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না। গণপরিবহন বন্ধ করে দিয়েছিল স্বৈরাচারী সরকার। তাই বানিয়াচং থানার সামনেই বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত আনাছ ও তার সহযোদ্ধারা। মিছিলের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয় আনাছ।

স্বৈরাচারী সরকারের লালিত হিংস্র পুলিশ বাহিনীর রক্তপিপাসা তখনও মিটে নি। জিগাংসা নিয়ে থানা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে থানা থেকে বের হয়ে আসে তারা। তাদের সাথে যুক্ত হয় স্বৈরাচারের দোসরেরা যারা ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামীগের বিভিন্ন পদের পাওয়ার দেখিয়ে মানুষকে শোষণ করতো। পুলিশ ও দোসর বাহিনী গুলাবারুদ নিয়ে হামলে পড়ে আন্দোলনকারীদের মিছিলে। গুলিবিদ্ধসহ আহত হয় বেশ কয়েকজন।

বীরদর্পে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করে আনাছরাও। হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগে আনাসের পেটে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

আনাসের মেজো ভাই রাসেলসহ বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী আনাছকে তৎক্ষনাৎ হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পেট থেকে গুলি বের করার জন্য অপারেশন করা হয়। গুলি লাগায় ও অপারেশনের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। ৮ ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন হয়। দীর্ঘসময় ধরে চলে অপারেশন। অপারেশনের পর কিছুক্ষণের মধ্যেই এনেস্থিসিয়ার কার্যকারিতা শেষ হয়। তীব্র ব্যাথায় ছটফট করতে করতে শেষ রাতের দিকে অজ্ঞান হয়ে যায় আনাছ। এরপর আর জ্ঞান ফেরেনি তার শাহাদাৎ বরণ করে আনাছ।

দাফন

৬ আগস্ট বাদ এশা রাজবাড়ী মাঠে শহীদ আনাছের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

আনাস মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ভাইবোনেরা সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। বাবা বেঁচে থাকতে একটা অর্ধ-পাকা বাড়িও বানিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আনাছকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদেশ পাঠাতে চেষ্টা করছিলেন ভাইয়েরা। আগস্ট মাসের শেষের দিকে ইতালি যাওয়ারও কথা ছিল তার। এজন্য ৫ লাখ টাকা ঋণ করতে হয়। সেই ঋণ এখনো অপরিশোধিত।

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

ঋণ পরিশোধের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: আনাছ মিয়া
জন্ম	: ২৫ আগস্ট ২০০৪, ঢাকা
শহীদের পেশা	: ছাত্র, নবম শ্রেণি
পিতা	: মো: আবুল হোসেন (মৃত)
মাতা	: খাইরুন্নেসা (৬০), গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার খন্দকার মহল্লা
বর্তমান ঠিকানা	: হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার খন্দকার মহল্লা
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	: ৫ ভাই, ২ বোন
	: বড় বোন: মুনমুন আক্তার (৩৮), গৃহিণী
	: বড় ভাই: রাজিব মিয়া (৩৫), ব্যবসায়ী
	: ২য় ভাই: রাসেল মিয়া (২৮), ইলেক্ট্রিশিয়ান
	: ৩য় ভাই: তোফায়েল আহমেদ (২৬), ব্যবসায়ী
	: ৪র্থ ভাই: মিদুল মিয়া (২৩), ব্যবসায়ী
	: ২য় বোন: রুনি আক্তার (১৭), ছাত্রী, একাদশ শ্রেণি
শহীদ হওয়ার সময়কাল ও স্থান	: ৫ আগস্ট দুপুরে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৬ আগস্ট সকাল ৭ টায় হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে

শহীদ মো: মোজাক্কির মিয়া

ক্রমিক : ১১১

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০৫

প্রাথমিক জীবন

হবিগঞ্জ জেলার লাইড়া হাট গ্রামের খুব দারিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মো: মোজাক্কির মিয়া। পিতা সমসের উল্লাহ ও মাতা খুশ বানু বিবির ঘরে ২০-০৪-১৯৯০ তারিখে জন্মগ্রহণের পর থেকেই দারিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করতে হয় মোজাক্কির মিয়াকে। মোজাক্কির মিয়াকে ছোট রেখেই বাবা সমসের উল্লাহ মারা যান। তারপর থেকেই নিজের পায়ে দাড়ানোর অপ্রাণ চেষ্টা করেন শহীদ মোজাক্কির মিয়া। দারিদ্রতার কারণে লেখাপড়ার তেমন সুযোগ হয়নি তাঁর। কিন্তু সত্যের পথে তিনি সারা জীবন অবিচল থাকার চেষ্টা করেছেন।

শাহাদাতের ঘটনা

কি প্রয়োজন ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যাবার? গরীব মানুষদের আবার কিসের আন্দোলন। পরিবারের সুখের জন্য দুবেলা দু'মুঠো খাবারে জন্যই যে ছুটাছুটি এটাইতো বড় আন্দোলন। এ ধরনের মন্তব্য অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু সত্যের পথে চলা যার জীবনের বড় স্বপ্ন তাকে কি আর অভাব অসচ্ছলতা কিংবা দারিদ্রতা ধরে রাখতে পারে? সব কিছুকে উপেক্ষা করে সে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। জালিম সরকারের দোসরা ভেবেছিল যে বাংলার ছাত্র-জনতাকে হত্যা করে আমরা চিরদিন এই বাংলাদেশের বুকে অন্যায় ভাবে টিকে থাকবো আমাদের উপরে কেউ কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ভেবেছিল, আমি যদি দেশ ছেড়ে চলেও যাই যেন এদেশের মানুষ ভালোভাবে থাকতে না পারে। এদেশের প্রতিটি পরিবারে যেন কান্নার রোল পড়ে যায়। তাই শেখ হাসিনা তার পোষা বাহিনীদের সাধারণ ছাত্র-জনতা সহ আন্দোলনকারীদের নির্দ্বিধায় হত্যার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সাধারণ ছাত্র জনতা এবং এ দেশের আপামর সাধারণ মানুষ সেই হত্যার নির্দেশকে উপেক্ষা করে ,তাদের দেশকে বাঁচানোর জন্য রাজপথ ছেড়ে না যাওয়ার কঠিন শপথ নেন।

দিন মজুর মোজাক্কির মিয়া সন্তানদের পেটের আহারের জন্য ভাংগাড়ি মাল কিনতে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতেন। কখনো বানিয়াচং থানার সামনে, কখনো এই গ্রাম থেকে ঐ গ্রামে ভাংগাড়ি মাল খুঁজে বেড়াতেন। কিন্তু গরিব হলেও তিনি ছিলেন সৎ একজন মানুষ। ৫ আগস্ট ২০২৪ সকালে শহীদ মোজাক্কির তার পরিবারকে বিদায় জানালেন। তার আত্মা তাকে বলেছিল যে তার নাম শহীদদের মধ্যে থাকবে। তাই তিনি তার কাছে বললেন প্রিয় স্ত্রী আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তুমি আমার সন্তানদের দেখে রেখো। আমরা পরিবারের সমস্ত দায়ভার আমি আল্লাহর উপর ছেড়ে গেলাম।

তিনি ৫ আগষ্ট সকাল ১০:১৫ মিনিটের দিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বানিয়াচং থানার সামনে মিছিলে যোগ দেন। তিনি ছিলেন মিছিলের একেবারে সামনের দিকে।

সাধারণ ছাত্র জনতা, পুলিশ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের মধ্যে থানার সামনে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এর মধ্যে তাদের এলাকার কুখ্যাত মেম্বর মধু মিয়া মোজাক্কির মিয়াকে দেখে ফেলে। সে নিজে পুলিশকে হুকুম দেয় মোজাক্কির মিয়াকে গুলি করতে। মিছিলে বানিয়াচং থানার পুলিশ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ সদস্যরা এলোপাথারী গুলি করে। পুলিশ মোজাক্কির মিয়াকে উদ্দেশ্য করে এলোপাথারি গুলি করে। মোজাকের মিয়ার মোট ৪ টি গুলি লাগে। প্রথম গুলি এসে লাগে তার গলায়, ২য় গুলি লাগে তার মাথায়,৩য় গুলি লাগে তার বুকের ডান পাশে, ৪র্থ গুলি লাগে তার ডান পায়ে। ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর অনুভূতি

চাচা, শাহাদ আলী বলেন: "মোজাাক্কির মিয়া অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিল। সে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতো। সে সহজ সরল একজন নির্ভেজাল মানুষ ছিল। সে গ্রামের মানুষের কাছে একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিল। সে ছোট একটা ঘরে মা, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে থাকতো। সে গ্রামে গ্রামে যেয়ে ভাংগড়ী মাল আনতো, আর গঞ্জে যেয়ে বিক্রি করতো। তার কোন শত্রু ছিলনা। কোন দলের বা মতের লোক ছিলনা। সন্ত্রাসী মেম্বর মধু অনেক খারাপ লোক। তার ইশারায় গরিব, সহজ-সরল মোজাকির মিয়ারে পুলিশ গুলি করে মাইরা ফালাইলো"।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মোজাক্কির মিয়ার পারিবারিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তিনি ভাংগাড়ী মাল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করতেন। তিনি মাঝে মাঝে অন্যের ট্রাক্টর চালাতেন। এছাড়া ও তিনি যখন যে কাজ পেতেন তাই করে সংসার চালাতেন। তিনি ২টি ছোট ছোট শিশু সন্তান রেখে গেছেন। তিনি কোন কিছুই সংসারের জন্য রেখে দারিদ্রতার কারণে লেখাপড়ার তেমন সুযোগ হয়নি তার। কিন্তু স্বপ্ন একেছিলেন দুই ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে অনেক বড় করবেন। কিন্তু

ছেলেদের অবস্থা কতদূর গড়াবে সেটা বলা কঠিন। শহীদ মোজাক্কির মিয়ার পারিবারিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তিনি ভাংগাড়ী মাল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করতেন। তিনি মাঝে মাঝে অন্যের ট্রাক্টর চালাতেন। এছাড়া ও তিনি যখন যে কাজ পেতেন তাই করে সংসার চালাতেন। তিনি ২টি ছোট ছোট শিশু সন্তান রেখে গেছেন। মোজাক্কির কোন কিছুই সংসারের জন্য রেখে যেতে পারেন নি। তার কোন চাষ যোগ্য ফসলি জমি-জমা ছিলনা। ঘড়ের ভিটাটুকুই তার একমাত্র সম্বল, তাও অনেক ছোট এবং জরাজীর্ণ টিনের ঘর।

তিনি ভাংগাড়ী মালের ব্যবসায় করার জন্য স্থানীয় একটি সমিতি থেকে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যে মাত্র ৭,৫০০ টাকা পরিশোধ করেছিলেন মাত্র। বাকি টাকা পাওনাদার সমিতি বার বার তাঁর অসহায় স্ত্রীকে তাগাদা দিচ্ছে দিয়ে দেয়ার জন্য। একেবারে সহায় সম্বলহীন শহীদের স্ত্রী তার অনুজ দুটি শিশু নিয়ে নিদারুণভাবে দিনাতিপাত করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ মোজাক্কির মিয়া
Name: MD. MUJAKKIR MIAH
পিতা: মোঃ শমসের উল্লা
মাতা: খুশ বানু বিবি
Date of Birth: 20 Apr 1990
ID NO: 19903611118000268

এক নজরে শহীদ মো: মোজাক্কির মিয়া

পূর্ণ নাম	: মো: মোজাক্কির মিয়া
পিতার নাম	: মো: শমসের উল্লা
মাতার নাম	: খুশ বানু বিবি
জন্ম তারিখ	: ২০-০৪-১৯৯০
জন্মস্থান	: লাইড়া হাট, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: লাইড়া হাট, ইউনিয়ন: ১নং লাইড়া হাট, থানা: বানিয়াচং, জেলা হবিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: (ঐ) লাইড়া হাট, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত
পরিবারের সদস্য	: মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান নিয়ে বর্তমান ৪ সদস্যের একটি পরিবার
পরিবারের সদস্যদের পরিচয়	: ১. মাতা: খুশ বানু বিবি ২. স্ত্রী: মোছা: সুচিনা খাতুন (২৭) ৩. বড় ছেলে: মো: মুজাহিদুল ইসলাম (৫) শিশু শ্রেণী ৪. ছোট ছেলে: মো: মুশারফ হোসেন (৪)
শাহাদাতের তারিখ ও সময়	: ০৫-০৮-২০২৪ দুপুর ১:৫০ মিনিট
শাহাদাতের স্থান	: বানিয়াচং থানার সামনে
আক্রমণকারী	: এলাকার মেম্বার মধু মিয়ার নির্দেশে বানিয়াচং থানার পুলিশ গুলি করে
আক্রমণের ধরন	: মোজাক্কির মিয়া মোট চারটি গুলি লাগে। প্রথম গুলি এসে লাগে তার গলায় দ্বিতীয় গুলি লাগে তার মাথায়, তৃতীয় গুলি লাগে তার বুকের ডান পার্শ্বে চতুর্থ গুলি লাগে তার ডান পায়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যান
জানাজা	: ০৬-০৮-২০২৪ সকাল ১০ হবিগঞ্জ জেলা স্কুল মাঠে
দাফন	: নিজ বাড়ির পাশে পারিবারিক কবরস্থানে

২২ বছরের তরুণ ও খুঁদে নিমার্ণ শ্রমিক শহীদ মো. তোফাজ্জল হোসেন

শহীদ মোঃ তোফাজ্জল হোসেন

ক্রমিক : ১১২

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০৬

প্রারম্ভিক কথা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের এক বীর সৈনিক ছিলেন মধ্যম ও নিম্ন আয়ের পরিবারে জন্মগ্রহণ কারী শ্রমিক নির্মাতা শহীদ মো. তোফাজ্জল ইসলাম। তোফাজলের পারিবারিক অর্থনেতিক অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। গ্রামের অল্প শিক্ষিত শহীদ মো. তোফাজ্জল ছিলেন পেশায় একজন শ্রমিক তথা রং মিস্ত্রি। গতিময় দেশে সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনিও নিজের পেশাগত জীবনে রং মিস্ত্রির কাজ ছাড়াও পরিবারের অভাব দূর করে স্বল্প চাহিদা মেটানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করে যেতেন। কৃষি নির্ভর বাবার অল্প আয় দিয়ে চলতে থাকা পরিবারের অভাব-অনটন দেখে শহীদ মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে রং মিস্ত্রির পেশা বেছে নিয়ে কর্মজীবনে পা বাড়ান। এখানে ব্যক্তি কেবলই খেলনা মাত্র যার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী মধ্যবিত্তদের অভিশপ্ত দায়ভার নিজ কাঁধে নিয়ে একটি অদৃশ্য চক্রাকার কক্ষপথে হেঁটেই চলছে। আর যে সমাজে আমাদের বসবাস তাকে তো মাঝেমধ্যে মনে হয় বোমের কোলোসিয়াস। কানায় কানায় পরিপূর্ণ গ্যালারি, সবাই একটি অসম লড়াইকে বাহবা দিচ্ছে আর সজোরে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে চালিয়ে যাও" ছাত্র আন্দোলন, চালিয়ে যাও ছাত্র আন্দোলন। তারপর সেই অসম লড়াই ও সংগ্রামের সমাপ্তি শেষে স্বৈরশাসকের পতনকে সান্ত্বনা সূচক উফ' শব্দটি বলেই আন্দোলনরত সবাই পরবর্তী লড়াই দেখবার জন্য যেন উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন
Name: MD. TUFAJJUL HOSAN
পিতা: আঃ রৌফ মিয়া
মাতা: হেনা বেগম
Date of Birth: 24 Oct 2002
ID NO: 2412413060

আমরা যেন কেবলই প্রথার মধ্যেই সর্বদা আবদ্ধ যেকোন গোষ্ঠী কিংবা জাতিভেদেই হোক না কেন। শহীদ মো: তোফাজ্জল ইসলামের জন্ম একটা সাধারণ পরিবারে, তাই নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বরূপ চিনতে তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। ছোটবেলা থেকেই শখানো হয়েছে নিম্ন- মধ্যবিত্তের একটি পৃথক মূল্যবোধের জায়গা আছে। নিম্ন-মধ্যবিত্তের বাচঁতে হলে শিক্ষিত হতে হয়,সহনশীল হতে হয়। মধ্যবিত্তরা চাইলেই এমনটি করে না, পড়ে না কিংবা খায়না। কেননা তাদের আর কিছু নাই থাকুক প্রবল আত্মসম্মান আছে। বিবেক আছে, সে শত ঝড়-ঝাপটায় খড়খটো ধরে বেঁচে থাকার অভিনয় করতে পারে। এভাবেই শর্ত সহস্র নিয়মের চর্চায় একসময় সেগুলো যেন প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে সেই একদিন মোটা পুরু চাদরে

আমাদের চেপে ধরতে চায়। সেখানে সূর্যের আলো আসার পূর্বে ইতঃস্তত করে সেখানে খোলা জানালার কাজগুলো মরিচা ধরে ধরে শক্ত হয়ে আটকে যায়, প্রথা ভাঙ্গার নিয়মটি সেখানে অবৈধ।

এটি যেমন চিরন্তন সত্য যে, পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীর নিজ নিজ প্রথা থাকে তেমনি শহীদ মো: তোফাজ্জল ইসলামের মতে এটিও প্রথার সঙ্গে লুকিয়ে থাকা এক ধরনের জীবনদর্শন। কিন্তু যে প্রথা ঘুনপোকার মতো সমাজকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, মানুষে মানুষে, বিভাজন তৈরি করেছে সেখানে আর যাই হউক দর্শনের কোন জায়গা নেই। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই শুরু থেকেই মানুষ কেবল পৃথকীকরণে বিশ্বাসী। শক্তি, বর্ণ এবং সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিভাজন, এমনি হয়তো আরো কত নাম না জানা অগনিত বিভাজন, কিন্তু এখানেই শেষ নয় বিভাজন সৃষ্টি করে বিভেদ এবং বিভেদ থেকে কতৃত্ব। পৃথিবীর ইতিহাসের যেখান থেকেই শুরু হউক না কেন শহীদ মো: তোফাজ্জল ইসলামের মতে সবই এক, সে কেবল বিভাজনের নামে শুধু কর্তৃত্বই দেখে এখানেই তার বিরোধীতা। এখানেই পথের পাঁচালির কারিশমা। সে কোনমতে সম্পদের বিন্যাস যা তার হাতে নাই তার উপর ভিত্তি করে কোন সমাজপুষ্ট খোলবিন্যাসে আবদ্ধ হতে চায় না।

"আগামী শতাব্দী হবে নিম্ন - মধ্যবিত্তের ২২ বছর আগের সেই লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পূর্বেই অকাতরে স্বদেশের মায়া ছেড়ে চলে গেলে ও একবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্তের রূপরেখার সাথে তার পথ দেখানো রূপরেখার অমিল ছিল। রং মিস্ত্রি শহীদ মো: তোফাজ্জল

ইসলাম সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিল আর অবাক হচ্ছিল। চুতদর্শী বয়সের সহজ মনের একটি ছেলে যার বেড়ে উঠা একটি মধ্যবিত্ত পরিবেশে তিনি সমাজের অনেক রূপ না দেখলেও উদ্ভট, শত বছরের দাসত্ব আর হীনম্মন্যতা দেখে শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পন করেন। তার নিকট এই কথাগুলো স্বপ্নের মতো হতেই পারে। তাই তিনি বৃত্তের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সমাজের যে শ্রেণিবিণ্যাস তা প্রত্যাখান করে। কেননা এই কথা সাত্যি যে তার দেখানো স্বপ্নে ৫ আগস্ট ২০২৪ এ গণবিপ্লবে সম্পৃক্ত সকল ছাত্র-জনতা বিমোহিত হবে।

শহীদ পরিচিতি

একবিংশ শতাব্দীতে ১ লক্ষ ৫৭০ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে কিশোর- কৈশোরের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শহীদ মো: তোফাজ্জল ইসলাম। তার এই ধরনের সাহস ও বীরত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আগামীর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মের নিকট অনুপ্রেরণা জোগাবে। যা সত্যিই বিরল! মাত্র ২২ বছরের যুবক এমনকি কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা ঐতিহাসিক গণআন্দোলন ১৪৫- আগস্ট ২০২৪ স্বৈরশাসক পতনে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃত শহীদ মো: তোফাজ্জল ইসলাম হবিগঞ্জ জেলার যাত্রাপাশা ইউনিয়নে জাতুকর্ণ পাড়া গ্রামে জম্মগ্রহন করেন। যার জন্মসাল ছিল ২৪-১০-২০০২ তারিখে । তিনি পেশায় ছিলেন একজন দিনমজুর। তিনি বানিয়াচং থানায় সকলের কাছে একজন রং মিস্ত্রি হিসেবে পরিচয় পেলেও তার আচার-আচরণ, চলা ফেরায় সবাই মুগ্ধ ছিলেন। জন্মদাতা বাবা ও মা ছাড়াও বড় ভাইয়ের তেমন কোন আয় পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে পিতার পেশা ছিল কৃষক। অল্প পুঁজি নিয়ে সমাজে বৃত্তবানদের নিকট থেকে পাঁচশতক জমি বর্গা স্বরুপ চাষাবাদ শুরু করলেও খুব বেশি আর্থিকভাবে লাভবান হননি। যার দরুণ পরিবারে এখনো অভাব অনটন লেগেই আছে। তার পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। সংসারে উপার্জনের অবস্থা খুবই খারাপ দেখে পড়ালেখা ত্যাগ করে হাল ধরার জন্য রং মিস্ত্রির কাজ করতেন শহীদ মো: তোফাজ্জল ইসলাম। জম্মদাতা বাবা ও তার আয়ের উপর নির্ভর করে পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটামোটি ভালোই চলছিল। হঠাৎ গণআন্দোলনে উপার্জনক্ষম ছেলের মৃত্যুতে তার পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ে। নির্ভিক, নির্লোভ, সাহসী ও নিরহংকারী শহীদ মো: তোফাজ্জল ইসলাম মানুষ হিসেবে খুবই অমায়িক ছিলেন। সাহসী শহীদ তোফাজ্জল একইসাথে সদা হাস্যোজ্জ্বল, স্মার্ট, ভালো ফুটবলার ও ক্রিকেটার ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিতেন। তার দারাজ কণ্ঠের স্লোগান খুবই উচ্চস্বরে ধনিত হতো বলেই তার প্রতি পুলিশ ও ফ্যাসিস্ট সরকারের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা গুন্ডা ছাত্রলীগের আক্রোশ ছিল প্রবল।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

অকুতোভয় সাহসী শহীদ তোফাজ্জল ইসলাম কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রারম্ভিক থেকেই নিজ পেশা রং মিস্ত্রির পাশাপাশি মিছিল মিটিং-এ সম্পৃক্ত থেকে জাতুকর্ণ পাড়া এলাকায় নেতৃত্ব দিয়ে

আসছিলেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে নিজ এলাকা থেকে আমজনতা কে সাথে নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে বানিয়াচং থানার সামনে পৌছালে স্বৈরশাসক, ভোটারবিহীন তথা জনসমর্থনহীন প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্র বিনষ্টকারী শাসক, এমনকি হৃদয়ে লালিত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নে দেখা খুনি হাসিনার পেটোয়া বাহিনী যথাক্রমে পুলিশ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামিলীগের সন্ত্রাসীরা ধাওয়া করে। হঠাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে এক পর্যায়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ও তার দোসর পুলিশ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্তৃক গুলি ছুঁড়লে তৎক্ষনাত শহীদ তোফাজ্জল ইসলাম গুলি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপর দেশে দেড়যুগ ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ত্রাসসৃষ্টিকারী, টেন্ডারবাজী ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে জনগনের সম্পদ লুন্ঠনকারী, ধর্ষকসহ বিভিন্ন তকমায় স্বীকৃতি পাওয়া ছাত্রলীগের সদস্যরা এসে আহত তোফাজ্জল ইসলামকে টেনে-হিঁচড়ে থানার মধ্যে নিয়ে যায়। এরপর পর্যায়ক্রমে ঘাতক পুলিশ ও খুনি ছাত্রলীগ উভয়ই বন্দুকের নল ও লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। এভাবে শহীদ তোফাজ্জল ইসলামের ২২ বছর সংগ্রামী জীবন শেষ হয়ে যায়। যা কখনো কল্পনাতীত ছিল না।

শহীদ সর্ম্পকে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর অনুভূতি

শহীদ তোফাজ্জলের চাচাত ভাই মো: শহিদুল ইসলাম বলেন, "তোফাজ্জল ইসলাম ছিলেন অত্যন্ত একজন ভাল প্রকৃতির লোক। ধর্মভীরু শহীদ তোফাজ্জল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে নিয়মিত জামায়াতের সহিত আদায় করতেন। দিনমজুর শহীদ তোফাজ্জলের মুখের ভাষা ছিল খুবই মিষ্টি। তাই সাদামাটা জীবন গড়ার সাথে সাথে সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে অন্যায়, বৈষম্যহীনতার মত কোন কাজ দেখলে প্রতিবাদী হয়ে স্বভাব চরিত্রে সমুচিত জবাব দেওয়ার চিত্রও ফুটে উঠত সদা টলমলে ২২ বছরের যুবকের শহীদী চেহারায়।

গণআন্দোলনের সময় যখন ছাত্ররা বানিয়াচং থানার সামনে জড়ো হতে লাগল তখন শহীদ তোফাজ্জল ইসলাম তৎক্ষণাত বাসা থেকে বের হয়ে ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে আন্দোলন চলছে, চলবে বলে স্লোগান দিতে থাকে, যা অবিশ্বাস্য ছিল। যার কারণে পেটুয়া বাহিনী পুলিশ ও ছাত্রলীগের আক্রোশ তার প্রতি বেশি ছিল।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	:	শহীদ মো: তোফাজ্জল হোসেন
জন্ম তারিখ	:	২৪-১০-২০০২
পেশা	:	শ্রমিক (দিনমজুর)
জন্মস্থান	:	জাতুকর্ন পাড়া, হবিগঞ্জ
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম: জাতুকর্ণ পাড়া, ইউনিয়ন: যাত্রাপাশা, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ
পিতা	:	আ: রউফ মিয়া, পেশা: কৃষক, বয়স: ৫৫ বছর
মাতা	:	হেনা বেগম, পেশা: গৃহিনী, বয়স: ৪৫ বছর
পরিবারের সদস্য	:	তিন ভাই ও এক বোন
ঘটনার স্থান	:	বানিয়াচং থানার সামনে
আক্রমণকারী	:	ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর পুলিশ ও পেটুয়া ছাত্রলীগ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	:	৫ আগস্ট ২০২৪
মৃত্যুর সময়	:	দুপুর ১১.৩০ মিনিট
শহীদের কবরের অবস্থান	:	নিজ গ্রাম

শহীদ মো: আশরাফুল আলম

ক্রমিক : ১১৩

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০৭

প্রাথমিক জীবন

শহীদ মো: আশরাফুল আলম ২০০৬ সালে হবিগঞ্জের জাতুর্ণপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: আব্দুর নুর ও মাতা মোসা: মাহমুদা বেগমের তিন মেয়ে ও এক ছেলের পর চাঁদের আলো হয়ে জন্মগ্রহণ করেন আশরাফুল। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হওয়ার পরেও দারিদ্রতা তাকে পিছনে টেনে ধরেছে। পরিবারের মুখে হাসি ফোঁটানোর জন্য তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেই সমাপ্তি টানেন। ছোটবেলা থেকেই একটি কাঠের দোকানে কাজ নেন। খুব মনোযোগের সাথে কাজ করতেন তিনি। কারণ তার চিন্তা ছিল- ভালো করে দ্রুত কাজ শিখে অনেক টাকা উপার্জন করতে হবে; না হয় বোনদের বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। কাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঠে চাষ করতেন এবং মাঝে মাঝে নদীতে মাছ ধরতে যেতেন। গ্রামের সবাই তাকে পরিশ্রমী ছেলে হিসেবে চিনতো।

আন্দোলনে বন্ধুদের সাথে বানিয়াচং থানার সামনে মিছিল করতে যান। কয়েক ঘণ্টা চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। সাধারণ ছাত্র-জনতা তাদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের ভারী অস্ত্র ও রাবার বুলেটের সামনে আন্দোলন অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। আশরাফুলের বন্ধুরা যখন পুলিশের গুলি থেকে বাঁচার জন্য পালানোর চেষ্টা করতেছিল তখন আশরাফুল বলল মৃত্যু কপালে থাকলে কেউ বাঁচাতে পারবে না আর যদি মৃত্যু না থাকে তাহলে বুলেটের আঘাতেও মৃত্যু হবে না।

শাহাদাতের ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

ফুল কখনো নিজের জন্য ফোটে না সে নিজেকে অপরের জন্য প্রস্ফুটিত করে। আশরাফুল আলম ফুটে উঠেছিল তার পরিবারের জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগে সন্ত্রাসী সংগঠন ও তার পোষা সরকারি বাহিনী আশরাফুলের মত অনেক ফুলকে সুন্দরভাবে ফোটার আগেই ছিঁড়ে ফেলেছে। ফুল যদি সুরভি ছড়ানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ঝরে পড়ে তখন আর কোন কিছু ভাল লাগে না। আর সে ফুল কেউ ইচ্ছা করে নষ্ট করে তাহলে । শহীদ মো: আশরাফুল আলম তেমনি একটি ফুল যিনি সুরভি ছড়ানোর ঠিক আগ মুহূর্তে বাতিলের নির্মম বুলেটের আঘাতে ঝরে পড়েছে।

৫ আগস্ট, আশরাফুল আলম সকালে ঘুম থেকে উঠে তার বাবার সাথে ফজরের নামাজ আদায় করে বিলে মাছ ধরতে বের হন। এমন সময় তার এলাকার বন্ধুরা এসে বলে, "আশরাফুল আজ আমরা সকাল সকাল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে বানিয়াচং থানার সামনে মিছিল করতে যাব। তুই কি যাবি আমাদের সাথে?" সাথে সাথে আশরাফুল বলে, যাবো না কেন? স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন না করি তাহলে তো আমাদের বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।জাল রেখে বন্ধুদের সাথে চলে যাওয়ার জন্য বাবা ও মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয় আশরাফুল। মা-বাবার চোখের পানি উপেক্ষা করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হতে আশরাফুল অনেকটা জোর করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বন্ধুদের সাথে। আশরাফলের আম্মু চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে আল্লাহ যেন তোকে ভালো রাখে আর এই জালিম সরকারকে যেন উচিত শিক্ষা দেয়। কে জানে এটাই ছিল তার শেষ যাওয়া।

দিনটি ছিলো ৫ আগস্ট, সোমবার, সকাল ১১ টা। কিশোর আশরাফুল আলম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা

তাই চলো আমরা সামনের দিকেই এগিয়ে যাই। এক সময় মিছিলের উপর বানিয়াচং থানার পুলিশ, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের কুখ্যাত ক্যাডারেরা নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। একটি গুলি এসে তার বুকের বাম পাশে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে আশরাফুল আলম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরিসমাপ্তি হয় পরিবারের একমাত্র অবলম্বন, সাহসী বীর ও একটি ফুটন্ত ফুলের প্রাণ পাখি আশরাফুলের বর্ণালী জীবনের।

শহীদের বন্ধুর প্রতিক্রিয়া

জীবনে অনেক বন্ধু দেখেছি অনেক বন্ধুর সাথে মিশেছি কিন্তু আশরাফুলের মত এত বিশ্বস্ত বন্ধু আমি আমার জীবনে পাইনি। সে কোন কথা দিলে যে কোন মূল্যে কথা রাখার চেষ্টা করত। তার নিজের চাইতেও বন্ধুদের বেশি ভালোবাসতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মো: আশরাফুল আলমের পারিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তিনি কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি খাল-বিলে মাছ

ধরে তা বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। তার বড় ভাইয়ের মাসসিক সমস্যার কারণে কোন কাজ করতে পারেনা। তাই তার একমাত্র আয়ে ৩ বোনের পড়ালেখার খরচ চালাতেন। তার কোন ফসলি জমি-জমা নেই। ঘরের ভিটাটুকুই তাদের একমাত্র সম্বল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ছোট। তাদের বসবাসের ঘরটি টিনের জরাজীর্ণ ছাউনি দিয়ে নির্মিত। বৃষ্টি এলে ঘরের মধ্যে টিনের চাল থেকে পানি পড়ে। তার বাবা একজন গরিব কৃষক। তাদের ফসলি জমি না থাকায় অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করতে হয়। তার বাবাও বৃদ্ধ। বর্তমানে আশরাফুলের বাবা ও তেমন কাজ-কর্ম করতে পারেন না। তাই তাদের এই বড় সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন শহীদ আশরাফুল আলম। তার মৃত্যুতে পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎসও বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এই পরিবারটি মানবেতর জীবন যাপন করছেন। আশরাফুল আলমের মেজো বোন রুজমা আক্তারকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। টাকার অভাবে উঠিয়ে দিতে পারছেনা তার বাবা।

শহীদ আশরাফুলের শখ

১. বড় ভাইকে চিকিৎসা সুস্থ করে তোলা।

২. বোনদের বিয়ে দেওয়া।

৩. নিজস্ব কাঠের ফার্নিচারের দোকান দেওয়া।

এক নজরে শহীদ মো: আশরাফুল আলম

পূর্ণ নাম	: মো: আশরাফুল আলম
পিতার নাম	: মো: আব্দুন নুর
মাতার নাম	: মাহমুদা বেগম
জন্ম তারিখ	: ২৫-০১-২০০৬
জন্মস্থান	: জাতুর্ণ পাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: জাতুর্ণ পাড়া ইউনিয়ন: যাত্রাপাশা
থানা	: বানিয়াচং, জেলা হবিগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: পঞ্চম শ্রেণী, পেশা: কাঠমিস্ত্রি
পরিবারের সদস্যদের পরিচয়	: বাবা: আব্দুর নূর (৬০), মাতা: মাহমুদা বেগম (৪৫)
ভাই-বোনদের পরিচয়	: ১. রিপ্পু বেগম (২২): বিবাহিতা ২. রেশমা আক্তার (২০): বিবাহিতা ৩. তাইমা আক্তার (১৮): বৃন্দাবন ডিগ্রী কলেজ, দ্বাদশ শ্রেণী ৪. আব্দুর রকিব (১৬): মানসিক রোগী ৫. তাইয়্যেবা আক্তার (১৪): একাডেমিক উচ্চ বিদ্যালয় দশম শ্রেণী
শাহাদাতের তারিখ ও সময়	: ০৫-০৮-২০২৪ দুপুর ১২:৩০ মিনিট
শাহাদাতের স্থান	: বানিয়াচং থানার সামনে
আক্রমণকারী	: বানিয়াচং থানার পুলিশ
আক্রমণের ধরন	: বুকের বাম পাশে একটি গুলি ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়
জানাজা	: জাতুর্ণ পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ
দাফন	: গ্রামের গোরস্থান

"বাবা আবু সাঈদ ভাইয়াও ছাত্র, আমরাও তো ছাত্র। আমিও যাব মিছিল করতে। তুমি কিন্তু বাধা দিওনা।"

শিশু শহীদ মো: হাসাইন মিয়া

ক্রমিক : ১১৪

আইডি: সিলেট বিভাগ ০০৮

২০১২ সালের জুন মাসে পৃথিবীতে আগমন করে মাত্র ১২ বছর বয়সেই ইতিহাসের বিপ্লবী পাতায় রক্তাক্ষরে নিজের নাম লিখে গেল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা চব্বিশের বিপ্লবে হবিগঞ্জের সর্বকনিষ্ঠ শহীদ মো: হাসাইন মিয়া।

শহীদের পরিচয়

শিশু শহীদ মো: হাসাইন মিয়ার জন্ম ২০১২ সালের ১০ জুন। হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার যাত্রাপাশা গ্রামে। বাবা জনাব মো: ছানু মিয়া এবং মা জনাবা মোসা: সাজেদা আক্তার। তাঁদের ছয় সন্তানের মধ্যে হাসাইন দ্বিতীয়।

মাত্র ১২ বছর বয়সে সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। নিজের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে একজন শিশু শহীদ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো: হাসাইন মিয়া।

গ্রামবাংলার সহজ সরল শিশু হাসাইন

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ। এদেশের পুণ্যভূমি সিলেট। বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের গ্রাম যাত্রাপাশা। এ গ্রামে জন্ম নিয়েছিলো হাসাইন নামের একটি শিশু। গ্রামের কাদা-মাটি-পানি আর আলো-বাতাস গায়ে মেখে হাটি-হাটি পা-পা করে বেড়ে উঠা তার। গ্রামের আর দশটি শিশুর মতো মেঠোপথে খালি পায়ে হাটা। পাহাড়-টিলায় চড়েবেড়ানো। চা বাগানে লুকোচুরি খেলা। কখনো একাকী বসে দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠের দিকে উদাস মনে তাকিয়ে থাকা। বাবার সাথে মসজিদে যাওয়া। সহপাঠীদের সাথে মক্তবে ও স্কুলে যাওয়া। বিকেলে মাঠে ছোট বড়ো সকলের সাথে মিলেমিশে খেলা। দলবেঁধে পুকুরে, খালে, নদীতে ঝাপ দেয়া। ডুবিয়ে ডুবিয়ে দুচোখ লাল করে ফেলা। বাড়িতে ফিরে মায়ের আদুরে বকা খাওয়া। সব বকা, সব শাসন ভুলে পরের দিন আবার একই কাজে মনোযোগী হওয়া। এইসব ছিলো তার প্রতিদিনকার জীবনের অংশ। এতকিছুর পরেও এক দিকে বাবার সাথে মাছ ধরতে যাওয়া। ক্ষেতে কাজ করা। কাঁচা সবজি বিক্রিতে সাহায্য করা। অপর দিকে বাড়িতে মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা। ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করা। সাধ্যমতো তাদের পড়ালেখায় সাহায্য করা। এসব কাজে কখনো কোনো অবহেলা ছিলো না শিশু হাসাইন মিয়ার। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দচিত্তে এসব কাজ সম্পাদন করতো সদা হাস্যোজ্জ্বল এই শিশুটি। তাইতো সে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশিদের কাছে যেমন আদরের ছিলো তেমনি প্রিয়পাত্র ছিলো। সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব আর শিক্ষকদের কাছে কচি চাঁদের মতো হাসি দিয়ে সবার হৃদয় জয় করে নিতো শহীদ হাসাইন। গ্রামবাসীরাও যেন প্রশান্তি পেতো তার নির্মল সহচর্যে।

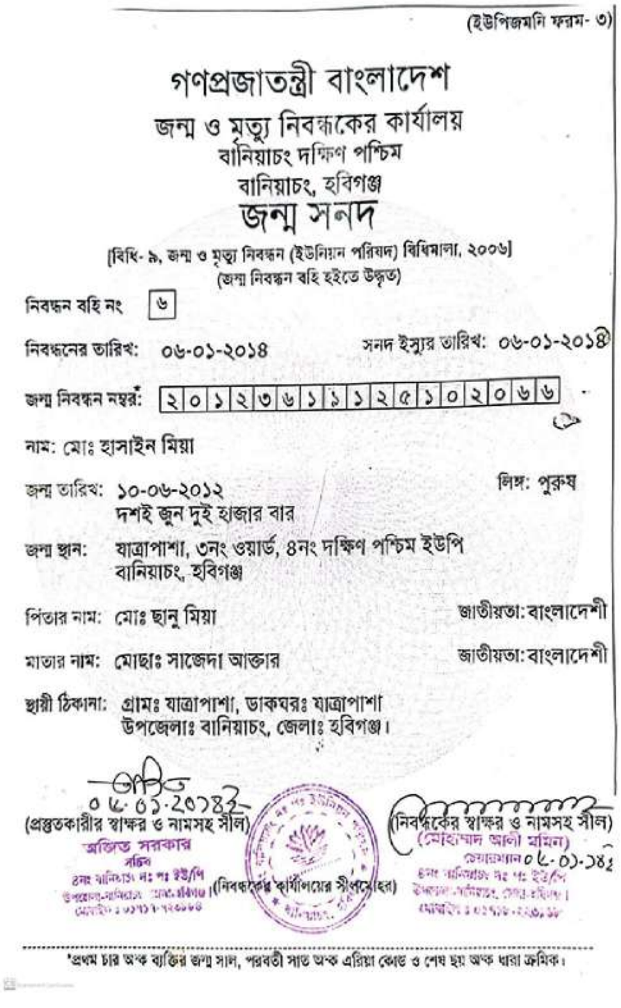
(ইউপিজমনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
বানিয়াচং দক্ষিণ পশ্চিম
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৬

নিবন্ধনের তারিখ: ০৬-০১-২০১৪ সনদ ইস্যুর তারিখ: ০৬-০১-২০১৪

জন্ম নিবন্ধন নম্বর*: ২০১২৩৬১৯১২৫১০২০৬৬

নাম: মোঃ হাসাইন মিয়া

জন্ম তারিখ: ১০-০৬-২০১২ লিঙ্গ: পুরুষ
দশই জুন দুই হাজার বার

জন্ম স্থান: যাত্রাপাশা, ৩নং ওয়ার্ড, ৪নং দক্ষিণ পশ্চিম ইউপি
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

পিতার নাম: মোঃ ছানু মিয়া জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোছাঃ সাজেদা আক্তার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ যাত্রাপাশা, ডাকঘরঃ যাত্রাপাশা
উপজেলাঃ বানিয়াচং, জেলাঃ হবিগঞ্জ।

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল) অজিত সরকার সচিব
(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)
(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল) (মোহাম্মদ আলী মমিন) চেয়ারম্যান

*প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক ধারা ক্রমিক।

জ্ঞানপিপাসু হাসাইন

শিশুশহীদ হাসাইন কেবলমাত্র ঘুরাফেরা, খেলাধুলা আর বন্ধুদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করেই বেড়াতো না। পারিবারিক কাজে অংশ গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিবেশী আর গ্রামবাসীর কাজেও সাহায্য করতো। সকলের বিপদে আপদে ছুটে যেতো হাসাইন। অথচ এতোকিছু করেও পড়াশুনা আর জ্ঞান-সাধনার আগ্রহে মোটেও ভাটা পড়েনি তার। সে মক্তবে যেমন ছিলো আরবি আর দ্বীনি শিক্ষায় পারদর্শী তেমনি স্কুলের পড়ালেখায়ও ছিলো মেধাবী, বুদ্ধিমান ও চৌকস। সহপাঠীদের সাথে সবসময় সে আপন ভাই-বোনের মতো মেশার চেষ্টা করতো। নিজের পাঠ শেখার পাশাপাশি অন্যদেরকেও যথাসাধ্য সাহায্য করতো হাসাইন। এক কথায়, ছোট বড়ো সবার সাথে অবাক করার মতো সুসম্পর্ক ছিলো তার। এর সুফলও পেয়েছিলো সে।

শহীদ হাসাইনের ছিলো বই পড়ার নেশা। পাড়ার আর স্কুলের বড়ো ভাই, ধর্মপরায়ণ চাচা-দাদা ও স্কুলের প্রিয় শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বই নিয়ে পড়তো জ্ঞানপিপাসু হাসাইন। একটা পড়া শেষ করে ফিরত দিয়ে আর একটা চেয়ে নিতো। এতো অল্প বয়সেই বিভিন্ন ধর্মীয় বই, নবী-রাসূল আর সাহাবিদের জীবনী ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য পড়তো সে। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি লেখকদের রচিত শিশুতোষ ছড়া-কবিতা, গল্প, রূপকথা, কল্পকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, নাটক, সাইন্স ফিকশন, কিশোর উপন্যাস আর অনুবাদ পড়তো। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ম্যাগাজিন এবং পত্রপত্রিকা পড়তো হাসাইন। স্কুলের পাঠ শেষ করার পরে, অবসর সময়ে, খাবারের জন্য রান্না হতে দেরি হলে, স্কুল বা মক্তব বন্ধ থাকলে, কোথাও বেড়াতে গেলে, এরকম বিভিন্ন সময়ে সুযোগ পেলেই বই পড়তো শহীদ হাসাইন। একদিন খাবারের সময় হয়েছে। হাসাইন খাবার খেতে এসে দেখে, মা এখনো রান্না করছে। সে ঘর থেকে একটা বই নিয়ে রান্না ঘরে এসে মায়ের পাশে বসে পড়া শুরু করলো। চুলোয় লাকড়িটা নাড়া দিতে দিতে নিজের বইপাগল ছেলেটিকে মা জিজ্ঞেস করেন, এতো বই পড়ে কি হবে বাবা? মিষ্টি ছেলে হাসাইন মুচকি হেসে মাকে উত্তর দেয়, কি হবে তা তো জানিনা মা। ভালো লাগে তাই পড়ি। শুধু জানি যে, বই পড়ে অনেক বড়ো হওয়া যায়; অনেক বড়ো! ছোট্ট ছেলের এমন উত্তর শুনে মাও হাসেন। আর মনে মনে দোয়া করেন, আল্লাহ কবুল করুন।

শুধু তাই নয়। বই পড়ার পাশাপাশি বাবার মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষনীয় লেখা আর ভিডিও দেখতো হাসাইন। ফেইসবুক, ইউটিউবে কত রকমের ভিডিও! হাসাইন কোনোটা বুঝে আবার কোনোটা বুঝে না। তবে সে ভাবতে পারে; চিন্তা করতে পারে। আর এটা সে পারে বেশি বেশি বই পড়ার কারনে। একথাও বুঝতে পেরেছে স্কুলের এক শিক্ষকের কাছ থেকে । শিক্ষক সেদিন 'আমার জীবনের লক্ষ্য' রচনা পড়াতে গিয়ে অনেকের সাথে হাসাইনকেও জিজ্ঞেস করেন, "তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?"

হাসাইনের সাবলীল উত্তর, "বড়ো হওয়া"। শিক্ষকের আবার প্রশ্ন, "কেমন বড়ো?" এবার হাসাইন একটু চিন্তায় পড়ে যায়। তবে বেশি সময় লাগেনি। কিছুটা আবেগের সাথে বলে উঠে, "আকাশের মতো বিশাল ; পাহাড়ের মতো উঁচু ; ফসলের মাঠের মতো বিস্তৃত আর সাগরের মতো গভীর"। তারপর স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "পারবো না স্যার?" শিক্ষক অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তারপর তিনিও হাসিমুখে জবাব দিলেন, "স্বপ্ন যখন দেখতে পেরেছো, নিশ্চয়ই পারবে"। তারপর শিক্ষক হাসাইনের উদাহরণ দিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদেরকেও বেশি বেশি বই পড়ার অভ্যাস করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সমসাময়িক হাসাইন

দারিদ্র সীমায় অবস্থান করা একটা পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান হাসাইন। অভাবের সংসার টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে মা-বাবা আর বড়ো ভাইয়ের সাথে তাকেও অংশগ্রহণ করতে হয়। বেশির ভাগ সময় এখানে স্বাদ আর সাধ্যের মিলন হয় না। তবুও পড়াশুনা আর পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পরে যতটুকু সময় সুযোগ পাওয়া যায় ততটুকুই সে নিজের জন্য ভালো কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করে। প্রাইমারি পাশ করে হাই স্কুলে উঠে হাসাইন। সে এখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। নতুন বছরে তার বইয়ের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, স্কুলের পড়াশুনাও তেমন বেড়েছে। তারপরও সে নিয়মিত অন্যান্য বই পড়ে। দরিদ্র পিতার কমদামি পুরাতন এন্ড্রয়েড মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন কিছু জানা আর শেখার চেষ্টা করে হাসাইন। স্কুলে বন্ধুর সংখ্যাও বেড়েছে তার। সেখানেও নিয়মিত গপ্পো সপ্পো করে, বড়ো ভাইয়াদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে। বন্ধু, সহপাঠী আর বড়ো ভাইয়াদের সাথে আড্ডায় চলে ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলার গল্প। যাত্রাপাশা গ্রামের মানুষের গল্প। এই গল্প এক সময় জেলা শহর হয়ে চলে যায় বিভাগীয় শহর সিলেট, রাজধানী ঢাকা। তারপর সমস্ত বাংলাদেশ ঘুরে গল্প ছুটে চলে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ইউরোপ, আমেরিকা, চিন, রাশিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি দেশে। সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে একসময় গল্প চলে আসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, ইউটিউবে। সেখানে কতজনের কত কথা! কত রংয়ে-ঢংয়ে পেঁচানো-বাঁকানো কথাবার্তা! কত রকম হাসি ঠাট্টা করে একজন আরেকজনকে! স্কুলের পড়ালেখা নিয়েও বিভিন্ন সমালোচনা সেখানে। সমালোচনা তো থাকবেই। ইদানীং স্কুলে কি সব পড়ায় তা আসলে কেউ বুঝে না। কিসব আলু ভর্তা বানানো, বিছানা গুছানো, শরিফ থেকে শরিফা হয়ে যাওয়া আরও কতো কতো হাবিজাবি জিনিস নাকি বইয়ের মধ্যে দিয়ে রেখেছে বাস্তব শিক্ষা বিমুখী পশ্চাৎপদ সরকার। স্কুলের ক্লাস একটা হলে দুইটা হয় না এমন অবস্থা। যারা এমনিতেই ফাঁকি দিতে চায় তাদের জন্য হয়েছে মহা আনন্দ। হাই স্কুলে এসে হাসাইন খেয়াল করে ক্লাসে অধিকাংশ শিক্ষক পড়াশোনার চেয়ে বেশি বলেন কোচিংয়ের কথা; প্রাইভেটের কথা। শিক্ষকগণ ক্লাসের বেশিরভাগ সময় গান-বাজনা, অঙ্গভঙ্গি আর গল্প গুজব করেই কাটিয়ে দেন।পড়ালেখার আনন্দটাই যেন হারিয়ে ফেলেছে সবাই। এক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়
লোকনাথ রমণ বিহারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
ডাক ঃ যাত্রাপাশা, উপজেলা ঃ বানিয়াচং, জেলা ঃ হবিগঞ্জ।
Email: lrnbgovtschool1896@gmail.com
Phone: 0832-456046
EIIN NO: 129348
School Code No: 1900

সূত্র ঃ স্মারক নং-
তারিখ ঃ..........................

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ হাসাইন মিয়া ,পিতাঃ মোঃ ছানু মিয়া, মাতাঃ সাজিদা বেগম , গ্রামঃ যাত্রাপাশা, ডাকঘরঃ যাত্রাপাশা , উপজেলাঃ বানিয়াচং, জেলাঃ হবিগঞ্জ। সে অত্র লোকনাথ রমণ বিহারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ শ্রেনীর একজন ছাত্র। শ্রেণী রোলঃ ৭৩ তার জন্মতারিখ ১০-০৬-২০১২ খ্রীঃ।

তার আচার - আচরণ বেশ সন্তোষজনক ছিল।

২২/০৮/২০২৪
ত্রিফল চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
লোকনাথ রমণ বিহারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
বানিয়াচং,হবিগঞ্জ।

বড়ো ভাই জানালেন এইসব উল্টা-পাল্টা শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন সাইট বা ব্লগে ইদানীং বেশ লেখা-লেখি হচ্ছে। কেউ কেউ আবার ইন্টারনেটে ছেড়ে দিচ্ছেন শিক্ষকদের সব হাস্যকর প্রশিক্ষণের ভিডিও। ফ্যাসিস্ট সরকার আবার নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্য এগুলোকে মানুষের বানানো ভিডিও বলে মিথ্যাচার করছে। এরকম নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলে বন্ধুদের মাঝে। তারপর একসময় সকল গল্পকে সাথে নিয়ে বাড়ির পথে হাটে শহীদ হাসাইন। এভাবেই চলে যায় আরও ছয়টি বছর।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে ফেইসবুকে একটা পোস্ট দেখে শহীদ হাসাইন। পুড়োটা পড়ার শেষে যা বুঝলো তার সারাংশ হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে একটা সংগঠন তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভাইয়েরা। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহবান জানানো হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা হাসাইনের কাছে নতুন মনে হচ্ছে। তেমন কিছুই সে বুঝলো না। স্কুলে গিয়ে কোনো কোনো সহপাঠীদের মুখেও শুনে এই খবর। কারো কারো বড়ো ভাই-বোনও নাকি আছেন এই আন্দোলনের সাথে। নবম-দশম শ্রেণির কয়েকজন ভাইয়ার কাছে কিছুটা জানার চেষ্টা করে হাসাইন আর তার বন্ধুরা। বড়ো ভাইয়েরা কিছুটা বুঝিয়ে দিলেন তাদের। ভাইয়াদের কাছে জানা গেলো, বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার এ কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের দাবিতে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। লাগাতার আন্দোলনের ফলে ৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর ২০২১ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন। ৬ জুন

২০২৪ হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (Anti-discrimination Students Movement) ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়। এরপর থেকেই পরিস্থিতি বুঝে তাদের পক্ষ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা আসতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনে গুন্ডা ছাত্রলীগ যুবলীগ আর আওয়ামীলীগসহ ক্ষমতাসীন দলের অন্য কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। ১৬ জুলাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে একটা অপ্রত্যাশিত ভিডিও পায় হাসাইন। ভিডিওতে সে দেখে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করছে। অকুতোভয় আবু সাঈদ দুইহাত প্রসারিত করে বুক পেতে দিয়েছে ফ্যাসিস্ট সরকারের পদলেহনকারী বজ্জাত পুলিশের কাছে। কতোটা কাপুরুষতা আর কতটা নির্লজ্জতার সাথে তারা গুলি করো আবু সাঈদের বুকে, পেটে।

হাসাইনের বুকটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো ভিডিওটা দেখার পর। ঠিক কতোক্ষণ যে চুপ হয়ে ছিলো বলতে পারছে না। ভিডিওটা বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে গিয়ে দেখলো, কিছুক্ষণ আগেই কয়েকজন বন্ধু তাকে শেয়ার করে রেখেছে এই ভিডিওটি। কেমন যেন একটা অস্থিরতা কাজ করছে তার মাঝে। ব্যাপারটা আর সে সহ্য করতে পারছে না। মোবাইলটা রেখে উঠে যায় হাসাইন। স্কুলটাও বন্ধ করে দিয়েছে আওয়ামী সরকার। ইচ্ছে করলেই এখন বন্ধুদের সবাইকে একজায়গায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু হাটাহাটি করে আসলো হাসাইন। কিছুক্ষণ পরে বাড়িতে ফিরে আসলে তার মা সদাহাস্যজ্বল ছেলের মন খারাপের কারন জিজ্ঞেস করলে হাসাইন মাকে সারাদেশে শিক্ষার্থীদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের কথা জানায় এবং আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার ভিডিওটি দেখায়। ভিডিওটি দেখে মোছা: সাজেদা আক্তারেরও খুব খারাপ লাগে। তাঁর চোঁখে মুখে বিস্ময়, একটা ছেলেকে এভাবে নির্বিচারে মেরে ফেললো পুলিশ!

তারপর নিজের ছেলেকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। হাসাইনও স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পুরোপুরি পারে না। সেদিন ঠিক মতো খেতেও পারেনি সে। পড়ায়ও মন বসাতে পারেনি। তাই একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পরেছিলো। ভোরে বাবার সাথে ফজর নামাজ পড়ে ফেরার সময় কয়েকজন প্রতিবেশী চাচা-দাদা আর বড়ো ভাইদের কাছে জানতে পারে, গতকাল শুধু আবু সাঈদ একা নয়, সারা দেশে অন্তত ছয়জন শিক্ষার্থী শহীদ হয়েছে।

শুধু তাই নয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সরকারি বেসরকারি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। খুনি সরকারের প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় ধরপাকর শুরু করেছে। খবর শুনে শিশু হাসাইনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে আসলেন বাবা মো: ছানু মিয়া। তারপর প্রতিদিন আন্দোলনের খবর রাখে ছোট্ট হাসাইন। অনেক কথা অনেক ভাষা পুরোপুরি না বুঝলেও সেদিন থেকে হাসাইন আরো মনোযোগ দিয়ে নজর রাখতে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে।

ঠিক একদিন পরে ১৮ জুলাই সারাদেশে শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচিরতে অতর্কিতে হামলা করে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা প্রশাসন। রক্তখেকো হাসিনার নির্দেশে নিষ্ঠুর গণহত্যা চালায় তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসংখ্য ছবি ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে। একটা ভিডিও সবচেয়ে বেশি ভাইরাল হচ্ছে। শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। টিয়ারশেলের গ্যাস তার চোখে লাগে। চোখ মুছতে মুছতেও সে সবাইকে পানি দিয়ে যাচ্ছে। ডেকে ডেকে বলছে, "ভাই পানি লাগবে কারো, পানি?" আর এভাবেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে পানি নিয়ে ছুটতে ছুটতেই মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে মুগ্ধ। ছোট্ট হাসাইন আর নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। সে এসব কী দেখছে? এসব কী শুরু হয়েছে প্রিয় বাংলাদেশে! ঐদিনই সারাদেশে বিজিবি নামায় অবৈধ সরকার। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। দুইদিনের জন্য কারফিউ জারি করে নির্লজ্জ ফ্যাসিস্ট

হাসিনা সরকার। তারপর একটার পর একটা দিন গেছে আর ফাল্গুনের গাছের শুকনো পাতার মতো দল বেঁধে ঝরে গেছে বাংলার সোনার সন্তানেরা। প্রতিদিন গণহত্যা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে রাজপথে নামে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। আরও ভয়ংকর হয়ে উঠে খুনি সরকারের পৈচাশিকতা। কি নারী কি পুরুষ; কি যুবক কি শিশু; কোনো কিছুই বিবেচনা করে না খুনি হাসিনার গুন্ডাবাহিনীরা। যাকে যেভাবে পাচ্ছে তাকে সেভাবেই হত্যা করছে। বাংলাদেশের মানুষ আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। নিজের সন্তানদের রক্ষায় রাজপথে নেমে এসেছে সবাই। এবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন হয়ে গেছে এদেশের আপামর জনতার আন্দোলন; গণমানুষের আন্দোলন। সবাই মিলে একযোগে ডাক দিলো নতুন এক বিপ্লবের। সব দফা সব দাবি একত্রিত হয়ে নতুন স্লোগান হয়েছে 'এক দফা এক দাবি হাসিনা তুই কবে যাবি?'

এবার প্রতিটি জেলায়, থানায়, গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বিপ্লব। হাসাইনের যাত্রাপাশা গ্রামেও লেগেছে জুলাই বিপ্লবের আগুন। বড়ো ভাইয়াদের সাথে হাসাইনের সহপাঠী আর বন্ধুরাও আন্দোলনে যাবে। খবরটা শুনেই শিশু হাসাইনের মনের মধ্যে কেমন যেনো একটা উত্তেজনা কাজ করছে। যে আন্দোলনে আবু সাঈদ, মুগ্ধ ভাইয়াদের মতো শত শত মেধাবী শিক্ষার্থীরা শহীদ হয়েছে সে আন্দোলনে হাসাইন যেতে চায়। মরবে না বাঁচবে সেই চিন্তা করার এখন সময় নাই। কিন্তু মা-বাবাকে কিভাবে বলবে সেটাই চিন্তার বিষয়। পরের দিন সকালে ফজরের নামাজ পড়ে বাবার সাথে ফেরার সময় দেখা হয় পাড়ার এক বড়ো ভাইয়ের সাথে। তিনি সরকারি কলেজের একজন ছাত্র। কলেজে পড়ালেখা করলেও তিনি খুব পরহেজগার মানুষ। কথা বলার সময় কুরআন হাদিসের রেফারেন্স দেন। মানুষকে নামাজে ডাকেন। মাঝে মাঝে কয়েকজনকে নিয়ে কুরআন হাদিসের আলোচনা করেন। তিনি খুব রাজনীতি সচেতন মানুষ। তিনিই বাবাকে দেশের তাজা খবরগুলো দিলেন। তিনি জানান, ঢাকায় হেলিকপ্টার দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর গুলি ছুঁড়ছে সরকার। একজন শিশু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছে। স্বৈরাচার প্রশাসন কোথাও চার-পাঁচজনকে একত্রিত হতে দেখলেই গুলি করছে। রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, আলেম-ওলামা যে-ই সরকারের এই নৃশংস তাণ্ডবের প্রতিবাদ করছে তার উপরই নেমে আসছে গ্রেপ্তার, জেল-জুলুম, গুম, হত্যা আর নানাবিধ লাঞ্ছনা। গণগ্রেপ্তারে ভরে ফেলেছে সারা দেশের কারাগার। এরকম অনেক সংবাদ শুনা হয় তার কাছে। সব শুনে বাবা ছাত্রদের জন্য অনেক আফসোস করলেন। তারপর সবাই মিলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে বাবার সাথে বাড়িতে চলে আসে হাসাইন। পরের দিন যাত্রাপাশা গ্রামে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর ভোট-চোর খ্যাত অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়ার গুন্ডাবাহিনীর ঘন ঘন আনাগোনা দেখা যায়। তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে ভাড়া করা কিছু লোক নিয়ে ছোট একটা মিছিলও বের করে। ৪ আগস্ট, সরকার পতনের একদফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অবৈধ সরকারের বিপক্ষে সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে সারা দেশে ব্যাপক সংঘাত হয়। অবৈধ স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের নৈরাজ্য যেন একাত্তরের পাকবাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যাকেও হার মানায়। মানুষ যেন দিনে দুপুরে প্রত্যক্ষ করছে ২৫ মার্চের কাল রাত!

পরিস্থিতি এমন দেখে বিক্ষোভকারীরা সারাদেশে নাগরিকদের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির আহবান জানায়। শুরুতে ৬ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি জানানো হলেও পরে তা একদিন আগে ৫ আগস্ট করার ঘোষণা দেওয়া হয়। একটার পর একটা কর্মসূচির কথা শুনে রাজপথে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে শিশু হাসাইনের মন।

আন্দোলনে যোগদান

৪ আগস্ট হাসাইন তার কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুদের কাছে জানতে পারে পরের দিন ৫ আগস্ট এই গ্রাম থেকে অনেকেই আন্দোলনে যাবে। কেউ কেউ গোপনে আজকেই রওনা দিয়েছে। আমাদের স্কুলের অনেকেও যাবে। হাসাইন সব মনোযোগ দিয়ে শুনে আর সিদ্ধান্ত নেয় আন্দোলনে যাওয়ার। কিন্তু সে তার এই মনোবাসনা পরিবারের কারো কাছেই বলেনি। বললে যদি বাবা-মা যেতে না দেয় সেই ভয়ে। অবশেষে পরের দিন ৫ আগস্ট অন্যান্য দিনের মতো হাসাইন এবং তার বাবা ফজরের নামাজ আদায় করে জাল নিয়ে মাছ ধরতে বিলে যায়। কিছুক্ষণ পরে হাসাইনের দূর সম্পর্কের এক দাদা জনাব আলী এসে যোগ দেন তাদের সাথে। আজ ভালোই মাছ পাওয়া যাচ্ছে। মাছ ধরতে ধরতে হাসাইনের বাবা আর দাদা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলেন। অনেকক্ষণ দুজনের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে শহীদ হাসাইন। তার মনে পড়ে যায়, আজকে আন্দোলনে যাবার কথা। বাবা আর দাদার কথার এক ফাঁকে সুযোগ পেয়ে শিশু হাসাইন সাহস করে তার বাবাকে বলেই ফেলে, "বাবা আবু সাঈদ ভাইয়া ছাত্র, আমরাও তো ছাত্র। আমিও যাব মিছিলে। তুমি কিন্তু বাঁধা দিওনা।" ছোট্ট হাসাইনের এমন কথা শুনে তারা দুজনেই হাসেন। হাসাইনের বাবা কিছু মাছ নিয়ে হাসাইনকে বাড়িতে পাঠান। হাসাইন মাছ নিয়ে বাড়িতে আসে। মায়ের হাতে মাছ বুঝিয়ে দিয়ে ভালোভাবে গোসল করে সে। তারপর পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় হাসাইন। গ্রামের রাস্তা ধরে নিজের স্কুলের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় হাসাইন। পথে কয়েকজন সহপাঠীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেয়। কেউ কেউ তার আগেই চলে গেছে। কাউকে কাউকে বাড়ি থেকে ডেকে নেয় সে। এরপর বন্ধুরা সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে দুপুর ১১ টায় পৌঁছে যায় নিজেদের স্কুলের সামনে। সেখানে লোকে লোকারণ্য! স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন পেশার মানুষ। সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ এসেছে আন্দোলনে যোগ দিতে। হাসাইনের প্রিয় কয়েকজন শিক্ষকও এসেছেন। পরিচিত অনেক গ্রামবাসীকেও দেখতে পাচ্ছে হাসাইন। উপস্থিত ছাত্র জনতার সাথে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে যোগ দেয় সাহসী শিশু হাসাইন আর তার বন্ধুরা। এতো দিন পরে যেন বুক ভরে শ্বাস নিত পারছে হাসাইন। আজ তার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। আবু সাঈদ আর মুগ্ধ ভাইয়ার মতো শত শত শহীদদের রেখে যাওয়া আন্দোলনে আজ সে আসতে পেরেছে। নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছে হাসাইন।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

৫ আগস্ট দুপুর ১১ টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে সরাসরি যোগাদান করে অকুতোভয় শিশু হাসাইন। সমবেত জনতার সাথে সে রওনা করে সদর রোডের

দিকে। মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে নানা বিপ্লবী স্লোগানে। আস্তে আস্তে মিছিলের সাথে মিশে যাচ্ছে রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর আর ক্ষেত ক্ষামার থেকে ছুটে আসা জনসাধারণ। তারা যেন এমন একটা মিছিলেরই অপেক্ষায় ছিলো এতো দিন, এতো মাস, এতো বছর!

ক্রমান্বয়ে মিছিলে মানুষ বাড়ছে। বাড়ছে সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে স্লোগান। বাড়ছে মিছিলের দৈর্ঘ্য প্রস্থ। বাড়ছে প্রতিটি পদক্ষেপের গতি। বড়োদের দ্রুত গতিতে হাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ছোটদের রীতিমতো দৌড়াতে হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে মিছিল গিয়ে উঠে থানা রোডে। বাম দিক থেকে আসা আরও একটা মিছিল মিলে যায় হাসাইনদের মিছিলের সাথে। দুপুর ১টায় সম্মিলিত মিছিল থানার কাছাকাছি আসলে দেখেতে পায় রাস্তায় ব্যারিকেট দিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে বানিয়াচং থানার বর্বর পুলিশ বাহিনী। মিছিলকে আর সামনে আগাতে দিবে না তারা। কিন্তু সামনে তো যেতেই হবে। আন্দোলনকারীদের কয়েকজন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করছে। ঠিক এমন সময় অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়া তার বিভিন্ন অস্ত্রধারী গুন্ডাবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে হামলা করে বসে উপস্থিত জনতার উপর। এটা দেখে পুলিশও সাহস পেয়ে যায়। দিগুণ উৎসাহে তারাও সশস্ত্র আক্রমণ করে মিছিলের উপর। হঠাৎ দুই পক্ষের এমন সশস্ত্র আক্রমনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আন্দোলনকারীরা। যে যেদিকে পারছে ছুটে যাচ্ছে নিরাপদ অবস্থানের খোঁজে। আশপাশের দোকানপাটের আড়ালে, অলি-গলি আর বাসাবাড়িতে ঢুকে গেছে কেউ কেউ। কিন্তু ততক্ষণে পুলিশের গুলিতে গেছে কতগুলো তাজা প্রাণ। শহীদের রক্তে আবার রঞ্জিত হলো বাংলার রাজপথ। চারিদিকে মানুষের আর্তনাদ, আহাজারি। মৃত্যুযন্ত্রণার গগনবিদারী চিৎকার। গুলি খেয়ে রাস্তার উপর পরে কাতরাচ্ছে কয়েকজন। সবার সাথে ছুটতে গিয়ে হাসাইন হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে যায় একটা টঙ দোকানের পাশে। কিছুক্ষণ আগেই এখানে দোকানি ছিলো। সামনের বেঞ্চে কয়েকজন লোকও বসে ছিলো। অথচ এখন কেউ নেই। কেউ ভাবতে পারেনি এখানে এভাবে নিরস্ত্র মানুষের দিকে পুলিশ গুলি করতে পারে। কিন্তু তাদের চিন্তাকে ভুল প্রমাণ করে রক্ত পিপাসু পুলিশ ঠিকই গুলি করেছে। শিশু হাসাইন চিন্তা করে সে পালাচ্ছে কেনো? মনে পরে যায় ভিডিওতে দেখা শহীদ আবু সাঈদ ভাইয়ের কথা। সে কি পালিয়েছিলো? না। তবে হাসাইন কেনো পালাবে? সে তো আবু সাঈদের মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে চায় খুনিদের বন্দুকের সামনে। রাস্তা থেকে কারো বিকট চিতকারে ছেদ পরলো হাসাইনের ভাবনায়। তাকিয়ে দেখে গুলি খেয়ে রাস্তায় চিত হয়ে পড়ে আছেন দাদার বয়সী একজন। গুঙিয়ে গুঙিয়ে কারো কাছে পানি চাচ্ছেন মনে হয়। হাসাইনের মনে পড়ে গেলো শহীদ মুগ্ধ ভাইয়ের কথা। তিনি থাকলে এখন পানি খাওয়াতে পারতেন। হঠাৎ মনে হলো, মুগ্ধ ভাই নেই তো কি হয়েছে? আমি তো আছি! যেই ভাবনা সেই কাজ। সাথে সাথেই টং দোকানের পানির কলস থেকে গ্লাসে করে পানি নিয়ে যায় হাসাইন। মুরুব্বির মাথাটা আলতো করে কোলে নিয়ে পানি ভরা গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়েছে এমন সময় পুলিশ এসে আবার দুটি গুলি করে মানুষটাকে। সাথে সাথে আকাশের দিকে শাহাদাত আঙুল ইসারা করে কি যেন বলতে বলতে শহীদ হয়ে যান প্রায় ৬৫ বছরের সাদা দাঁড়িওয়ালা লোকটা। হাসাইনের কানের পাশ দিয়ে গুলি করায় কান যেন বধির হয়ে গেল। এই সময়ে অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়া এসে খুনি পুলিশের এস আই সন্তোষক কুমারকে হাসাইনের উপর গুলি করে তাকে খুন করতে বলে। সময় তখন বেলা ১ টা ৩০ মিনিট। পুলিশের পোশাকে চির কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়ে ভারতের র' এর এজেন্ট সাবেক ছাত্রলীগ গোপালীশ পুলিশ এস আই সন্তোষ কুমার মাত্র ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র ১২ বছরের নাবালক শিশু হাসাইনের মাথায় গুলি করে। খুব কাছ থেকে ফায়ার করায় গুলি হাসাইনের মাথার খুলি ভেদ করে মগজের মধ্যে প্রবেশ করে। আর সাথে সাথে অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায় আকাশের মতো বিশাল; পাহাড়ের মতো উঁচু; ফসলের মাঠের মতো বিস্তৃত আর সাগরের মতো গভীর হওয়ার স্বপ্ন দেখা একটা ছোট্ট শিশুর জীবন প্রদীপ। যে নাকি আবু সাঈদ আর মুগ্ধ হতে এসে হয়ে গেলো হবিগঞ্জ জেলার সর্বকনিষ্ঠ শহীদ। ঘাতকের একটা বুলেটের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ছোট্ট শিশু মো: হাসাইন মিয়ার জীবনে অনেক বড়ো হওয়ার লক্ষ্য।

শহীদের লাশ উদ্ধার

বানিয়াচং থানার সামনে অরো অনেক শহীদের মতো গুলি খেয়ে রাস্তায় পরে ছিলো শিশুশহীদ হাসাইনের লাশ। পুলিশ অলিগলিতে, দোকানপাটের আড়ালে, মানুষের বসত বাড়িতে অবস্থান নেয়া আন্দোলনকারীদের ধরতে ব্যস্ত। আন্দোলকারীরাও বুঝতে পেরেছে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। মরতে তো একদিন হবেই। মরার আগে জুলুমবাজ হাসিনার বেজন্মা পুলিশদের বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশ এখনো কাশ্মীর হয়ে যায়নি। তাই এবার তারা প্রতিরোধ করা শুরু করলো। ইটের টুকরো, মাটির ঢিলা, মাটির পাতিল আর কলস ভাঙা, বাঁশ, লাঠি, ঝাড়ু মোট কথা হাতের কাছে যে যা পেল তাই দিয়ে সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তুললো। হঠাৎ এমন গোলাগুলির শব্দ শুনে আরও গ্রামবাসী এসে যোগ দিলো আন্দোলনকারীদের সাথে। এর মধ্যে আরও বড়ো একটা মিছিল চলে এলো বানিয়াচং থানার কাছাকাছি। থানার সামনে থাকা কিছু পুলিশ

ভোট ডাকাত চেয়ারম্যান ধন মিয়ার সাহায্যে শহীদদের লাশগুলো গুম করার প্ল্যান করছিলো। ধেয়ে আসা মিছিলটি ততক্ষণে থানার সামনে চলে এসেছে। গোলাগুলির শব্দ শুনে তারাও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত ছিলো। তাই জায়গা মতো এসেই শুরু করে প্রতিরোধ। তাই লাশ গুম করা বা পুড়িয়ে ফেলার মতো সুযোগ অমানবিক পুলিশ আর পায়নি। পুলিশের ডানদিক, বামদিক আর সামনের দিক থেকে শুরু হয় ছাত্র জনতার তীব্র প্রতিরোধ। আওয়ামী পুলিশ আর খুনিরা এবার ত্রিমুখী প্রতিরোধের সামনে পড়ে। আরও আধাঘন্টা ধরে লড়াই চলে ছাত্র জনতা আর খুনিদের সাথে। এক সময় কাপুরুষ পুলিশলীগ আর আওয়ামী লীগ পিছু হটতে হটতে লেজগুটিয়ে পালিয়ে গেলো। আন্দোলনকারীরা এসে তড়িঘড়ি করে আহত, নিহতদেরকে তুলে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলো। শহীদ হাসাইনের লাশ দেখে তারই এক প্রতিবেশী কোলেতুলে নেয়ার সময় দেখে বুলেটের আঘাতে তৈরি বড়ো ফুটো দিয়ে রক্তের সাথে গড়িয়ে পড়ছে মগজ। বুঝতে পারলো, যেহেতু মেধার জন্য এতো আন্দোলন সেহেতু টার্গেট করে করে মেধা বিকৃতি আর ধ্বংসের মাধ্যমেই পৈশাচিক অনন্দ পায় খুনিরা।

হাসাইনের লাশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান গুলি খাওয়ার সাথে সাথেই শাহাদাত বরণ করেছে সে। লাশ নিয়ে হাসাইনের বাড়িতে যাবার আগেই আর এক প্রতিবেশি দৌড়ে গিয়ে পৌঁছে যায় হাসাইনের বাবার নিকট। হাসাইনের বাবা তখনো পুকুরে গোসল করছিলেন। পরম আদরের ছেলের এমন মৃত্যুর সংবাদ শুনে জায়গাতেই মুষড়ে পড়েন জনাব ছানু মিয়া। তিনি চিৎকার করে কান্না করতে করতে ছুটে যান হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালের সব ফর্মালিটি সম্পাদন করে শহীদের লাশ নিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। বাড়ির উঠানে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানের লাশ দেখে শহীদ মাতা সাজেদা আক্তার পুরোপুরি ভেঙে পড়েন। দুপুরের খাবার না খেয়ে যাওয়া তার প্রিয় সন্তান রাতে ফিরে এলো খুনি পুলিশের গুলি খাওয়া লাশ হয়ে। ভাই-বোনদের কান্না আর পাড়াপড়শিদের কান্নায় ছানু মিয়ার জরাজীর্ণ বাড়িটা যেন হয়ে গেলো অনেক বড়ো একটি শোকের গ্রাম। শহীদ হাসাইনের মা কয়েকটি চিৎকার দিয়ে সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাবা ছানু মিয়া বুঝেই উঠতে পারলেন যে কি হয়ে গেলো। সে এখনো নির্বাক। বাবার কাঁধে ছেলের লাশ নেয়ার যন্ত্রণা তিনি কিভাবে সহ্য করবেন? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি এতো ভালো একটা শিশুর এমন করুন মৃত্যুর শোক এখনো ঘুরে বেড়ায় যাত্রাপাশা গ্রাম আর গ্রামবাসীদের হৃদয়ে হৃদয়ে। কিভাবে ভুলবে তারা সেই সদালাপী, সদা হাস্যোজ্জ্বল, বুদ্ধিমান, পরোপকারী মিষ্টি ছেলে হাসাইনকে!

শহীদের জানাজা ও দাফন

৫ আগষ্ট পড়ন্ত দুপুরে বানিয়াচং থানায় হাসাইনসহ মোট ৯ জন শহীদ হন। পরের দিন ৬ আগষ্ট সকাল ১০টায় হাসাইনের নিজের স্কুল, এলার হাই স্কুল মাঠে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণে হাসাইনসহ মোট ৭ জন শহীদের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বাকি দুইজনের জানাযাও পরবর্তীতে এখানেই করা হয়।

জানাযা শেষে শিশু শহীদ মো: হাসাইন মিয়াকে নিজ গ্রামের পঞ্চায়েত কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শহীদ হাসাইন সম্পর্কে পরিচিতজনের মন্তব্য

হবিগঞ্জ জেলার সর্বকনিষ্ঠ শহীদ শিশু হাসাইন সম্পর্কে পরিচিতজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে হাসাইন অন্তত ভালো

একজন ছেলে ছিলো। এতো ছোট বয়সেই সে বাবার সাথে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো। কারো সাথে কখনো ঝগড়া বিবাদ করতো না। ছোট আর সমবয়সীদের প্রতি তার যেমন ছিলো নিখাঁদ ভালোবাসা তেমনি বড়োদের প্রতি ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা। তার সম্পর্কে তার দূর সম্পর্কের দাদা জনাব আলীর মন্তব্য ছিলো এরক, "শহীদ হাসাইন মিয়া অত্যন্ত ভালো ছেলে ছিলো। তার বাবার সাথে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। সে মোবাইলে আবু সাঈদের শহীদ হওয়া দেখে সে আমাকে ও তার বাবাকে বলে, বাবা আমরাওতো ছাত্র। আমিও যাব মিছিল করতে। তুমি কিন্তু বাধা দিওনা। এ কথা সকালে বলে সকাল ১১ টার দিকে আন্দোলনে চলে যায়। অন্যান্য ছাত্র বন্ধুদের সাথে বানিয়াচং থানার সামনে গেলে অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়া তাকে মেরে ফেলতে পুলিশকে গুলি করতে বলে। পুলিশের এস আই সন্ত্রাসী সন্তোষ কুমার নির্মমভাবে এই মাসুম বাচ্চাটার উপর গুলি চালিয়ে তাকে শহীদ করে।"

পারিবারিক পরিচিতি

শিশুশহীদ মো: হাসাইন মিয়ারা মোট ছয় ভাই-বোন। বড় ভাই মো: জাহিদ হাসান (১৪) দারুন্নাজাত মাদ্রাসায় কুরআনের হিফজ (৯ পারা) পড়ছে। হাসাইন মিয়া ছিলো মেঝো। তার পরের ভাই মো: হোসাইন (১০) বন্যতুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেনির ছাত্র। তারপরের ভাই মো: তামিম ইকবাল (৭) রায়ের পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনিতে পড়ে। পরের ভাই মোঃ হামীম (৫) রায়ের পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সবার ছোট, বোন জান্নাতুল ফিরদউস (২) এখনো অবুঝ। শহীদ হাসাইনের বাবা জনাব মো: ছানু মিয়ার বয়স ৩৫ বছর। সে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মা জনাবা মোসা: সাজেদা আক্তারের বয়স ২৬ বছর। তিনি একজন গৃহিণী।

আর্থিক অবস্থা

শহীদ হাসাইনদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তার বাবা ভ্যান গাড়িতে করে তরকারি বিক্রি করেন। কোন দিন বিক্রি হয়, কোন দিন হয় না। গ্রামে প্রায় সবাই তরি-তরকারী চাষাবাদ করে। ৫ ভাইবোন আর বাবা-মাসহ শহীদ হাসাইনের ফেলে যাওয়া পরিবারে এখন ৭ জন সদস্য। তাছাড়া তার বাবার বর্তমানে আয় ইনকাম খুবই কম। বর্তমানে মাত্র ২০০০০ মাসিক আয় দিয়ে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ভরণপোষণ ঠিক মতো করতে পারছেন না জনাব ছানু মিয়া। হাসাইন পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে খালে-বিলে-নদীতে মাছ ধরতো। তাতে কিছু আয় হতো। এখন তাও বন্ধ। পুরাতন টিন দিয়ে ছাওয়া একটি মাত্র ছোট্ট ঘর। সে চলে যাওয়ায় তার বাবা একেবারেই ভেঙ্গে পরেছেন। আদরের মানিককে হারিয়ে তার মা-বাবা শোকে মুহ্যমান।

এক নজরে শহীদ হাসাইন

নাম	: মো: হাসাইন মিয়া
পিতার নাম	: মো: ছানু মিয়া
মাতার নাম	: মোছা: সাজেদা আক্তার
শহীদের জন্ম	: ১০ জুন ২০১২
পেশা/পদবী	: ছাত্র
পেশাগত পরিচয়	: ৬ষ্ঠ শ্রেনিতে অধ্যয়নরত ছিলো
বর্তমানে পারিবারিক সদস্য সংখ্যা	: ০৭
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: যাত্রাপাশা, ওয়ার্ড নং: ০৩, ৪নং দক্ষিণ, পশ্চিম ইউনিয়ন, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ
ঘটানার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
ঘটনার স্থান	: বানিয়াচং থানার সামনে
আহত হওয়ার সময়	: দুপুর ১টা ৩০ মিনিট
আক্রমণকারী	: পুলিশের এস আই সন্তোষ কুমার
মৃত্যুর তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বানিয়াচং থানার সামনে
শহীদ হওয়ার সময়	: দুপুর ১টা ৩০ মিনিট
জানাজার তারিখ ও সময়	: ৬ আগস ২০২৪, সকাল ১০টা
জানাজার স্থান	: এলার হাই স্কুল মাঠ।
শহীদের বর্তমান কবর	: পঞ্চায়েত কবরস্থান, যাত্রাপাশা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

প্রস্তাবনা

শহীদ হাসাইনের একজন ছাড়া প্রায় সব ভাই বোনই পড়লেখা করে। তাদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়া খুবই দরকার।

১. বাসস্থান প্রয়োজন

২. বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

৩. ভাইবোনদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য মাসিক ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে পারলে ভালো হয়

শহীদ আজমত আলী

ক্রমিক : ১১৫

আইডি : সিলেট বিভাগ ০০৯

পরিচিতি

আজমত আলী হবিগঞ্জ জেলায় হরিপুরে ১৯৭৯ সালের ১২ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা জনাবা ছকিনা বিবির বয়স ৯৫ বছর। পিতা জনাব ফজর আলী ইন্তেকাল করেছেন অনেক আগেই। আছে একজন ভাই। আজমত আলির নিজের সংসার রয়েছে। স্ত্রী, দুই ছেলে আর একটি মেয়ে নিয়ে তার পরিবার। নদ-নদীতে মাছ ধরে সে মাছ বাজারে বিক্রি করেই চলত তার পরিবারের জীবিকা। সৎ মৎস ব্যবসায়ী হিসেবেই তার পরিচিতি রয়েছে নিজ এলাকায়।

ঢাকায় অবস্থান

সময়টা ছিলো আগস্ট মাসের শুরুর দিকে। জুলাইয়ের শেষের দিকে ছাত্রদের আন্দোলন দমানোর অভিপ্রায়ে স্বৈরাচার সরকারের থেকে ঘোষণা আসে কারফিউর। সেনাবাহিনীর সড়কে অবস্থানের কারণে জুলাই মাসের প্রথম দিকে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়। ধীরে ধীরে জনজীবনে প্রকাশ পায় স্বাভাবিকতা। যানবাহনগুলো চলতে থাকে আগের মতো। যদিও এরই পিছনে চারিদিকে চলতে থাকে ঘাতক বাহীনির ধরপাকর, গুম-খুন আর গ্রেফতারী অভিযান। এদিকে বাহ্যিক পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে আজমত আলী ঢাকায় যান তার ব্যবসায়ীক কাজে। অবস্থান করেন ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে। জুলাইয়ের শেষে স্তিমিত রূপ নেয়া আন্দোলন মূলত একেবারে নিভে যায়নি। সেটা সুপ্ত ছিলো তুষের আগুনের ন্যায়। যখন কারফিউ শিথিল হতে থাকে, ইন্টারনেট স্বল্প করে হলেও চালু হয়, তখন সারাদেশ জুড়ে একটু একটু করে আবার জনগণ আন্দোলনে নামা শুরু করে। এবারে আন্দোলনের জন্য স্পিরিট ছিলো আগের বারের থেকে বহুগুণ বেশি। আন্দোলন শুরু হয় কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবী নিয়ে। কিন্তু এ যৌক্তিক আন্দোলোনের উপর স্বৈরাচার হাসিনার নির্দেশে চলে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। তাই কারফিউ শিথিল হওয়ার সাথে সাথে জুলাই মাসের আন্দোলনে যারা শাহাদাত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলেন তাদের বন্ধু, ভাই ও আন্দোলনের সাথীরা সুষ্ঠু বিচারের দাবীতে রাজপথে নেমে আসে। এবার ছাত্রদের সাথে ব্যাপকাহারে রাজপথে নামতে থাকে শিক্ষক-অভিভাবক, উকিল, শিল্পী, অভিনেতা থেকে শুরু করে রিকশাচালক, ভ্যানচালক, দিনমজুর সহ সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ। আজমত আলী বরাবরই ন্যায়ের পক্ষে অটল। তাই আগস্টের দ্বিতীয় দফায় শুরু হওয়া এই আন্দোলনে আজমত আলী সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে।

শহীদ হওয়ার দিন

৪ আগস্ট শহীদ মিনারে জড়ো হয় সকল ছাত্ররা। সাথে থাকে আপামর জনতা। সেদিন শহীদ মিনারের আকশে প্রতিধ্বনিত হয় স্বদেশ প্রেমের সুরে। সেই সাথে ঘোষণা আসে ৬ আগস্ট ১ দফা দাবীতে সারাদেশ থেকে গণ ভবনের উদ্দেশ্যে লং মার্চের। দফা এখন একটাই। স্বৈরাচার সরকারের পদত্যাগ। পরবর্তীতে পরিস্থিতি বিবেচনায় রাতে ঘোষণা আসে ৬ তারিখ নয়, আগামীকাল তথা ৫ আগস্ট লং মার্চ টু ঢাকা। ৫ আগস্ট সকাল থেকে রাজধানীতে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। সকাল দশটা এগারোটা থেকে আস্তে আস্তে নামতে থাকে এক এক করে সাধারণ মানুষ। ধীরে ধীরে জনসমাগম বাড়ে। শুরু হয় আন্দোলন। আজমত আলী যাত্রাবাড়িতে চলমান আন্দোলনে যুক্ত হন। তাদের মিছিল এক পর্যাযে পৌছায় যাত্রাবাড়ি থানার সামনে।

অন্যায়ের প্রতিবাদে অকুতোভয় আজমত আলী অবস্থান করছিলেন মিছিলের একেবারে সামনের সারিতে। তারপর শুরু হয়ে যায় পুলিশ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের আক্রমণ। চলতে থাকে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। এই পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে দৌড় দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যান আজমত আলী। এমন সময় সরকারের সন্ত্রাসীরা এলোমেলোভাবে গুলি চালাতে শুরু করে। হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগে আজমত আলীর গলায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়া আজমত আলীর দেহকে উপস্থিত কয়েকজন ভ্যানগাড়ি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘাতকের বুলেটে এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায় আজমত আলীর প্রাণ।

যেমন ছিলেন শহীদ আজমত আলী

ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ধার্মিক একজন মানুষ ছিলেন শহীদ আজমাত আলী। দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। আদরের ছোট ছেলেকে ভর্তি করিয়েছিলেন মাদ্রাসায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীক কাজে সততার পরিচয় রাখতেন শহীদ আজমত আলী। তার ভাতিজা খোরশেদ আলম জানান, "আজমত আলী চাচা অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। আমরা একই সাথে মাছের ব্যবসা করতাম। সহজ সরল নির্ভেজাল একজন মানুষ ছিলেন। আমরা এক সাথে ৩-৪ দিন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে যোগদিচ্ছিলাম। আমারে নিজের ছেলের মত আদর করতেন। তিনি কোন অসৎ উপায়ে আয় রোজগার করতেন না। যদি কোন মাছ পঁচে যেত তা বিক্রি না করে ফেলে দিতেন। এতে যদি তার লোকশান হয় তবুও কখনোই খরিদ্দারদের পঁচা মাছ দিতেন না।" এমনি ছিলেন শহীদ আজমত আলী।

শহীদ পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শহীদ আজমত আলীর পারিবারিক অবস্থা খুবই দুর্বল। মাছ বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার মৃত্যুর পরে তার তিন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘোর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন তার স্ত্রী। ঘরের জন্য তেমন কিছুই রেখে যেতে পারেননি যা দিয়ে তার স্ত্রী সংসার চালিয়ে নিতে পারবেন। ঘরের ভিটে টুকু ছাড়া কোন আবাদি জমি নেই শহীদ আজমত আলীর। যে ঘরটি রয়েছে তাও অনেক ছোট এবং একটি মাত্র কক্ষ বিশিষ্ট। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক থেকে নেয়া ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) টাকার ঋণের বোঝা তাদের উপর রয়ে গেছে। ১৫ বছর বয়সি বড় ছেলে মাহফুজ আলম আগে থেকেই পড়াশোনা ছেড়েছেন। এদিকে ছোট দুই সন্তান ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত নাদিয়া আক্তার ও প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মাহিনুর আলম এর পড়াশোনাও অনিশ্চিত।

এক নজরে শহীদ আজমত আলী

নাম	: আজমত আলী
জন্ম তারিখ	: ১২ এপ্রিল, ১৯৭৯
জন্মস্থান	: হরিপুর, হবিগঞ্জ
পিতার নাম	: মো: ফজর আলী (মৃত)
মাতার নাম	: ছফিনা বিবি (৯৫)

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম	: হরিপুর
ইউনিয়ন	: নবীগঞ্জ
থানা	: নবীগঞ্জ
জেলা	: হবিগঞ্জ

সন্তানাদি

ছেলে	: মাহফুজ আলম (১৫)
মেয়ে	: নাদিয়া আক্তার (১৩) শ্রেণি: ৫ম রাজাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ছেলে	: মাহিনুর আলম (১০) শ্রেণি: ১ম জামিয়া ইসলামিয়া চরগাঁও মাদ্রাসা

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে বড় করে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া
২. এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান
৩. শহীদ পরিবারের সকল খরচ নিশ্চিত করা

শহীদ মোঃ মামুন আহমেদ রাফসান

ক্রমিক : ১১৬

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১০

জন্ম ও পরিচিতি

চির হাস্যোজ্জ্বল শহীদ মোঃ মামুন আহমেদ রাফসান সর্বশেষ ৯ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০০০ সালের ১ জানুয়ারী হবিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ ছালেক মিয়া ইন্তেকাল করেছেন এবং মাতা নিশামন বিবি একজন গৃহিণী।

ব্যক্তিগত জীবন

ব্যক্তিজীবনে শহীদ মামুন অত্যন্ত নম্র-ভদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। গ্রামের মানুষের কাছে তিনি একজন ভাল ছেলে হিসেবে পরিচত ছিলেন। মসজিদের নানান সৌন্দর্য কিভাবে বাড়ানো যায় এ নিয়ে নামাজের পরে ছাত্র বন্ধুদের সাথে, পাড়া-প্রতিবেশির সাথে আলোচনা করতেন। মেধাবী ছাত্র মামুন পড়ালেখার পাশাপাশি ফ্রি-ল্যান্সিং এর কাজ করতেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মামুনের পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। মেধাবী ছাত্র মামুন পরিবারকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি ফ্রি-ল্যান্সিং এর কাজ করতেন। তার বড় ভাই রুবেল মিয়া গাজিপুরে পরিবারসহ বাস করেন। মামুনের বড় বোন মাইনুর আক্তার রিফা বিবাহিতা এবং গৃহিণী। তার মেঝো ভাই মো: রানু মিয়ার গ্রামের বাড়িতে হাসের খামার রয়েছে। তাদের বাড়ি ঘর পাকা দালানের তৈরি। শহীদের সবচেয়ে ছোট ভাই মোঃ আমির হামজা গাজিপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার গাউসুল আজম মাদ্রাসায় হিফজ বিভাগে অধ্যয়নরত।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরুন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামীসরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসীস্ট সরকার

বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসীস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ৫ই আগস্ট সকালে মামুন অন্যান্য দিনের মতোই ফ্রি-ল্যান্সিং এর উপর একটি কোর্স করতে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যান। সেখানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিল দেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার তরুণ মামুন নিজেকে মেলে ধরেন এবং ধীরে ধীরে মিছিলের স্মমুখভাগে নিজের শক্ত অবস্থান নেন। মিছিলে যুক্ত হয়ে বজ্রকণ্ঠে স্লোগান দিয়ে মুখরিত করেন রাজপথ। এমতাবস্থায় ফ্যাসীস্ট সরকারের পালিত ঘাতক সন্ত্রাসী সশস্ত্র আওয়ামী ছাত্রলীগ নিরস্ত্র মিছিলকারীদের উপর চড়াও হয়।

শাহাদাত বরণ

ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে স্বৈরাচার আওয়ামী সরকার বিরোধী এক দফা এক আন্দোলনে পরিণত হয়। ৫ আগস্ট সকালে মেধাবী ছাত্র মামুন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যুক্ত হন। ফ্যাসীস্ট রাষ্ট্রযন্ত্র অজস্র নিরীহ লাশের উপর দিয়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ঘৃণ্য নীল নকশা রচনা করেছিল। সে লক্ষ্যে আওয়ামী ঘাতক সশস্ত্র ছাত্রলীগ নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর লেলিয়ে দেয়। মিছিলের এক পর্যায় কুমিল্লা ক্যান্টমেন্ট এলাকায় সাধারণ ছাত্র ও ঘাতক ছাত্রলীগের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। একপর্যায় ক্ষুধার্ত হায়েনার মত তারা সংগ্রামী ছাত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রতিবাদী তরুণ মামুনের পায়ে কুখ্যাত ছাত্রলীগের এক সন্ত্রাসী চাপাতি দিয়ে গুরুতর জখম করলে; মুহূর্তেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখনো ক্ষান্ত হয়নি নর পিশাচ ঘাতক; ছাত্রলীগের অন্যান্য সন্ত্রাসীরা তার বুকে,মাথায় ও পিঠে এলোপাতাড়ি কোপ ও লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করে। চির হাস্যোজ্জ্বল মামুনের রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে থাকে; রাজপথ পরিণত হয় রক্তগঙ্গায়। গুরুততর অবস্থায় ছাত্র-জনতা মামুনকে কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরবর্তীতে শহীদের নামাজে জানাযা শেষে নিজ এলাকায় দাফন করা হয়।

শহীদ মামুন পরিবারের সকলের নিকট ছিলো অতি আদরের সন্তান। তাকে হারিয়ে তার পরিবারে নেমে এসেছে এক শোকের ছায়া।

নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ মামুনের বোন জামাই (দুলাভাই) মো: সোহেল রানা বলেন, “মামুন অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিল। ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতো। গ্রামের মানুষের কাছে একজন ভাল ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল।

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: মামুন আহমেদ রাফসান
পেশা	: ছাত্র ও ফ্রিল্যান্সার
জন্ম তারিখ	: ৮ এপ্রিল ১৯৯১
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১০.০০টা
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
দাফনের স্থান	: হবিগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: তেঘরিয়া, ইউনিয়ন: কালাউক
থানা	: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ
পিতা	: মো: ছালেক মিয়া (মৃত)
মাতা	: নিশামন বিবি

প্রস্তাবনা

১. শহীদ মামুনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিশ্চিত করা

২. পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান

শহীদ নাহিদুল ইসলাম

ক্রমিক : ১১৭

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১১

শহীদ পরিচিতি

১৭ আগস্ট ২০০৯ সালে হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লাখাই উপজেলার মুড়িয়াউক গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ নাহিদুল ইসলাম। পিতা মাতাহীন নাহিদ ছিল সবার আদরের মধ্যমণি। এতিম নাহিদের দেখাশোনা করেন তার দাদি। তার বাবা ইসলাম ধর্মের পান্ডিত্য অর্জন করায় নাহিদেরও বাবার মতো হওয়ার প্রচন্ড আগ্রহ ছিল এবং তার হাতে খড়ি হয় এলাকার কওমি মাদ্রাসায়। সুঠাম দেহের অধিকারী নাহিদ তার মাদ্রাসাতেও ছিল সবার আগ্রহের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। তার মেধা ও নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন খুব সহজেই। তার তীব্র ইচ্ছে ছিল বাবার মত আলিমে দ্বীন হয়ে ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য পৌঁছে দিবে বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে কিন্তু তার এ প্রবল আকাঙ্ক্ষা অধরাই থেকে যায়। আওয়ামী পুলিশ লীগের বুলেটের আঘাতে স্বপ্নটি অকালেই ঝড়ে যায়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ নাহিদুল ইসলাম সম্পর্কে তার বড় ভাই মাওলানা নাঈমুল ইসলাম বলেন নাহিদুল ইসলাম অত্যন্ত মেধাবী নম্র ভদ্র ছেলে ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি মাসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত সবাইকে মুগ্ধ করতো এবং সুযোগ হলেই মসজিদে নামাজ পড়াতো। গ্রামবাসীরা তাকে বাবার প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখতো। বাবা মরহুম আব্দুল আজিজ সারা দেশব্যপী মাহফিল করতেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট। বিকাল ৫ ঘটিকা। বাংলাদেশের উপর জগদ্দল পাথর হিসেবে বসে থাকা স্বৈরাচারী হাসিনার পলায়নে ছাত্র-জনতা বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা। স্বাধীনতার নতুন সূর্য দেখতে পুরো ঢাকা শহরে হাজারো মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। কারো হাতে ব্যানার, কারো হাতে ফেস্টুন, নতুন জামা পড়ে এ যেন এক ঈদ আনন্দ। শহীদ নাহিদুল ইসলামও এই আনন্দ উপভোগ করার জন্য ঢাকার আদাবরের রাস্তায় নেমে যান। কিন্তু তার এ বিজয় মিছিলটি জীবনের শেষ মিছিলে পরিণত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই এ উল্লাস বিষাদে পরিণত হয়। আদাবর থানার অতি উৎসাহী ওসির নেতৃত্বে বিজয়ী জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। একটি প্রতিবিপ্লব ঘটানোর জন্য। সুসংগঠিত মিছিলটি পরিণত হয় একটি বেদনার মিছিলে। সবার সামনে থাকা নাহিদের বুকে বিদ্ধ চারটি গুলি তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। যেই হৃদয়ে কোরআনকে জায়গা দেয়া, সেখানে বুলেটের আঘাত যেনো প্রকারান্তরে কোরআনকেই আঘাত করা।

আহত নাহিদ চিৎকার করার সুযোগ পায়। তিনি শুধু একটি কথা বারবার বলছিলেন, আমাদের বাঁচান, আমাদের বাঁচান। অসংখ্য মানুষের আর্তনাত পিশাচ পুলিশলীগের কর্ণকুহরে পৌঁছে নাই সেদিন। তারা আরও পাশবিক হয়ে উঠে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে আতঙ্কিত করার জন্য পুলিশ নিজেরাই নিজেদের গাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। চারিদিকে তীব্র ধোঁয়ায় এক অমানিশার মতো তৈরি হয়। এর মধ্যে নরপিশাচ এক পুলিশ নাহিদের ছোট্ট দেহকে আগুনের কুন্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করে। আগুনের তীব্রতাকে বাড়ানোর জন্য নাহিদকে মনে হয়েছিলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছিলো। সাথে সাথেই নাহিদের কোমল দেহের চামড়া খসতে থাকে। ছটফট করে গগন বিদারী চিৎকারে আশেপাশে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হয়। কিছু মানুষ নাহিদকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করতে এলে, গুলির সামনে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে নাহিদের হাড্ডি থেকে গোশতো খসে পড়তে থাকে। পরে জনতার তীব্র ক্ষোভের মুখে পুড়ে পুলিশ পিছু হটলে নাহিদকে আগুন থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হলে হাসপাতাল কতৃপক্ষ মৃত ঘোষণা করে। শহীদ নাহিদের ছিলো শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। মহান আল্লাহ তা'আলা হয়তো তার

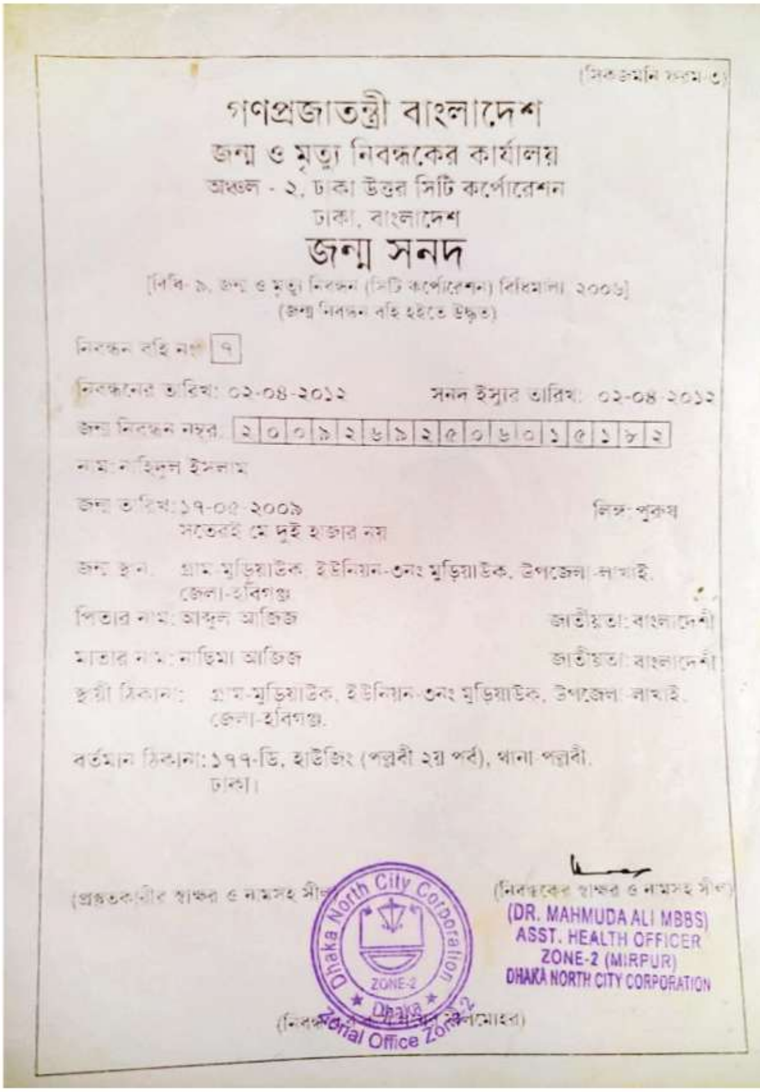

(সিডিউল ফরম-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
অঞ্চল - ২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

[বিধি-৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সিটি কর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ৭

নিবন্ধনের তারিখ: ০২-০৪-২০১২ সনদ ইস্যুর তারিখ: ০২-০৪-২০১২

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৯২৬৯২৫৩৬০১৫১৮২

নাম: নাহিদুল ইসলাম

জন্ম তারিখ: ১৭-০৫-২০০৯ লিঙ্গ: পুরুষ
সতেরই মে দুই হাজার নয়

জন্ম স্থান: গ্রাম-মুড়িয়াউক, ইউনিয়ন-৩নং মুড়িয়াউক, উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ

পিতার নাম: আব্দুল আজিজ জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: নাছিমা আজিজ জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-মুড়িয়াউক, ইউনিয়ন-৩নং মুড়িয়াউক, উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ.

বর্তমান ঠিকানা: ১৭৭-ডি, হাউজিং (পল্লবী ২য় পর্ব), থানা-পল্লবী, ঢাকা।

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

Dhaka North City Corporation ZONE-2 Dhaka Zonal Office Zone-2

(DR. MAHMUDA ALI MBBS)
ASST. HEALTH OFFICER
ZONE-2 (MIRPUR)
DHAKA NORTH CITY CORPORATION

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

বিজয়োল্লাস থেকে চিরবিদায় লাখাইয়ের ছেলে নাহিদের

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর রাজধানীতে বিজয়োল্লাস করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে লাখাই উপজেলার মাদ্রাসা ছাত্র নাহিদ বিন আব্দুল আজিজের (১৭) মৃত্যু হয়েছে। ঢাকায় ৫ আগস্ট সে নিহত হয়। তার আর কয়েক মাস পরই দক্ষিণ আফ্রিকায় পড়াশোনার জন্য যাওয়ার কথা ছিল। অথচ এখন তার পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

পরিবারের চাওয়া তাকে যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এমন হত্যাকাণ্ডের জন্য শেখ হাসিনাকে দেশে এনে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর দাবিও জানান তারা।

নিহত নাহিদ বিন আব্দুল আজিজ

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাদরাসাতুল কুরআন আল-আরাবিয়া, খুলনা
Madrasatul Quran Al-Arabia Khulna
স্থাপিত : ১৪৪৩ হি.

পরিচয় পত্র

নাম : নাহিদুল ইসলাম
পিতা : আব্দুল আজিজ
রোল : ১৯
বিভাগ : আরবী ১ম বর্ষ
শিক্ষাবর্ষ : ১৪৪৫-১৪৪৬ হিজরী
মোবা : ০১৬৮২-৫৮৫৩৬৮

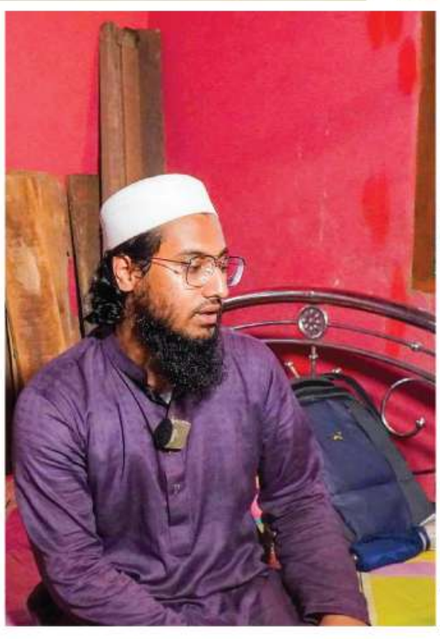

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পুরো নাম	: নাহিদুল ইসলাম
পেশা	: ছাত্র কৃওমী মাদরাসায় মাদানী নেসাবে পড়তেন
জন্ম তারিখ	: ১৭/০/২০০৭
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুড়িয়াউক, ইউনিয়ন : ৩নং মুড়িয়াউক, থানা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: ৬ডি/৭, আজিজ মহল্লা, থানা পল্লবী, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: আব্দুল আজিজ
মায়ের নাম	: নাসিমা আজিজ
পারিবারিক সদস্য	: ৩ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ১ বোন ১ ভাই ১. বোন : সাদিয়া সুলতানা, বয়স: ৩২, পেশা: প্রবাসী, সাউথ আফ্রিকা ২. ভাই : মাওলানা নাইমুল ইসলাম, বয়স ২৯
পেশা	: চাকুরীজীবী
ঘটনার স্থান	: আদাবর, ঢাকা
আঘাতকারী	: ঘাতক পুলিশ বাহিনীর গুলিতে
নিহত হওয়ার সময় কাল	: ০৫/০৮/২০২৪ বিকাল ৫ টা, ঢাকা
শহীদের কবরে অবস্থান	: গ্রামের মসজিদের পাশে কবরস্থ করা হয়েছে

প্রস্তাবনা

১. রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা

২. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

শহীদ মোঃ মোনায়েল আহমেদ আষাঢ়

ক্রমিক : ১১৮

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১২

শহীদ পরিচিতি

প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মোনায়েল আহমেদ আষাঢ়। ২৫ মার্চ ২০০৭ সালে হবিগঞ্জের লাখাইয়ের কামালপুর গ্রামে পরিবারের ছোট ছেলে হিসেবে পৃথিবীতে আসেন তিনি। শহীদের পিতার নাম সোয়াব মিয়া। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। যার উপার্জনে চলতো পাঁচ জনের সংসার। মাতা ইয়াসমিন আক্তরের হাতের পরশে সাজানো সংসারে পরিণত হয়। ছোট থেকেই বেশ চটপটে ও মেধাবী হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করেন আষাঢ়। ধর্মীয় দিকে প্রচন্ড আগ্রহ ও পিতা মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী হাফিজিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন নিজ গ্রামে। কৃতিত্বের সাথে আত্মস্থ করেন আল্লাহর ৩০ পারা কোরআনের প্রতিটি হরফ। সুমধুর তেলাওয়াতে নামাজ পড়াতেন নিজ মসজিদে। হাফিজিয়া পড়া শেষ হলে ভর্তি হন নিজ এলাকার মাধ্যমিক স্কুলে। শহীদ ইমরানের ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছিলো। স্বপ্ন পুরণের আগেই বুলেটের আঘাতে স্বপ্ন অপুর্ণ রয়ে যায়।

শাহাদাতে প্রেক্ষাপট

কোটাবিরোধী আন্দোলনের মুখে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটা রাখার পক্ষে রায় দেন। দাবি পূরণ হলেও বিগত দিনগুলোতে সরকারের

পেটোয়া বাহিনীর ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি এবং হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে সারাদেশের আপমর জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আষাঢ় এ বিক্ষোভে নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ২১ জুলাই দেশব্যাপী কারফিউ চলাকালীন সময়ে তিনি এবং তার বড় ভাই তোফায়েল আহমেদ সাইনবোর্ড এলাকায় অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামেন। নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক বাহিনী। একপর্যায়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। মোনায়েম সে মিছিলে প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম একজন। ঘটনার এক পর্যায়ে মোনায়েমের পিঠে চারটি এবং তার বড় ভাই তোফায়েলের গায়ে চারটি রাবার বুলেট লাগলে সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পিচ ঢালা রাস্তা রক্তে রঞ্জিত হয়। সাথে থাকা আন্দোলনে অংশ নেয়া ছাত্র-জনতা রিকশায় করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রক্তশূন্যতায় তার শরীর নিথর হয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। মৃত্যুর খবর শোনানা মাত্রই পরিবার শোকে পাথর হয়ে যায়। তাদের মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। তার আপন বড় ভাই এখনো পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

মো: মোনায়েল আহমেদ ইমরানের চাচা মো সিরাজুল ইসলাম বলেন, শহীদ মোনায়েম অত্যন্ত মেধাবী ও ভদ্র ছেলে ছিলো। তার হৃদয় ছিলো ৩০ পারা কোরআনের ভরা। মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। তার সুমিষ্ট কোরআন তেলাওয়াতে গ্রামের লোকজন পেছনে নামাজ আদায় করতো। শহীদ ইমরান ছিলো সদা হাস্যোজ্জ্বল ছেলেদের মধ্যে অন্যতম।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থার বিবরণ

মো: মোনায়েল আহমেদ ইমরানের পারিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। বাবা নারায়নগঞ্জে ক্ষুদ্র ব্যবসা করতেন। যার উপার্জিত আয় দ্বারা ৪ ভাই বোনের লেখাপড়া চলতো। গ্রামের বাড়িতে থাকার মতো উপযুক্ত ঘর নেই। শহীদদের পরিবারের জন্য বসবাসের ঘর এবং আর্থিক সহায়তা পেলে বাকী দিনগুলো স্বচ্ছলতার মাধ্যমে কাটাতে পারবে। শহীদের বাবা ৮০০০০/- টাকার ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন যা এখনো অপরিশোধিত।

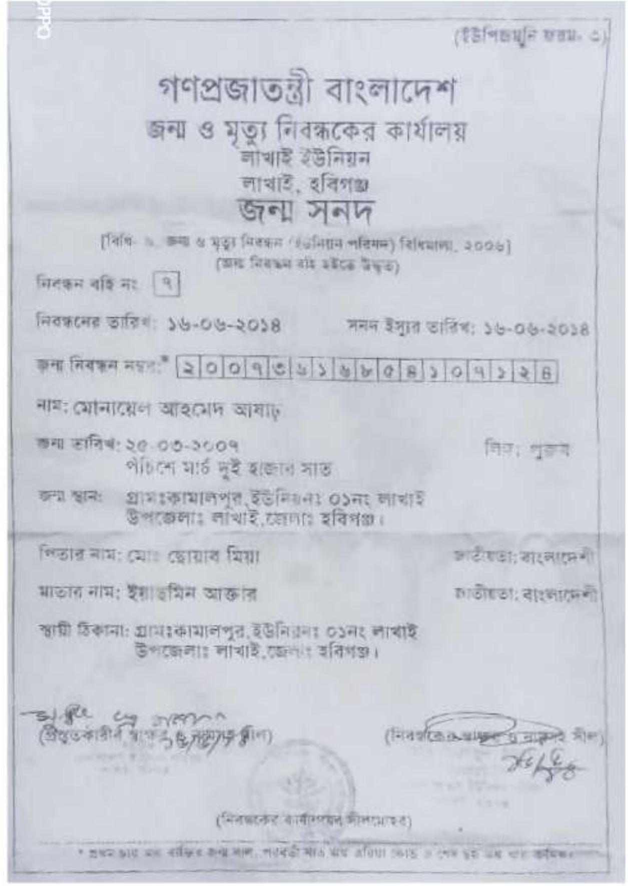

(ইউপিজন্মমৃনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
লাখাই ইউনিয়ন
লাখাই, হবিগঞ্জ

জন্ম সনদ

[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ৭

নিবন্ধনের তারিখ: ১৬-০৬-২০১৪ সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৬-০৬-২০১৪

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৭৩৬১৬৮৫৪১০৭১২৪

নাম: মোনায়েল আহমেদ আষাঢ়

জন্ম তারিখ: ২৫-০৩-২০০৭ লিঙ্গ: পুরুষ
পঁচিশে মার্চ দুই হাজার সাত

জন্ম স্থান: গ্রামঃকামালপুর,ইউনিয়নঃ ০১নং লাখাই
উপজেলাঃ লাখাই,জেলাঃ হবিগঞ্জ।

পিতার নাম: মোঃ ছোয়াব মিয়া জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: ইয়াছমিন আক্তার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃকামালপুর,ইউনিয়নঃ ০১নং লাখাই
উপজেলাঃ লাখাই,জেলাঃ হবিগঞ্জ।

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও সহ সীল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

একনজরে শহীদ মোনায়েল আহমেদ আষাঢ়

পুরো নাম	: মো: মোনায়েল আহমেদ আষাঢ়
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ২৫/০৩/২০০৭
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কামালপুর, ইউনিয়ন : ১নং লাখাই, থানা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: সাইনবোর্ড, নারায়নগঞ্জ
পিতার নাম	: মো: সোয়াব মিয়া, বয়স: ৫০
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসা
মায়ের নাম	: ইয়াসমিন আক্তার, বয়স: ৪৪ পেশা: গৃহিণী
পরিবারের মাসিক আয়	: ৩০০০০/-
আয়ের উৎস	: পুরাতন কাপড়ের ব্যবসা
পারিবারিক সদস্য	: ৫ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ২ বোন ১ ভাই
১. বড় বোন	: জিনিয়া আক্তার, বয়স: ২২ পেশা: শিক্ষার্থী, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নারায়ণগঞ্জ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার (৮ম সেমি)
২. মেঝো ভাই	: মো: তোফায়েল আহমেদ, বয়স: ২১ শিক্ষার্থী :পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক (৮ম সেমি)
৩. ছোট বোন	: জেরিন আক্তার, বয়স : ১৮, শিক্ষার্থী : এইচ এস সি
ঘটনার স্থান	: সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ
আঘাতকারী	: সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ২১/০৭/২০২৪ বিকাল ৩ টায়, নারায়নগঞ্জ
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া
২. বাবার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের বাবার ব্যবসা সম্প্রসারণে এককালীন আর্থিক অনুদান দেয়া
৪. শহীদের বাকি ভাই বোনের পড়াশুনার খরচ নিশ্চিত করা

শহীদ রিপন চন্দ্র শীল

ক্রমিক : ১১৯

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১৩

বীরের পরিচয়

১৯৯৮ সালের ১৪ নভেম্বর পিতা রতন চন্দ্র শীল ও মাতা রুবিনা রানী শীলের কোলজুড়ে আসেন রিপন চন্দ্র শীল। ছোটবেলা থেকেই এলাকায় অত্যন্ত নম্র-ভদ্র ও স্মার্ট ছেলে হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। পরিবারের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বাবার সাথে তিনিও পরিবারের হাল ধরেন। হবিগঞ্জ শহরে একটি সেলুনে চুল কাটার কাজ করতেন।

ঘটনার বর্ণনা

২৫ বছর বয়সী রিপন তার বুঝ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই আওয়ামীলীগ ও তার ফ্যাসিবাদী শাসন দেখেই বড় হয়েছেন। ভিন্নমতের প্রতি দমন-পীড়ন, ট্যাগিং এর মাধ্যমে দিনদুপুরে পিটিয়ে মানুষ খুন, বিরোধী দল ও মতের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরন, ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার, বাহ্যিক চাকচিক্য ও অভ্যন্তরীণভাবে ফোকলা অর্থনৈতিক অবস্থা, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, সীমান্তে মানুষ হত্যা সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক দুরবস্থা একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসেবে রিপনকে ভাবিয়ে তুলতো। তিনি অনন্তপুর, ৯ নং ওয়ার্ড, হবিগঞ্জ পৌরসভার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন কর্মী ছিলেন।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটা বিরোধী নায্য আন্দোলন যখন সরকারের ক্রমাগত অবহেলা ও দমননীতির কারনে বৈষম্যবিরোধী গনআন্দোলনে রূপ নেয় তখন রিপনও একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আন্দোলনে যোগদান করেন।

সুশৃঙ্খল আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, ছররা গুলির ব্যবহার সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ গনআন্দোলনকে ব্যপকভাবে উসকে দেয়। সরকারিভাবে ইন্টারনেট শাটডাউন, দেশব্যাপী কারফিউ জারি, রাতের অন্ধকারে এলাকাভিত্তিক ব্ল্যাকআউট করে মানুষের বাসায় বাসায় তল্লাশি ও গন গ্রেপ্তার জনগণের সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে। ফলশ্রুতিতে বিগত ১৫ বছরের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ সাধারণ জনতা ফ্যাসিস্ট সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে নেমে পড়ে রাজপথে। যোগ দেয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে। ছাত্র আন্দোলন রূপ নেয় গনআন্দোলনে।

কিন্তু আন্দোলনে সারা দেশবাসীর প্রবল জনসম্পৃক্ততাও সরকারের বোধদয় ঘটাতে পারেনি। ক্ষমতার লোভ ও লুটপাটের অন্ধ সরকার আন্দোলনকে দমাতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে। হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশ চুরি, হত্যা করে লাশ জ্বালিয়ে দেওয়া, গণকবর, হেলিকপ্টার ব্যবহার করে নিজ দেশের জনগণের উপরই গুলি চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ সহ হেন কোন অপরাধ নেই যা খুনি হাসিনা সরকার আর দোসর আওয়ামী বাহিনী করেনি। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন বুঝতে পারে তাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে এই বাংলার মানুষ তাদের আর কোনভাবেই মেনে নিবে না, তখন তারা মরণ কামড় দিতে প্রস্তুত হয়। নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে নিজের দেশের মানুষকেই। কিন্তু তবুও মানুষকে তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি।

৪ আগস্ট ২০১৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিল চলাকালীন সময়ে সেই মিছিলে যোগদান করেন রিপন চন্দ্রশীল। সেদিনও দেশব্যাপী কারফিউ বলবৎ ছিল। ছাত্রদের মিছিলটি টাউনহলের সামনে গেলে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ আওয়ামী লীগের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার একপর্যায়ে রিপন চন্দ্র শীলকে স্থানীয় আওয়ামীলীগের সদস্যরা ধরে নিয়ে সরাসরি তার বুকে গুলি করে। সন্ত্রাসীদের বুলেট ডান বুকের পাঁজর ভেদ করে সরাসরি ফুসফুসে বিদ্ধ হয়। মাটিতে পড়ে কাঁতরাতে থাকেন রিপন। গল গল করে বেরিয়ে আসে বুকের তাজা রক্ত। শুকনো মাটি সিক্ত হয় বীরের লাল খুনে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়েন রিপন চন্দ্র শীল। নিভে যায় জীবন প্রদীপ।

পাড়ি জমান পরপারে, এ পারে রেখে যান পিতা-মাতা, স্ত্রী পরিজনসহ মাত্র চার মাস বয়েসী একমাত্র ছেলে আবির বিশ্বাস শীলকে।

শহীদ সম্পর্কে বোনের অনুভূতি

রিপন চন্দ্র শিলের বড় বোন রুবিনা রানি শীল বলেন "রিপন অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিল। নম্র-ভদ্র, স্মার্ট ছেলে ছিলো। বাসা থেকে দোকানে যেতো। দোকান শেষে আবার বাসায় চলে আসতো। কোথাও কোন বাজে আড্ডা দিতো না। রিপন চন্দ্র শীল বিড়ি সিগারেট বা ধূমপান করতো না। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো। সে সহজ সরল মনের একজন মানুষ ছিল। সে নিজের যা উপার্জন করতো তা দিয়েই নিজের সংসার চালাতো এবং বাবা-মাকেও খরচ দিতো"।

তার ছেলেবেলার বন্ধু আশরাফুল নিশাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক প্রকাশ করে লিখেন "ওপারে ভালো থাকিস"।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

রিপন চন্দ্র শিলের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। সে অন্যের সেলুনে চুল কাটার কাজ করে যা উপার্জন করেন তা দিয়ে অতি কষ্টে তাদের সংসার পরিচালনা করে আসছিলেন। তিনি তার স্ত্রী, পুত্র সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে হবিগঞ্জ শহরে ভাড়া বাসায় থাকতেন। মৃত্যুকালে তিনি চার মাসের একটি পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তিনি স্ত্রী সন্তানের জন্য কোন কিছুই রেখে যেতে পারেননি। তার বাবার যে বস্তুভিটা ছিলো তা বিক্রি করে ৫ বছর আগে বড় বোনকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

রিপন চন্দ্র শীল পরিবারের সকলের নিকট ছিলো অতি আদরের সন্তান। তাকে হারিয়ে তার পরিবারে নেমে এসেছে এক শোকের ছায়া।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: রিপন চন্দ্র শীল
জন্ম তারিখ	: ১৪-১১-১৯৯৮
পিতা	: রতন চন্দ্র শীল
মাতা	: রুবিনা রানী শীল
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: অনন্তপুর, ইউনিয়ন: ৯ নং মাছুলিয়া , থানা: হবিগঞ্জ সদর , জেলা: হবিগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
সন্তান	: আবির বিশ্বাস শীল (বয়স: ৪ মাস)
পেশা	: নরসুন্দর
ঘটনার স্থান	: হবিগঞ্জ টাউন হলের সামনে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪-০৮-২০২৪ বেলা ৩টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ৪-০৮-২০২৪ বেলা ৩টা
আঘাতের ধরন	: বুকের ডানপাশে গুলি
আক্রমণকারী	: আওয়ামী লীগ

প্রস্তাবনা

১. তার চার মাস বয়সী এতিম ছেলের দায়িত্ব নিতে পারলে ভালো হয়

২. ছোট ব্যবসার পুঁজির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে

মসজিদের মাইকে সাড়া দিতে গিয়ে শহীদ হলেন তাজউদ্দিন

শহীদ তাজউদ্দিন

ক্রমিক : ১২০

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ তাজউদ্দিন (৩৯) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৩ জুলাই ১৯৮৫ সালে সিলেট জেলার বারকোড গ্রামে। পেশায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ৯ বছর পূর্বে ২০১৫ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী রুমি বেগম একজন গৃহিনী। তাদের সংসারে রয়েছে ফুটফুটে ছোট ২ টা মেয়ে। বড় মেয়ে ঈশা জান্নাত তালহার বয়স ৮ বছর। সে ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। ছোট মেয়ে খাদিজা জান্নাতের বয়স মাত্র ২ বছর। শহীদ তাজউদ্দিন গোলাপগঞ্জ উপজেলার বারকোট বাজারে তার একটি মনোহরি দোকান থেকে প্রাপ্ত আয় ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরকারি কর্মকর্তাদের খাবার সাপ্লাই দিয়ে প্রাপ্ত আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

তাজউদ্দীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিন্তু সাহস তার ক্ষুদ্র নয়। ব্যক্তিগত জীবনে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে ছাত্রদের দাবিকে যৌক্তিক মনে করেছিলেন তাজউদ্দিন। তাই আন্দোলনের শুরু থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। স্বৈরাচার হাসিনার অন্যায় আর ছাত্রদের উপর অত্যাচার মেনে নিতে পারেননি এই সাহসী ব্যক্তি। বারবার নেট বন্ধ করে হত্যা গুমের ঘৃণ্য ইতিহাস রচনায় যখন মেতে ওঠে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পালিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ সহ সরকারি পেটোয়া বাহিনী পুলিশ। জনসম্পৃক্ততা সকল পথ যখন বন্ধ করে দেয় তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার। তখন বাধ্য হয়ে ৪ আগস্ট, আনুমানিক সকাল ১১ টার দিকে মসজিদের মাইক দিয়ে আন্দোলনকারী ছাত্ররা তাদের পাশে দাঁড়ানো জন্য এলাকাবাসীর কাছে আহ্বান করলে, তিনি ছাত্র-জনতার সাথে মিছিলে যোগদান করেন। কোন প্রকার উস্কানি ছাড়াই হঠাৎ করেই পুলিশ ও বিজিবি নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে তিনি ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলের পাশে গোপালগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । তার বুকে ও পেটে তিন তিনটি গুলি বিদ্ধ হয়। মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নেওয়ার সুযোগ হয়নি তাকে। শাহাদাতের অমিও সুধা পান করে মহান মনিবের দরবারে হাজির হয়ে যান। তৎকালীন স্বৈরাচার সরকারের দোষ ঢাকতে কোন প্রকার সহযোগিতা করে প্রশাসন। শহীদ তাজউদ্দিনের লাশের ময়না তদন্ত বা সুরতহাল হয়নি। কোন ধরনের মাইকিং না করে তড়িঘড়ি করে তাকে কবরস্থ করা হয়েছে।

শহীদ তাজউদ্দিন সম্পর্কে তার প্রতিবেশী চাচী বলেন- তাজউদ্দিন ভাই-বোনের সকলের মাঝে বড়, সংসারের দেখাশুনা তিনিই করতেন। পরিবারের প্রতি তিনি সবসময় নিয়োজিত ছিলেন। ভাই-বোন সকলকে নিয়ে তিনি একসাথে বসবাস করতেন এবং গোটা পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

শহীদ তাজউদ্দিন তার ব্যবসার আয় থেকেই সংসারের সকল ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। তাদের কোন কৃষি জমি নেই, তাই সকল কিছুই কিনে খেতে হয়। শহীদ তাজউদ্দিনের ছোট ভাই বিদেশে থাকে কিন্তু এখনো কোন টাকা পাঠানো শুরু করেনি। তার রেখে যাওয়া দোকানটি চালানোর মতোও কেউ নেই।

অসুস্থ মা, বোন, স্ত্রী, ছোট দুই কন্যা সন্তান সহ ছয় সদস্যের তাজউদ্দিনের পরিবারের এখন অসহায় অবস্থা।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: তাজউদ্দিন
জন্ম তারিখ	: ০৩/০৭/১৯৮৫
পিতার নাম	: মৃত মকবুল আলী
মায়ের নাম	: সুফিয়া বেগম, বয়স: ৭০, পেশা: গৃহিণী
স্ত্রীর নাম	: রুমি বেগম, পেশা: গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৬ জন
ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা	: দুই মেয়ে
১. বড় মেয়ে	: ঈশা জান্নাত তালহা, বয়স: ৮ পেশা: শিক্ষার্থী, ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত
২. ছোট মেয়ে	: খাদিজা জান্নাতের, বয়স: ২ বছর
পরিবারের মাসিক আয়	: নাই
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বারকোট, ইউনিয়ন: ঢাকা দক্ষিণ, থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: সিলেট
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বারকোট, ইউনিয়ন: ঢাকা দক্ষিণ, থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: সিলেট
ঘটনার স্থান	: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে যা ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলের পাশে
আঘাতকারী	: ঘাতক পুলিশের গুলিতে শহীদ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা

প্রস্তাবনা

১. তার মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা, সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়, সংসার চালানোর ব্যবস্থা করা অতীব জরুরী

ভাত খেতে গিয়ে আর ফেরা হলো না মিনহাজের

শহীদ মিনহাজ আহমদ

ক্রমিক : ১২১

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১৫

পরিচিতি

শহীদ মিনহাজ আহমদের জন্ম ১ জানুয়ারি ২০০২ সালে। তার জন্মস্থান সিলেট জেলার দত্তরাইল গ্রামে। তার পিতা আলউদ্দিন ও মাতা সিতাই বেগম। তার পেশা ছিল মোটর মেকানিক। শহীদ মিনহাজ আহমদের ৪ ভাইয়ের মাঝে বড় ২ ভাই মোটর মেকানিকের ব্যবসা করেন। ছোট ভাই সিলেট মদনমোহন কলেজে অনার্সে পড়াশোনা করেন। তার বাকি ভাই বোন সাঈদ আলম, নাঈম আহমেদ, ইনা বেগম ও রিমা বেগম ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে।

ঘটনার বিবরণ

৪ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার। স্বৈরাচারের গতি যখন নড়বড়ে শেষ মুহূর্তে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একের পর এক চরম সিদ্ধান্ত নেয় ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার। ইতিমধ্যে দেশের এক প্রান্তে সিলেটে বেলা তিনটার দিকে গোলাপগঞ্জ চৌমুহনী এলাকায় বিক্ষোভকারীরা জড়ো হতে থাকেন। এক পর্যায়ে স্বৈরাচারের দোসর টোকাই বাহিনী গোলাপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সেখানে আসে। পরে পুলিশ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিকেল বেলা গোলাপগঞ্জ উপজেলা শহরে সানরাইজ নামক স্কুলের বিপরীত পাশে কদম গাছ তলায় অসংখ্য ছাত্র-জনতা সমবেত হয়। বিকেলে ওয়ার্কশপ থেকে একটি হোটেলে ভাত খেতে যাচ্ছিলেন মিনহাজ। তার মোটর মেকানিকের কারখানার সামনে দিয়ে মিছিলটি অতিক্রম করার সময় মিছিলে যোগদান করে তিনি। এক পর্যায়ে আন্দোলনরত নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে খুনি হাসিনার ঘাতক পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে এবং একটি গুলি তার বুকে লাগলে তাকে সিলেটের নর্থ ইস্ট মেডিকেলে নেওয়া হয়।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করে তাকে সিলেট উসমানী মেডিকেলে স্থানান্তর করার পরামর্শ দেয়। মিনহাজের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা মিনহাজ অবশেষে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

আগস্ট মাসের ৪ তারিখে মারা গেলেও মিনহাজের লাশ দিতে গড়িমসি শুরু করে হাসপাতাল ও পেটোয়া পুলিশ প্রশাসন। খুনি হাসিনার গদি টিকিয়ে রাখতে লাশের তথ্য লোপাট করা শুরু করে তার তাবেদাররা। মিনহাজ আহমদের লাশ পেতে তার বড় ভাই সাঈদ আহমদকে এই মর্মে লিখিত দিতে হয় যে, 'আমার ছোট ভাই মোঃ মিনহাজ আহমদ (২৩) এর মৃতদেহ বিনা ময়না তদন্তে নেওয়ার আবেদন করিতেছি যে, সিলেট গোলাপগঞ্জ থানাধীন কদমতলী বাজারস্থ আমাদের হাফিজ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ০৪/০৮/২০২৪ তারিখ মতে বিকাল অনুমান ৫.০০ ঘটিকার সময় আমার ভাই আমাদের উক্ত ওয়ার্কশপের সামনে দাড়ানো থাকাবস্থায় অজ্ঞাতনামা কয়েকজন লোক আমার ভাইকে মারপিট করে আহত করে। তখন আশপাশের লোকজনের সহায়তায় আমরা তাহাকে গত ০৪/০৮/২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬.৩০ ঘটিকার সময় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়া গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার আমার ভাইকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া মৃত ঘোষণা করেন। আমার ভাইয়ের মৃতদেহ বর্তমানে উক্ত হাসপাতালের হিমাগারে রহিয়াছে। আমার ভাইয়ের মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের পরিবারের কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ নাই এবং উক্ত বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন অভিযোগ বা থানা মামলা মোকদ্দমা করিব না। এমতাবস্থায় আমার ভাইয়ের মৃতদেহ বিনা ময়না তদন্তে নিয়া দাফন করিতে ইচ্ছুক।'

উপজেলা চেয়ারম্যান এর চাপে পড়ে তারা মামলা না করার শর্তে লিখিত দিয়ে অবশেষে ৬ তারিখে লাশ নিয়ে আসেন। তার লাশের সুরতহাল ও ময়না তদন্ত না করেই তড়িঘড়ি করে তাকে দাফন করা হয়।

সন্তানহারা পরিবারের জন্য যে কতটা কষ্ট ছিল এই বিষয়টি তা শুধুমাত্র তার পরিবারই জানে। সন্তান হত্যায় ব্যবহৃত বুলেটের দিকে তাকিয়ে বাবার করুন চেহারা। নির্মমতার শিকার হয়ে তার মৃত্যুতে সারা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মিনহাজের চাচী বললেন, মিনহাজ অবিবাহিত ছিলেন। সাদাসিধে একজন ছেলে, তার রাজনৈতিক কোন পরিচয় নেই, কোন দলের রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না।

নিজের জীবন দানের মাধ্যমে '২৪ এর স্বাধীনতা দিয়ে গেলেন শহীদ মিনহাজ। দেশের মানুষ যেন তার এই মহান আত্মত্যাগের কথা জানতে পারে সেজন্য প্রয়োজন স্বীকৃতি। মিনহাজ তার পরিবারের অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। মিনহাজের বিশাল পরিবারের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সরকারি বেসরকারি সহায়তা প্রয়োজন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মিনহাজ আহমদ
Name
MINHAJ AHMED
পিতা
আলা উদ্দিন
মাতা
সিতাই বেগম
Date of Birth 01 Jan 2002
NID No. 286 324 0723

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মিনহাজ আহমদ
জন্ম তারিখ	: ০১/০১/২০০২
পিতার নাম	: আলাউদ্দিন, বয়স: ৬০, পেশা: বাবুর্চি
মায়ের নাম	: সিতাই বেগম, বয়স: ৫৫, পেশা: গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৭ জন
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: দত্তরাইল, ইউনিয়ন: ঢাকা দক্ষিন, থানা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট
ঘটনার স্থান	: গোলাপগঞ্জ উপজেলায় সানরাইজের বিপরীত পাশে, কদম গাছের তলে
আঘাতকারী	: ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সন্ত্রসীদের আক্রমণে, ঘাতক পুলিশের গুলিতে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট বিকাল ৫টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৪ আগস্ট সন্ধ্যা ৭ টার সময়, সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজ

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

২. তার ওয়ার্কশপের মূলধন বৃদ্ধি ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা

"ছোট ভাইকে মিছিল থেকে আনতে গিয়ে শহীদ হলেন নাজমুল "

শহীদ মো: নাজমুল ইসলাম

ক্রমিক : ১২২

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১৬

শহীদের পরিচয়

নাজমুল ইসলাম ১৩ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে সিলেট জেলার লাক্ষনাবন্দ ইউনিয়নের নিশ্চিন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তৈয়ব আলী ও মাতা চায়না বেগম। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬। শহীদ নাজমুল ইসলাম এর পিতা একজন কৃষক ছিলেন। তাদের অল্প কিছু কৃষি জমি আছে সেখানে বৃদ্ধ বাবা ধান আবাদ করে ছয় মাসের সংসার চালাতেন। অভাবের সংসার হওয়ার কারণে নাজমুল তেমন পড়াশোনার সুযোগ পান নাই। বৃদ্ধ বাবার সংসারের হাল নাজমুলের ওপর বর্তায়। তিনি ১১ বছর ধরে অন্যের দোকানে কাজ করতেন। নাজমুল কাপড় ও জুতার দোকানের আয় দিয়ে মূলত তাদের সংসার চালাত। জুতার দোকানের মালিক তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে একটি দোকান করে দেন। নাজমুলের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ব্যবসা বড় করেন এবং আরো একটি কাপড়ের দোকান দেন। তিনি বিয়ে করেছেন মাত্র তিন মাস আগে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী খাদিজা বেগমের মানসিক সমস্যা হয়ে পাগলপ্রায় অবস্থা। বর্তমানে বাবার বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বড় ভাই তাইজুল ইসলাম আলিম মাদ্রাসা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এবং একমাস পূর্বে শ্রমিক ভিসায় রিযিক অন্বেষণের তাগিদে কানাডাতে পাড়ি জমান। ছোট ভাই সাইদুল ইসলাম বিএনকে হাই স্কুলে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছেন। বোন তানজিলা বেগম বিএনকে হাই স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছেন।

শিশু বাচ্চাকে বাঁচাতে যেভাবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন কেবল বাংলাদেশ নয় বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। ক্ষোভ ও হতাশা যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সুরাহা হয় না তখন বিপ্লব হয়ে ওঠে অপরিহার্য নিয়তি। অধিকার আদায়ে সচেতন শিক্ষিত ছাত্রসমাজ একসময় স্বৈরশাসন ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে থাকে এবং সর্বশেষ মহা বিপ্লবের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে আনে। ১৮ সালের পরিপত্রে বৈধতা

চ্যালেঞ্জ করে ৬ ডিসেম্বর ২০২১ সালে হাইকোর্টের রিট করে সাত মুক্তিযুদ্ধের সন্তান। ৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই পরিপত্রে বাতিলের রায় দেন। হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সূচনা হয়। সেদিনই বিশ্ববিদ্যালয় কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনই অনুষ্ঠিত ছাত্রসমাবেশের ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহ্বান জানানো হয়। একই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পরে ৩ জুলাই আন্দোলনকারীরা ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখে এবং আরো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিক্ষোভ ও অবরোধ করে। ৪ জুলাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল সিদ্ধান্তে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখেন আপিল বিভাগ এবং শুনানি না করে নট টুডে বলে আদেশ দেন। ৬ জুলাই সড়ক মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। নাম দেয়া হয় 'বাংলা ব্লকেড'। সেদিন এই ঘোষণা করা হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের। ১৩ জুলাই সকল গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং জরুরী অধিবেশন ডেকে সরকারি চাকরির সকল যৌক্তিক সংস্কার দাবি করা হয়। পরের দিন রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় সংসদের জরুরী অধিবেশন ডাক দেয়ার সময় বেঁধে দেয়া হয়। সেদিন বিকালে স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে বলেন কোটা মুক্তিযুদ্ধের সন্তানেরা পাবে না তো পাবে রাজাকারের বাচ্চারা। সরকার প্রধানের এমন বক্তব্য যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো হলো। এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাতেই প্রতিবাদ করেন এবং স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা। "তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার সরকার" সেই বিক্ষোভ মিছিল থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন কর্মসূচি দেয়। বলেন, ১৫ জুলাই দুপুর ১২টায় রাজু ভাস্কর্যের সামনে সরকার প্রধানের এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। পরের দিন সকাল দশটায় পাল্টা সমাবেশ দেয় স্বৈরাচার সরকারের অন্যতম পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগ বিকাল তিনটায় সমাবেশ করবে একই স্থানে। বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজু ভাস্কর্যের দিকে আসতে থাকে ঢাকার সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু দুপুরের ঠিক কিছুক্ষণ পরেই বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যেতে না দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এই খবর যখন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কানে পৌঁছায় তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে তৈরি হয় ছাত্রলীগের সাথে সাধারণ ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ। এতে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয় প্রায় তিন শতাধিক সাধারণ শিক্ষার্থী। একটা পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংঘর্ষ থেমে গেলে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামীলীগের খুনি কর্মীরা মেডিকেলে ভর্তি রক্ত আহত শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ধ্যার দিকে আবার হামলা চালায়। কি নেক্কারজনক ঘটনা! গা শিউরে ওঠে। হাসপাতাল হচ্ছে চিকিৎসা নেয়ার প্রতিষ্ঠান এখানে সকল কিছুই নিরাপদ কিন্তু খুনি সরকারের পেটোয়া বাহিনী নিরাপদ স্থানে অরাজকতা সৃষ্টি করে জনজীবনে নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে অবতীর্ণ হয়। পরের দিন কলঙ্কিত ছাত্রলীগের এই হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সারাদেশে দিনভর ব্যাপক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষে নিরস্ত্র আবু সাঈদ সহ ছয় জন সাধারণ শিক্ষার্থী নিহত হয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের নীতি নির্ধারকরা। ৬ জুলাই অতিরিক্ত বিজিবি মোতায়েন করা হয়। ১৭ জুলাই প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদদের স্মরণে গায়েবানা জানাজা

অনুষ্ঠিত করে। এই গায়েবানা জানাজায় পুলিশ হামলা চালায়। শহীদ ভাইদের রক্তের বদলা হিসেবে সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা। ১৮ জুলাই সারা দেশে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে এবং সারাদেশে বিজিবি মোতায়েন করা হয় এবং ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়। ২৯ জুলাই 'কমপ্লিট শাটডাউন' ও সর্বাত্মক অরবরোধ কর্মসূচির পালন ঘিরে ঢাকা সহ সারাদেশে ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সেদিন রাতে সারাদেশে কারফিউ জারি করে স্বৈরাচার সরকার এবং রাতে সেনাবাহিনী মোতায়ন করা হয়। এ যেন এক নির্বিচার গণহত্যায় মেতে উঠেছে নরখাদক, রক্তপিপাসু সরকার যারা জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার করার জন্য সারাদেশে ব্ল্যাক রেড চালু করে স্বৈরাচার সরকার সারাদেশে দুইশোটির বেশি মামলায় ২ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষের নামে অভিযোগ আনা হয়। ৩১ জুলাই মার্চ ফর জাস্টিস কর্মসূচির পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১ আগস্ট নিহতদের স্মরণে 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' শিরোনামে কর্মসূচি পালন করে সারা দেশের সাধারণ শিক্ষার্থী জনতা। পরের দিন ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জুমার নামাজের পর প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল কর্মসূচি পালন করে এবং শিক্ষক ও নাগরিক সমাজ পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে। এতে একাত্মতা ঘোষণা করে শিল্পী সমাজের ব্যতিক্রম প্রতিবাদে সামিল হয় সর্বস্তরের মানুষ। ৩ আগস্ট সরকারের পদত্যাগের 'এক দফা' দাবি উত্তাল সারা বাংলাদেশ ছাত্রদের দাবির সাথে সঙ্গতি জানাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাখো মানুষ সমবেত হয়। সেদিন খুনি ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার শিক্ষার্থীদের আলোচনার প্রস্তাব দিলে, তা প্রত্যাখ্যান করে সমন্বয়করা। ৪ আগস্ট সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে প্রথম দিন সারাদেশে ব্যাপক গণহত্যা পরিচালিত করে পিশাচ হাসিনার পেটোয়া বাহিনী পুলিশ, বিজিপি ও র‍্যাব। ৪ আগস্ট সকালের দিকে নাজমুল তার ছোট ভাইকে মিছিল থেকে আনতে যায়। ১২:৩০ এর দিকে মিছিলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মাঝে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে মিছিল বের করে। বেলা ১টার দিকে ঘাতক পুলিশ ও বিজিবি গুলি করা শুরু করলে নাজমুল গোলাগুলির সময় ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলের পাশে অবস্থান নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গোলাগুলির মাঝে একটি শিশু বাচ্চা দৌড় দিলে নাজমুল বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসে। ঘাতক পুলিশের গুলি এসে নাজমুলের গলায় এক পাশে লেগে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই নাজমুল শাহাদাতবরণ করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়ের অনুভূতি

নাজমুলের প্রতিবেশী বলেন- ১১ বছর ধরে অন্যের দোকানে কাজ করতেন, দোকানের মালিক তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটি দোকান করে দেন। নাজমুল তার কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ব্যবসা বড় করেন এবং আরো একটি কাপড়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নববধূ তার মৃত্যুতে পাগল প্রায় হয়ে গেছে; বর্তমানে সে বাবার বাড়িতে চিকিৎসাধীন আছেন।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: নাজমুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৩-১১-১৯৯৮
পিতার নাম	: মো: তৈয়ব আলী
মায়ের নাম	: চায়না বেগম
পেশা	: গৃহিণী
স্ত্রীর নাম	: খাতিজা বেগম, পেশা: গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৬ জন
পরিবারের মাসিক আয়	: ৪০ হাজার টাকা
পেশা	: জুতা ও কাপড়ের নিজের দুইটা দোকান আছে
স্থায়ী ঠিকানা	: সিলেট জেলার গোপালগঞ্জ থানার লাক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের নিশ্চিন্ত গ্রামে
ঘটনার স্থান	: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলের পাশে
আঘাতকারী	: সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ১:০০ টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ১:৩০ টা
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান সিলেট

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. অসুস্থ স্ত্রীর সঠিক পরিচর্যা ও মানসিক কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা

শহীদ কামরুল ইসলাম পাভেল

ক্রমিক : ১২৩

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১৭

শহীদের পরিচয়

মো: কামরুল ইসলাম পাভেল ৬ এপ্রিল ২০০১ সালে সিলেট জেলার উত্তর কানিশাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: রফিকুল উদ্দিন এবং মাতা দিলারা বেগম দম্পতি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬। এই পরিবারের চার ছেলে এক মেয়ে। পিতা দোকানদার ও মাতা গৃহিনী। শহীদের পিতা জনাব রফিক উদ্দিন অন্যের দোকানে মাসিক বেতনে কাজ করে যা আয় করতেন তা দিয়ে ছয় জনের সংসার চালাতেন। পাভেল ২৮ পারা কোরআনের হাফেজ ছিলেন।সিলেট শহরে আসেন পড়াশোনার আশায়। পড়াশুনার পাশাপাশি সিলেট শহরে পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দিতে অন্যের ভুসিমাল এর দোকানে খন্ডকালীন কাজ করতেন। পরিবারের ছোট ছেলে কামরুল ইসলাম পাভেল। তাদের কোন আবাদি জমি নেই এবং পাভেলের বড় ভাই গুলো বেকার থাকায় সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে রফিকুলের। পাভেলের বড় ভাই পিকলু আহমেদ বয়স ২৮, ব্রু বার্ড উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। মেজ ভাই টিপু সুলতান ২৬, ঢাকা দক্ষিণ ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। সেজ ভাই সায়েল আহমেদ (১৯), জামিয়া ইসলামিয়া দক্ষিণ দক্তরাইল মাদ্রাসার চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। বোন মাসুম আক্তার পাপিয়া (২৪), ঢাকা দক্ষিণ ডিগ্রী কলেজে বিএ পড়াশোনা করেছেন।

শহীদ হয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া

ছাত্ররাই অজেয়- এটা শুধু বাংলাদেশী নয়। এ সফলতা যতোটা না সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থার বৈকল্যকে তুলে ধরেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশের ছাত্র বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ইতিহাস বদলে দেয়া ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্ব সংঘটিত ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব মিল রয়েছে। দীর্ঘ সময়ের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের মাধ্যমে ইতিহাসে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন ১ জুলাই ২০২৪ থেকে সূচনা করে। সরকারি চাকরিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রাধিকার সহ কথিত দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে আয় ব্যয়ের বিপুল ব্যবধান তৈরি করা হয়। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার করা নিয়ে আন্দোলন

শুরু হলেও একপর্যায়ে নির্মমভাবে আন্দোলন দমনের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন অভ্যুত্থানে তা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা ক্লাস, পরীক্ষা বর্জন করে; লাগাতার কর্মসূচি চলে। এ আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগায়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হল ও বিভাগ ভিত্তিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে ছাত্ররা সুসংগঠিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কোটা বিরোধী পোস্টার,প্লেকার্ড ও ব্যানার বানিয়ে আন্দোলনে শরিক হয়। আন্দোলনের প্রয়োজনে নিজেরাই ক্ষুদ্র তহবিল সৃষ্টি করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে এ আন্দোলনে একক কাউকে মুখপাত্র নির্বাচন করা হয়নি। সারাদেশ থেকে আন্দোলনকে সুসংগঠিত করতে ৬৫ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। যেখানে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ জন সমন্বয় করেছেন। এদের হাত ধরেই বাংলার নতুন সূর্য উদয় হয়েছে। এই আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট রিজিম পরিবর্তন করে সফল হয় ছাত্র আন্দোলন। তবে এ আন্দোলনের প্রভাব অনেক গভীর ও ব্যাপক। আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য বিভিন্ন ধাপে ভাগ করা হয়। কখনো বাংলা ব্লকেড শুরু হয় ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত ,কমপ্লিট শাটডাউন ১৮ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত, গণ পদযাত্রা ১৪ জুলাই পালন করা হয়। ফ্যাসিবাদ ,মার্চ ফর জাস্টিস ৩১ জুলাই পালিত হয়। রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস পালন করে ১ আগস্ট, রেমিটেন্স উইক, ৩ তারিখ ঘোষণা করা হয় মার্চ ফর ঢাকা। মার্চ ফর ঢাকা কে কেন্দ্র করে যখন এক দফার দাবিতে সারা দেশ অগ্নিগর্ভে নিমজ্জিত। গণমানুষ সুনামির মত গণজোয়ারে রূপান্তরিত হয়ে যখন এই স্বৈরাচার সরকারের বিরোধী হুংকারে মেতে উঠেছে তখন কামরুল ইসলাম পাভেল ঘরে বসে থাকতে পারে কি? পাভেল ৫ আগস্ট গণমানুষের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শুরু করে মিছিল। মিছিলটি এসপির বাসার সামনে আসলে পুলিশ মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করে। পাভেল মিছিলের সামনের সারিতেই ছিল। একটি গুলি পাভেলের বুকে এসে লাগে। লাগার সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পাবেল। তাৎক্ষণিক তার মৃত্যু হয়। তার লাশ ময়নাতদন্ত করা হয় নাই।

শহীদের সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদ মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম পায়েল (২৩) সম্পর্কে তার বড় ভাই পিপলু আহমেদ বলেন- সে অনেক সাহসী ও মেধাবী ছিল। নিয়মিত নামাজ আদায় করত এবং সবাইকে নামাজের দিকে আহ্বান করত। ২৮ পারা কুরআনের হাফেজ ছিল। তার স্বপ্ন ছিল মস্ত বড় আলেম হবার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: কামরুল ইসলাম পাভেল
জন্ম তারিখ	: ০৬-০৪-২০০১
পেশা	: ছাত্র ও খন্ডকালীন কাজ
পিতার নাম	: মো: রফিক উদ্দিন
মায়ের নাম	: দিলারা বেগম, পেশা: গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৬ জন
পরিবারের মাসিক আয়	: ২০০০০ টাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: সিলেট জেলার গোপালগঞ্জ থানার উত্তর কানিশাইল গ্রাম
ঘটনার স্থান	: সিলেট শহরে আলী আমজাদের ঘরের দোকানের পাশে
আঘাতকারী	: ফ্যাসিস্ট হাসিনার খুনি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর গুলিতে
আহত হওয়ার সময় কাল	: বিজয় মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলিতে আনুমানিক বিকাল চারটা থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে আহত হন
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৫ আগস্ট ২৪ বিকাল ৪:০০ থেকে ৪:৩০টা
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান সিলেট

প্রস্তাবনা

১. রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা

২. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

“আর কখনো মায়ের ফোন ধরবেনা ছেলে”

শহীদ জয় আহমেদ হাসান

ক্রমিক : ১২৪

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১৮

পরিচিতি

শহীদ জয় আহমেদ হাসান অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। পাশাপাশি অন্যকেও নামাজের দাওয়াত দিতেন। মাঝে মধ্যেই তিনি দ্বীনের খেদমতে তাবলীগ জামায়াতে চলে যেতেন। তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক ভালো মানুষ। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। তার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হতেন। না খেয়ে থাকলেও কখনো কারও কাছে হাত পাতেন নি।

শহীদ জয় আহমেদ হাসান ২০০৬ সালে সিলেটের দক্ষিণ রায়গড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জনাব মো: সুরাই মিয়া এবং মাতা মোসা: সালমা বেগম। শহীদ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন। ছোটকালেই তিনি তার বাবাকে হারান। অনেকগুলো ভাইবোন নিয়ে তাঁরা ছোট্ট একটি দালান ঘরে বসবাস করতেন। দরিদ্রতার কারনে পড়াশোনা ছেড়ে টেইলার্সে দর্জির কাজ শুরু করেন শহীদ জয় আহমেদ। অল্প বয়সেই পরিবারের হাল ধরেন।

জুলাইয়ের আন্দোলনে স্বৈরশাসন এর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে শহীদ হন জয় আহমেদ হাসান। ৩৫ জুলাই (৪ আগস্ট) স্বৈরাচারের বুলেটের আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। জয়ের মৃত্যুতে তার পরিবারে বয়ে যায় শোকের ঢেউ। মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে থাকবে এই মহানায়কের নাম।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা

দেশের জন্য মহান ব্রত নিয়ে আত্মত্যাগের ইতিহাস অল্প কয়েকজনই রচনা করেন। যারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তারা শুধু নিজেদের জন্য নয় পুরো জাতির জন্য এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকেন। তাদের মহান আত্মত্যাগ তখন হয়ে দাঁড়ায় দেশেরে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধির রক্ষাকবচ। এমন ব্যক্তিরা শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিক এবং নৈতিক শক্তি দিয়ে আগলে রাখেন জাতিকে। তাদের সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে ওঠে আলোকবর্তিকা। ইতিহাসের পাতায় দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা বীরদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে এবং তারা জাতির হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকেন। তেমনি এক সাহসী যুবক শহীদ জয় আহমেদ হাসান।

রক্তাক্ত জুলাই যেন শেষই হচ্ছিল না। ৩৫ জুলাই (৪ আগস্ট) মসজিদে মাইকিং করে ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়। জীবনের মায়া ত্যাগ করে আন্দোলনে শামিল হন শহীদ জয় আহমেদ হাসান। সিলেটের ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে, জাস্টিস জাস্টিস, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট একশন, আপোষ না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকে।

আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোঁড়ে ঘাতক পুলিশ। সেখানে পুলিশের সাথে যুক্ত হয় বিজিবি। ছাত্র-জনতা ইট পাটকেল ছুঁড়ে পুলিশকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বৈরাচারী হাসিনার পেটোয়া পুলিশ বাহিনী অতর্কিত গুলি চালালে সেখানে ছাত্র-জনতা টিকে থাকতে পারে না। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। একের পর এক সাধারণ শিক্ষার্থী গুলি বিদ্ধ হয়ে রাস্তায় মুখ থোবড়ে পড়ে। একটি গুলি এসে শহীদ জয় আহমেদ হাসানের বুকে বিদ্ধ হয়।

ছাত্ররা তাকে উদ্ধার করে সিলেট ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে রাত ৮ টার দিকে তার দেহ থেকে নিষ্পাপ আত্মাটি উড়ে যায়। চলে যান শহীদ জয়, রেখে যান অমুছনীয় প্রেরাণাদায়ক স্মৃতি।

শহীদ সম্পর্কে নিকটত্মায়ীর বক্তব্য

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তার বড় ভাই মনসুর আলম বলেন, "৪ আগস্ট সকালে মসজিদে মাইক দিয়ে ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলে শহীদ জয় আহমেদ হাসান মিছিলে শরীক হন। মা ডেকে নিয়ে আসবে বলে সে মোবইল বন্ধ করে রাখে। হঠাৎ পুলিশের একটি গুলি এসে তার বুকে লাগে। উপস্থিত ছাত্ররা ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাত ৮টার দিকে তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে চলে যান। রেখে যান বহু স্মৃতি।"

পারিবারিক অবস্থা

তার বাবা নেই। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন। অনেকগুলো ভাইবোন নিয়ে তাদের সংসার। দরিদ্র পরিবারের হাল ধরতে টেইলার্সের কাজ করতেন। ছোট্ট দালান ঘরে পরিবারের সবাই মিলে চাপাচাপি করে বসবাস করেন। তাদের কোন আবাদি জমি নেই। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ।

দাফন

শহীদ জয় আহমেদ শাহাদাত বরণের পর তার লাশ নিয়ে তৈরি হয় নানান জটিলতা। তার লাশ কোন প্রকার ময়না তদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত দাফন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। পরে অনেকটা তড়িঘড়ি করেই তাকে নিজ গ্রামের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ জয় আহমেদ হাসান
পেশা	: টেইলার্সের কাজ
জন্ম তারিখ	: ০৮/০২/২০০৬
জন্ম স্থান	: দক্ষিণ রায়গর, সিলেট
পিতা	: জনাব মো: সুরাই মিয়া
মাতা	: সালমা বেগম
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগষ্ট ২০২৪ সকাল ১:০০-১:৩০
স্থান	: সিলেটের ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলের সামনে
শাহাদাতের তারিখ	: ৪ আগষ্ট ২০২৪ রাত ৮টা

প্রস্তাবনা

১. রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা

২. বাসস্থান করে দেয়া

৩. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

৪. পরিবারের সকল সদস্যের ভবিষ্যত নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা

“আমার যে আর কেউ রইল না” -শহীদের মা

শহীদ সানি আহমদ

ক্রমিক : ১২৫

আইডি : সিলেট বিভাগ ০১৯

পরিচিতি

শহীদ সানি আহমেদ ২০০০ সালে সিলেটের শিলঘাটে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা জনাব মো: কয়ছর আহমদ একজন দিনমজুর। তার মা মোসা: রুবিয়া বেগম গৃহিণী। পিতা-মাতার এক মাত্র ছেলে সন্তান শহীদ সানি আহমেদ। দারিদ্রতার কারণে অল্প বয়সেই পড়াশোনা ছেড়ে বাবার সাথে দিনমজুরের কাজ শুরু করেন। তাদের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। তাই তাদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়। বাবা-ছেলে মিলে যা আয় করত তার অর্ধেক বাড়ি ভাড়া দিতেই চলে যেত। বাকি টাকা দিয়ে কোনমতে ডাল-ভাত খেয়ে পরিবারের সাথে দিন পার করতেন শহীদ সানি আহমেদ। তাঁরা ৬ ভাইবোন। ৪ বোনের মধ্যে মাত্র ১ বোনের বিয়ে হয়েছে। তাঁর বাকি ভাইবোনরা সবাই পড়াশোনা করে। ছোট ভাই সামি আহমদকে কোরআনের হাফেজ বানানোর স্বপ্ন দেখতেন। এজন্য সামিকে স্থানীয় একটি হাফেজী মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। শহীদ সানির পিতা জনাব কয়সার আহমদ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। প্রায় সময় অসুস্থ থাকেন। যার ফলে পুরো পরিবার শহীদ সানির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। নিজেদের কোন জমিজমা না থাকায় অন্যের জমিতে কাজ করেই তাদের সংসার চলত। এভাবেই তারা মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন।

শহীদ সানি আহমেদ ছিলেন অত্যন্ত নম্র-ভদ্র ও মিশুক একজন ছেলে। এলাকার বন্ধুদের সাথে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে অল্প বয়সেই পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাজে নেমে পড়তে হয়। দারিদ্রতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কিশোর সানির স্বপ্নগুলো মলিন হয়ে যায়। স্বপ্ন গুলো যখন অন্ধকার হতাশার সাগরে ডুবে যায় মৃত্যুই যেন তখন হয়ে উঠে কঠিন সত্য। নির্মম অন্ধকারকে আড়াল করে নিজের বুক চিতিয়ে উদ্দ্যত চিত্তে সানি আহমেদ দেখিয়ে দেয় স্বপ্ন দেখার সাহস। ৪ আগস্ট আন্দোলন চলাকালে ঘাতক পুলিশের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদাতের ঘটনা

৪ আগস্ট ২০২৪ মসজিদে মাইকিং করে ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়। জীবনের মায়া ত্যাগ করে আন্দোলনে শামিল হন শহীদ সানি আহমেদ। সিলেটের ব্রিটিশ আইডিয়াল স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে, জাস্টিস জাস্টিস, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট একশন, আপোষ না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকে।

আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোঁড়ে পুলিশ। সেখানে পুলিশের সাথে যুক্ত হয় বিজিবি। ছাত্র-জনতা ইট পাটকেল ছুঁড়ে পুলিশকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী অতর্কিত গুলি চালালে সেখানে ছাত্র-জনতা টিকে থাকতে পারে না। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। একের পর এক সাধারণ শিক্ষার্থী গুলি বিদ্ধ হয়ে রাস্তায় মুখ থোবড়ে পড়ে। একটি গুলি এসে শহীদ সানি আহমেদের বুকে বিদ্ধ হয়।

ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত সানি আহমেদকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আবু সাইদ, মুগ্ধর মত সানিও যুক্ত হন মৃত্যুর মিছিলে। তার লাশের ময়না তদন্ত না করেই তড়িঘড়ি করে দ্রুত দাফন সম্পন্ন করা হয়।

দাফন

নিজ গ্রামেই তার দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

সন্তানকে হারিয়ে পিতা মাতা দুজনেই পাগলপ্রায়। মায়ের অনুভূতি প্রকাশ করার মত না।

তার গর্বিত বাবা বলেন, "আমার ছেলে অত্যন্ত নম্র-ভদ্র স্বভাবের ছিল। তার একমাত্র আয়েই সংসার চলত। তার দিকেই পরিবারের সকলে তাকিয়ে থাকতাম। তাকে হারিয়ে আমরা নিস্ব হয়ে গেলাম। এখন আমি কি নিয়ে বাঁচব। আমার যে আর কেউ রইল না।"

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ সানি আহমেদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। তারা ৬ ভাইবোন। ৪ বোনের মধ্যে মাত্র ১ বোনের বিয়ে হয়েছে। তার বাকি ভাইবোনরা সবাই পড়াশোনা করে। ছোট ভাই সামি আহমদকে কোরআনের হাফেজ বানানোর স্বপ্ন দেখতেন। এজন্য সামিকে স্থানীয় একটি হাফেজী মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন।

শহীদ সানির পিতা জনাব কয়সার আহমদ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। প্রায় সময় অসুস্থ থাকেন। যার ফলে পুরো পরিবার শহীদ সানির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। নিজেদের কোন জমি-জমা না থাকায় অন্যের জমিতে কাজ করেই তাদের সংসার চলত। এভাবেই তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছিলেন। তাদের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। তাই তাদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়। বাবা-ছেলে মিলে যা আয় করত তার অর্ধেক বাড়ি ভাড়া দিতেই চলে যেত। বাকি টাকা দিয়ে কোনমতে ডাল-ভাত খেয়ে পরিবারের সাথে দিন পার করতেন শহীদ সানি আহমদ। এর মধ্যে সানির শাহাদাত বরণ পরিবারে চরম সংকট তৈরি করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: সানি আহমদ
Name: SUNNY AHMED
পিতা: মোঃ কয়ছর আহমদ
মাতা: রুবিয়া বেগম
Date of Birth: 03 Nov 2000
ID NO: 4213147749

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ সানি আহমদ, পেশা: দিনমজুর
জন্ম তারিখ	: ০৩/১১/২০০০
জন্ম স্থান	: সিলেটের শিলঘাটে
পিতা	: মো: কয়সর আহমদ
মাতা	: রুবিয়া বেগম
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগষ্ট ২০২৪
স্থান	: ব্রিটিশ আইডয়াল স্কুলের সামনে
শাহাদাতের তারিখ	: ৪ আগষ্ট ২০২৪, ঘটনাস্থলেই
স্থায়ী ঠিকানা	: কুমাড়পাড়া, শিলঘাট, সিলেট

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. বাসস্থান করে দেয়া
৩. অসুস্থ বাবার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
৪. শহীদের বাকি ভাই বোনের নিরাপদ ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা

মা আমি আব্বাকে হারাইছি, তোমাকে হারাতে পারবনা : শহীদ গৌছ উদ্দিন

শহীদ গৌছ উদ্দিন
ক্রমিক : ১২৬
আইডি : সিলেট বিভাগ ০২০

পরিচিতি

গৌছ উদ্দিন সিলেট জেলার গোপালগঞ্জ উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের ঘোষগাঁও উত্তরে ৭ মার্চ ১৯৯২ সালে এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা (মৃত) মবারক আলী এবং মা লেবু বেগম (৫৫) একজন গৃহিণী। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মেধাবী। গ্রামের অন্যান্য সাধারণ ছেলেদের মত সেও হেসে খেলে, পড়াশোনা করে জীবন কাটাচ্ছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। সাত ভাই-বোনের মধ্যে সে ছিল প্রথম। যেহেতু তার বাবার মৃত্যুর পরে পরিবারে বড় সন্তান হিসেবে ছোট ছোট সকল ভাই বোনের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পরে। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আয় রোজগারের রাস্তায় নেমে পরে গৌছ। এতে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। ভাড়ায় সিএনজি চালাত সে। কোনো জমি-জমাও না থাকায় প্রতিদিন সিএনজি চালানো আবশ্যক ছিল গৌছের জন্য। এমনকি অবিবাহিত গৌছ তার বোনের ছেলের পড়াশোনার খরচও বহন করতেন। সংসার চালানোর জন্য তার আয়ই ছিল একমাত্র ভরসা।

ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরুর পর থেকে কমতে থাকে যাত্রী পরিবহন এবং গৌছের আয়ও কমতে থাকে। কিন্তু কি আর করার? জুলাই মাসে যত দিন যেতে থাকে তত আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তখন ছাত্র-জনতা স্বৈরাচার হাসিনার কঠোরতা কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে এবং আগস্ট মাস থেকে শুরু হয় হাসিনা স্বৈরাচারের পদত্যাগের দাবীতে এক দফা আন্দোলন। পুলিশ লীগও বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে থাকে এবং তাদের সাথে যোগ দেয় বিজিবি বাহিনী। রাজপথ পরিণত হয় রক্তের সাগরে। গৌস উদ্দিন একদিন আয় না করলে তার মা - ভাইবোন ভাগিনাকে না খেয়ে থাকতে হবে। তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে। তাই উপায় না দেখে স্বৈরাচার বিরোধী চরম আন্দোলনের মধ্যেও বের হয় অর্থ উপার্জনের জন্য।

এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝেও গৌছ পেটের দায়ে আগস্ট মাসের ৪ তারিখে সিএনজি নিয়ে বের হয়। এমতাবস্থায় পুলিশ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। গৌছ ঘটনাস্থলেই ছিলেন, সে পুলিশের গুলির ভিডিও ধারণ করছিল। সেই মুহূর্তে এক রাউন্ড গুলি এসে তার পেটে লাগে এবং পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় সে, তার গায়ের জামা রক্তে জবজবে হয়ে যায় আর সে মৃত্যু যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। দুঃখের বিষয় গৌছের ধারণকৃত ভিডিওতে তার নিজের মৃত্যুরই ফুটেজ রেকর্ড হয়।

আশেপাশে থাকা জনগণ দ্রুত ছুটে আসে গৌছের দিকে এবং তাকে সিলেট উসমানি মেডিকেলে নিয়ে যায়, কিন্তু চিকিৎসার কিছু সময় পরই গৌছ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার লাশ দুই দিন পরে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ৫ আগস্ট স্বৈরাচার হাসিনার পতন হয় কিন্তু আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করার মত সৌভাগ্য তার আর হয়না।

গৌছের মৃত্যুর পর তার পরিবারে নেমে আসে হতাশা। মা লেবু বেগম তার একমাত্র ভরসা সন্তানকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির মৃত্যুতে অভাবের পরিবারে আরও অভাব বাড়তে থাকে। অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা, ভাই-বোনদের পড়াশোনা, আর ভাগিনার পড়াশোনার খরচ যোগাতে অন্যের সহযোগিতার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

গৌছের মা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'গৌছ ছিল আমার সব। সে সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করত।' সে বলেছিল 'মা আমি আব্বাকে হারাইছি তোমারে হারাতে পারবনা।'

গৌছ উদ্দিনের জীবন ও মৃত্যু শুধুমাত্র একটি ট্রাজেডি নয়; এটি একটি সংগ্রামের কাহিনী। আজও তার স্মৃতি পরিবারের মনে জীবন্ত হয়ে থাকবে। আজীবন দেশের মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে গৌছ।

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: গৌছ উদ্দিন
জন্ম তারিখ	: ৭ মার্চ ১৯৯২
বাবার নাম	: (মৃত) মবারক আলী
মায়ের নাম	: লেবু বেগম (৫৫)
পেশা	: সিএনজি চালক
নিকটাত্মীয়	: ৪ ভাই, ১ বোন
স্থায়ী ঠিকানাগ্রাম	: ঘোষগাও উত্তর, ইউনিয়ন : ঘোষগাও, উপজেলা : গোপালগঞ্জ, জেলা: সিলেট
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
ঘটনার স্থান	: কদনতলী সানরাইজ রেস্টুরেন্টের সামনে
আঘাতকারী	: পেটোয়া পুলিশলীগ
আহত হওয়ার সময়	: ৪ আগষ্ট ২০২৪, বিকাল ৪:৩০ মিনিট
নিহত হওয়ার সময়	: বিকাল ৪:৩০ মিনিটে উসমানী মেডিকেলে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া
২. এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান
৩. শহীদ পরিবারের সকল খরচ নিশ্চিত করা

বিজয় মিছিলে গিয়েও বিজয়ের স্বাদ ভোগের সুযোগ হয়নি ময়নুলের

শহীদ ময়নুল ইসলাম

ক্রমিক : ১২৭

আইডি : সিলেট বিভাগ ০২১

জীবনশৈলী

শহীদ ময়নুল ইসলাম সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার ৫ নং ওয়ার্ডের নয়াগ্রামে ২০ মার্চ ১৯৮৩ সালে অত্যন্ত দরিদ্র এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা (মৃত) সিরাজ মিয়া ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক এবং মাতা (মৃত) লাল বানু ছিলেন একজন গৃহিণী। তিনি মূলত দারিদ্রতার মধ্যেই তার শৈশব কৈশোর কাটিয়েছেন। শহীদ ময়নুল ইসলাম একজন সহজ সরল নির্ভেজাল মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং এলাকাবাসীকে নামাজের জন্য ডাকতেন। নিজের সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি এলাকার মানুষের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতেন। কখনো কারো কাছে ধার-দেনা করেননি, এমনকি খাবারের অভাবে থেকেও কাউকে বিরক্ত করেননি। ঘরসংসার ও ধর্মীয় কর্মসূচির বাইরে তিনি কোনো খারাপ কাজে জড়িত ছিলেন না।

পারিবারিক জীবন

ময়নুল পারিবারিক জীবনেও দারিদ্রর্যের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাই সে রাস্তার পাশে ফুটপাতে সবজি এবং কলার ব্যাবসা করে। কিন্তু তা দিয়ে পরিবারের খরচ চালানো ছিল দুরহ ব্যাপার। তার পরিবারে স্ত্রী এবং দুটি ছোট সন্তান রয়েছে।যদিও তিনি দারিদ্রতার মাঝে জীবনযাপন করেন কিন্তু তার সন্তান্দের পড়াশোনার বিষয়ে অনেক সচেতন ছিলেন। তার বড় মেয়ে ফাতেমা আক্তার (১২) তোফাজ্জল বশির উচ্চবিদ্যালয়ে এবং ছোট ছেলে শিহাব আহমেদ (১০) নয়াগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিই ছিলেন ময়নুল ইসলাম। তার মৃত্যুর পর পরিবারটির কষ্টের পরিমাণ বেড়ে গেছে। তার অবর্তমানে পরিবারের ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তার সন্তানদের নিয়ে স্ত্রী বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০২৪ সালের ৫ জুলাই শুরু হওয়া কোটাবিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীতে ১৬ জুলাই থেকে আক্রমণাত্মক আচরণ শুরু করে স্বৈরাচার হাসিনার লাঠিয়াল বাহিনী ছাত্রলীগ, পুলিশ ও বিজিবি। দেশের প্রতিটি জেলায় তারা রাস্তায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ছাত্রদেরকে নির্মমভাবে অত্যাচার করতে থাকে। এরকম পরিস্থিতির মাঝে ময়নুল ইসলাম বিভিন্নভবাবে শিক্ষার্থীদেরকে, রাস্তার নির্যাতিত মানুষদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ময়নুল।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন যখন চরম আকার ধারণ করে এর কিছুদিন তিনি আন্দোলনে যোগদান করেন। অবশেষে ৫ আগস্ট বেলা ১২ টায় যখন সাইকো শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় তখন সারাদেশের ন্যায় সিলেটেও অনেক বড় বিজয় মিছিল বের করে ছাত্র-জনতা। সেই বিজয় মিছিলেই যোগদান করেন ময়নুল ইসলাম।

কিন্তু খুনি হাসিনার লাঠিয়াল বাহিনী ছাত্রলীগ এবং বন্দুক বাহিনী পুলিশ ও বিজিবি তখনও ধূর্ত হাসিনার পলায়নের খবর না জেনে পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে।

যখন ময়নুল ইসলাম সহ সেই বিজয় মিছিল বিয়ানীবাজার থানা গেটের সামনে যায় তখন পুলিশ বিজিবির মুহুর্মুহু গুলির মধ্য থেকে একটা ময়নুলের বুকে লাগে। বুলেটটি ময়নুলের বুক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকে শরীর থেকে। এমন সময় আরও একটি গুলি এসে তার হাতে লাগে। রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে পিচঢালা শক্ত রাস্তায়। গামছা রক্তে ভিজে যায় এবং গায়ের শার্ট ও লুঙ্গিতে রক্ত লেগে তা শরীরের সাথে লেপ্টে যেতে থাকে। একপর্যায়ে চোখ ঘোলা হয়ে আসে ময়নুলের এবং অবশেষে সেখানেই চিরজীবনের জন্য চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হয় ময়নুল ইসলাম। ময়নাতদন্তের পূর্বে তার দাফন সম্ভব হয়নি, যা তার পরিবারের জন্য আরও এক বিপর্যয় নিয়ে এসেছে।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

ময়নুল ইসলামের মৃত্যুতে তার পরিবারে গভীর শোক ও কষ্ট নেমে এসেছে, নেমে এসেছে অন্ধকার। দুই ছোট সন্তান এবং স্ত্রী এখন অর্থনৈতিকভাবে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছেন। তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোও এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: ময়নুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ২০ মার্চ ১৯৮৩
পিতার নাম	: সিরাজ মিয়া (মৃত)
মাতার নাম	: লাল বানু (মৃত)
পেশা	: ক্ষুদ্র সবজি ও কলা ব্যবসায়ী
মেয়ে	: ফাতেমা আক্তার (১২) ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী
ছেলে	: শিহাব আহমেদ (১০) পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নয়াগ্রাম, উপজেলা: বিয়ানীবাজার, জেলা: সিলেট
ঘটনার স্থান	: বিয়ানীবাজার থানার সামনের রাস্তায়
আঘাতকারী	: পেটুয়া পুলিশ বাহিনীর ছোড়া বুলেট
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫:৩০
নিহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫:৩০

প্রস্তাবনা

১. এই আবাসনহীন বীর সৈনিকের আবাসন সমস্যা মেটানো অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তার দুই সন্তানের পড়ালেখা যাতে বন্ধ না হয় সেদিকেও নজর রাখা উচিত। এমনকি পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব নেয়া অত্যন্ত জরুরি।

২. মইনুল ইসলাম ছিলেন একজন আদর্শ মানব, যার জীবন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। তার আত্মত্যাগের জন্য তিনি আজীবন বাঙালির মনে তারা হয়ে জ্বলতে থাকবেন।

শহীদ মো রায়হান উদ্দিন

ক্রমিক : ১২৮

আইডি : সিলেট বিভাগ ০২২

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী এক তরুণ ছাত্র শহীদ মোহাম্মদ রায়হান। ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, যুগের পরে যুগ ধরে স্মরণ করা হবে, তাদের মধ্যে শহীদ রায়হান উদ্দিন অন্যতম। শহীদ রায়হানের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা ফারুক আহমেদ তার পানের দোকানের মুনাফা থেকে পরিবার পরিচালনা করেন। ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তেলকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রায়হান। তিনি গ্রামের বাড়িতে বেড়ে ওঠেন এবং শৈশবকাল অতিবাহিত করেন।

চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি মেঝ। তার পিতার সামান্য পান বিক্রির টাকা থেকে পরিবার পরিজনের খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয়। সেটা দেখে শহীদ রায়হান শপথ নেন যে, পড়াশোনা শেষ করে মর্যাদা পূর্ণ একটি চাকরি করবেন। তিনি তার পরিবার-পরিজনের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেতে চান। তার ছোট দুই ভাইকে নিয়ে দেখতেন আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন। সেই পথেই হাঁটতে গিয়ে তিনি নিজ জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ছুটে যান কুড়ার বাজার কলেজে। সেখানে তিনি একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ছাত্র আন্দোলনের সময় পরীক্ষার্থী হলেও তিনি দেশকে এতটাই ভালবাসতেন যে, আন্দোলন থেকে কেউ তাকে দূরে রাখতে পারেনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। তার অসাধারণ আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় বন্ধু বান্ধব, পরিবার-পরিজন সকলেই আকৃষ্ট হতেন। ধর্মপরায়ণ এই মেধাবী শিক্ষার্থী জাতিকে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন।

শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা

২০২৪ সালের জুলাই মাস ব্যাপী চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোটার সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল স্বাধীন সার্বভৌম দেশে কোন ব্যক্তির সাথে বৈষম্য করা যাবে না। দেশকে গঠনের জন্য নিয়োগকৃত সরকারি বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অবশ্যই মেধাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে বিশ্ব দরবারে। একথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোটা একটি বৈষম্যের নাম। এই কোটা বৈষম্য থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে রাজপথে নামে তরুণ ছাত্রসমাজ। জুলাইয়ের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত আন্দোলন চলছিল বেশ শান্ত ভাবেই। কিন্তু স্বৈরাচার সরকারের এমপি মন্ত্রী এবং তাদের দলীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের উপরে নির্মমভাবে আক্রমণ চালানো হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপরে চরম নির্যাতন করা হয়। এমনকি মেয়েদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। ১৫ তারিখে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাত উপলক্ষে সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। শিক্ষার্থীদের পাশে এসে দাঁড়ায় আইনজীবী, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ এবং অভিভাবক সমাজ। ৪ দফা, ৮ দফা, ৯ দফার মতো অনেকগুলো দফাই দেওয়া হয় ছাত্রদের পক্ষ থেকে। সরকার তাদের কোন দফার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। বরং তাদের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়। খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া বাহিনীর দ্বারা বাংলার মেধাবী শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুরসহ আমজনতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মৃত্যুর বন্যা বইয়ে দেওয়ার জন্য আকাশ থেকেও করা হয় গুলিবর্ষণ। খালি হতে থাকে অসংখ্য মায়ের কোল। অসংখ্য বাবা তার ছেলেকে হারায়, অসংখ্য ভাই তার ভাইকে হারায়, অসংখ্য ভাই তার বোনকে হারায় এই আন্দোলনে। সর্বশেষে ৪ আগস্টে এক দফা ঘোষণা করা হয় ৫ তারিখে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি অর্থাৎ অর্থাৎ স্বৈরাচারী হাসিনার পতন। সারা দেশ থেকে ছাত্র-জনতা আসে ঢাকায়। ৫ তারিখে ঢাকাসহ সারাদেশে রাজপথে নামে মানুষের ঢল। বিজয় হয় বাংলার ছাত্র জনতার। ১৫ বছরের স্বৈরাশাসক থেকে রক্ষা পেয়ে বিজয় উল্লাস করে দেশ-বিদেশের মানুষ।

আন্দোলনের বিজয়ের পর তেমনিভাবে শহীদ রায়হান সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার সামনে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করে। থানার সামনে গেলে পুলিশ সদস্যরা বিজয় মিছিলের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। প্রথমে দুইটা গুলি এসে লাগে শহীদ রায়হানের শরীরে। পরবর্তী আরেকটা গুলি আসে লাগে তার বুকে। ঘটনাস্থলেই মারা যান শহীদ রায়হান।

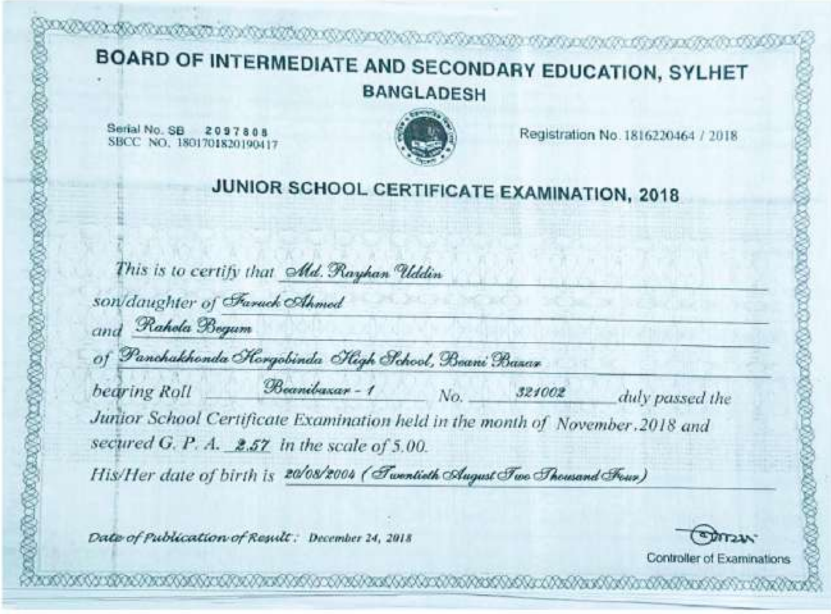

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SYLHET
BANGLADESH

Serial No. SB 2097808
SBCC NO. 1801701820190417

Registration No. 1816220464 / 2018

JUNIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 2018

This is to certify that Md. Rayhan Uddin
son/daughter of Faruck Ahmed
and Rahela Begum
of Panchakhonda Horgobinda High School, Beani Bazar
bearing Roll Beanibazar - 1 No. 321002 duly passed the Junior School Certificate Examination held in the month of November, 2018 and secured G. P. A. 2.57 in the scale of 5.00.
His/Her date of birth is 20/08/2004 (Twentieth August Two Thousand Four)

Date of Publication of Result: December 24, 2018

Controller of Examinations

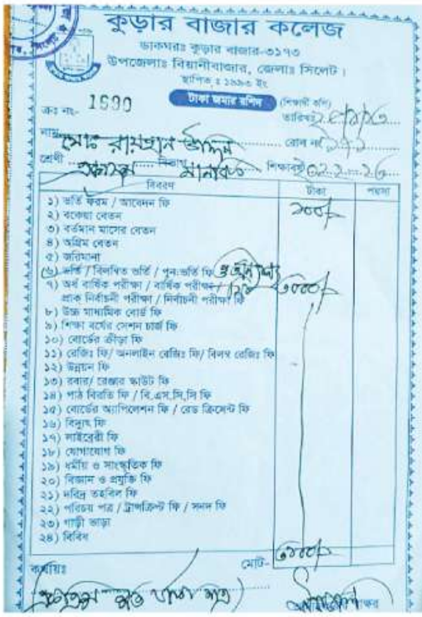

কুড়ার বাজার কলেজ
ডাকঘরঃ কুড়ার বাজার-৩১৭৩
উপজেলাঃ বিয়ানীবাজার, জেলাঃ সিলেট।
স্থাপিতঃ ১৯৯৩ ইং

ক্রঃ নং- 1590 টাকা জমার রশিদ (শিক্ষার্থী কপি)

তারিখঃ

নাম: মোঃ রায়হান উদ্দিন রোল নং

শ্রেণী একাদশ বিভাগ মানবিক শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২৩

বিবরণ	টাকা	পয়সা
১) ভর্তি ফরম / আবেদন ফি	২০০/-	
২) বকেয়া বেতন		
৩) বর্তমান মাসের বেতন		
৪) অগ্রিম বেতন		
৫) জরিমানা		
৬) ভর্তি / বিলম্বিত ভর্তি / পুনঃভর্তি ফি		
৭) অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা / বার্ষিক পরীক্ষা / প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা / নির্বাচনী পরীক্ষা ফি	৩০০০/-	
৮) উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড ফি		
৯) শিক্ষা বর্ষের সেশন চার্জ ফি		
১০) বোর্ডের ক্রীড়া ফি		
১১) রেজিঃ ফি/ অনলাইন রেজিঃ ফি/ বিলম্ব রেজিঃ ফি		
১২) উন্নয়ন ফি		
১৩) রবার/ রেঞ্জার স্কাউট ফি		
১৪) পাঠ বিরতি ফি / বি.এস.সি.সি ফি		
১৫) বোর্ডের অ্যাপিলেশন ফি / রেড ক্রিসেন্ট ফি		
১৬) বিদ্যুৎ ফি		
১৭) লাইব্রেরী ফি		
১৮) যোগাযোগ ফি		
১৯) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফি		
২০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি		
২১) দরিদ্র তহবিল ফি		
২২) পরিচয় পত্র / ট্রান্সক্রিপ্ট ফি / সনদ ফি		
২৩) গাড়ী ভাড়া		
২৪) বিবিধ		
মোট-	৩২০০/-	

কথায়ঃ (বত্রিশ শত টাকা মাত্র)

আদায়কারীর স্বাক্ষর

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ রায়হানের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তার বাবা একসময় কাপড়ের ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। অসুস্থতার দরুণ তিনি আর ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে না। তার বড় ভাই টমটম চালিয়ে অর্থ উপার্জন করে। মেঝ ভাই পানের দোকান দিয়ে রুটি রুজির ব্যবস্থা করেন। তারা সবাই নিম্ন আয়ের মানুষ।

শহীদের প্রিয়জনদের অনুভূতি

শহীদ রায়হানের ছোট ভাই মো: সিয়াম আহমেদ বলেন: রায়হান ভাই অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। বন্ধু বান্ধব ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য পরায়ণ ছিলেন। ধার্মিক ও সুন্দর মানসিকতার মানুষ ছিলেন। তিনি ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ রায়হান উদ্দিন
Name: MD. RAYHAN UDDIN
পিতা: ফারুক আহমেদ
মাতা: রাহেলা বেগম
Date of Birth: 20 Aug 2004
ID NO: 7375917031

এক নজরে শহীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

নাম	: মো: রায়হান উদ্দিন
জন্ম তারিখ	: ২০-০৮-২০০৪
পিতার নাম, পেশা, বয়স	: ফারুক আহমেদ (৬০), পান দোকানদার
মায়ের নাম, বয়স, পেশা	: রাহেলা বেগম (৪৫), গৃহিণী
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
ভাই বোন সংখ্যা	: চার ভাই
	১. বোরহান উদ্দিন, বয়স: ২৭, পেশা: টমটম চালিয়ে, সম্পর্ক: ভাই
	২. শহীদ মো রায়হান উদ্দিন
স্থায়ী ঠিকানা	: টেলকান্দি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ১৪৪/নয়াগ্রাম, এলাকা: বিয়ানীবাজার পৌরসভা, থানা: বিয়ানীবাজার, জেলা: সিলেট
ঘটনার স্থান	: বিয়ানীবাজার থানা গেটের সামনে
আঘাতকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, আনুমানিক বিকাল ৫.৩০ মিনিট
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: কাল: ৫ আগস্ট, আনুমানিক বিকাল ৫.৩০ মিনিট
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. বাবাকে ভালো কোনো ব্যবসা ধরিয়ে দেয়া
৩. মেঝ ভাইয়ের চাকরির ব্যবস্থা করা
৪. ছোট ভাইয়ের পড়াশুনার খরচ বহন করা

وَ لَا تَقُوۡلُوۡا لِمَنۡ یُّقۡتَلُ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اَمۡوَاتٌ ؕ
بَلۡ اَحۡیَآءٌ وَّ لٰکِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ

যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা
জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।

-সূরা বাকারা: আয়াত ১৫৪

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী